কমলা দাশগুপ্ত

নাভানা
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

প্রকাশক শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ বসু
নাভানা
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

প্রচ্ছদচিত্র সমীর সরকার কর্তৃক অঙ্কিত

প্রথম মুদ্রণ
শ্রাবণ ১৩৬১, অগস্ট ১৯৫৪

দাম : সাড়ে তিন টাকা

মুদ্রক শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিণ্টিং ওআর্কস্ লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩
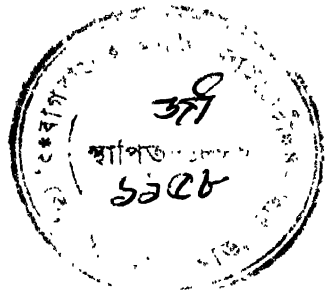
যে-সব বাবা-মা'কে

পরাধীন ভারতের বিপ্লবী ছেলেমেয়েরা

নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের আগুনে ঝলসে দিয়েছিলেন,

তাঁদের সকলকে স্মরণ ক'রে

আমার বাবার স্মৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে

মা'কে উৎসর্গ করলাম।

পরিচিতি

বাংলার বিপ্লব-আন্দোলনে নারীদের দান কম নয়। এ-দানের হিসাব সংখ্যা দিয়ে হয় না; জাতির মানুষের সংখ্যানুপাতে এ-আন্দোলনে পুরুষের সংখ্যাও বেশি ছিলো না। যে হিসাব-ভোলা আত্মদানে এই আন্দোলন জগতকে মুগ্ধ করেছে, চমৎকৃত করেছে, সেই আত্মদান, আত্মদানের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা আর তারই একনিষ্ঠ সাধনায় জাতির যে-চরিত্র পরিস্ফুট, এই আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য জাতির মুষ্টিমেয় নরনারীর সেই চরিত্র। ঘটনা ঘ'টে গেছে, ইতিহাস স্তরের-পর-স্তরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে, তার এক যুগের শ্রেষ্ঠ সাধনা অন্য যুগের চোখে ব্যর্থতার আঁধারে মলিন হ'য়ে গেছে। র'য়ে গেছে জাতির সামনে শুধু তার গুটিকতক মানুষের চরিত্রের পরিচয়।

মাটির তলায় অঙ্কুর উদ্‌গমের সাধনার যে কাল, বিপ্লব-যুগের সেই প্রথম অঙ্কে আনন্দমঠের শান্তি চরিত্র নিয়ে, দেবী চৌধুরানী নিয়ে জল্পনা-কল্পনা হয়েছে; সরলা দত্ত চৌধুরানী বিপ্লবী দল প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রেরণা জুগিয়েছেন, পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে অস্ত্র রেখে বা পারাপার ক'রে এবং পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়ে অনেক মহিলা দুঃখ নির্যাতন বরণ করেছেন। কিন্তু সক্রিয়ভাবে বিপ্লবযজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়ে বা বিপ্লবীদলের নেত্রীত্ব নিয়ে কাজ করার উন্মাদনা আসে বাংলার মেয়েদের ভিতর আরও পরে। আমরা দ্বিতীয় বার জেল থেকে মুক্ত হই ১৯২৮ সালে। এই সময়েই দেখেছি, কলকাতায় ও ঢাকায় মেয়েদের ভিতর বিপ্লবী দল ও চরিত্র গড়বার প্রেরণা দেখা দিয়েছে। কলকাতায় কলেজের ছাত্রীদের ভিতর এই কাজে যাঁরা ঐকান্তিক উৎসাহ দেখিয়েছেন, তাঁদের ভিতর শ্রীমতী কল্যাণী দাস (ভট্টাচার্য), স্বর্গীয়া শোভারানী দত্ত ও শ্রীমতী কমলা দাশগুপ্ত-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এর পর থেকে বিপ্লবী আন্দোলন দুই ধারায় বইতে থাকে : একই দল এক-দিকে কংগ্রেসের ভিতর দিয়ে আইন অমান্যের গণ-আন্দোলনের জন্য দেশকে প্রস্তুত করেছে; অপর দিকে, নিরস্ত্র জনসাধারণকে একতরফা মার ও অত্যাচারে অবসন্ন ক'রে ফেলার সাম্রাজ্যবাদী শাসনের যে-নীতি, তাকে বাধা দেবার উদ্দেশ্যে, আঘাতের বদলে, যত দুর্বল হস্তেই হোক, আঘাত হানবার আন্দোলন সৃষ্টির জন্যে গোপন আয়োজন করেছে। 'স্বাধীনতা' নামে বাংলার বিপ্লবীদের

একখানা সাপ্তাহিক কাগজ ছিলো— ১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেসের কয়েকমাস আগে এর প্রকাশ, ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনের কয়েক-দিনের ভিতর এর অবলুপ্তি। এই কাগজখানাই সেদিনকার বাংলার এই আঘাতের বদলে আঘাত হানবার মন্ত্র প্রচার করেছিলো। কিন্তু ১৯৩০ সালে যখন আইন অমান্য আন্দোলনের বন্যা ব'য়ে গেল, গোপন আয়োজনের অনেক সমিধ তাতে যেন ভাসিয়ে নিয়ে গেল। সেই আয়োজনের একটি ছোট্টো যজ্ঞাধারকে শক্ত মুঠিতে ধ'রে রেখে ভবিষ্যতের খানিকটা সম্ভাবনাকে সেদিন বাঁচিয়ে রেখেছিলেন শ্রীমতী কমলা দাশগুপ্ত। সম্প্রতি যখন দেখলাম, কমলা তাঁর স্মৃতি থেকে গোটাকতক ঘটনা নিয়ে 'রক্তের অক্ষরে' ব'লে বইতে একটা সূত্রে গেঁথেছেন, তখন একটা সত্যিকারের আনন্দ পেলাম।

'রক্তের অক্ষরে' বিপ্লব-যুগের কোনো অংশের ইতিহাস নয়, এ কতকটা আত্মকাহিনী। বাংলার বিপ্লব-যুগের ইতিহাস লিখবার দিন আজও আসেনি। গুপ্ত সমিতির ও তার কার্যকলাপের ইতিহাস লেখার বিপদ আছে। অধিকাংশ ঘটনার আয়োজনই এখানে হয় গোপনে— সে-সবের কৃতিত্ব নিজের বা নিজের দলের ব'লে প্রচার করার একটা ঝোঁক থাকে। একজন লেখক দাবি করেছেন, কানাই ও সত্যেনকে জেলে রিভলভার পৌছে দিতে তিনিই স্বর্গীয় শ্রীশ ঘোষের সহচর হয়েছিলেন। তিনি হয়তো জানেনও না যে, শ্রদ্ধেয় শ্রীশ ঘোষের এই সহচর আজও জীবিত। তিনি গোন্দলপাড়ার বসন্ত ব্যানার্জী। এইভাবে বাংলার বিপ্লব-যুগের ইতিহাসে সত্যমিথ্যার সীমারেখা ধরা কি ক'রে শক্ত হ'য়ে উঠেছে তার দৃষ্টান্ত হিসাবেই এই ঘটনাটির উল্লেখ করছি।

এ ছাড়া, বাংলার বিপ্লব-আন্দোলনের ইতিহাস বিকৃত হবার অন্য কারণ ও আশঙ্কাও আছে। স্যার জন অ্যাণ্ডার্সনের আমলে যে সন্ত্রাসবাদবিরোধী আন্দোলন হয় তার গতি বিচিত্র। অনেকেই এটাকে শুধু একটা ক্রূর জুলুম আর নির্যাতনের রূপেই দেখেছেন। একটা সমগ্র জাতির অপূর্ব অদ্ভুত উদীয়মান যৌবনচরিত্র আর তার বলিষ্ঠ পরিণতির যেভাবে মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে তা কচিৎ কারও চোখে পড়েছে। এই লক্ষ্যে শুধু যে শহর থেকে শুরু ক'রে সুদূর পল্লী অঞ্চল পর্যন্ত জাতির শিক্ষক, লেখক ও নেতৃস্থানীয় সর্বশ্রেণীর লোককে প্রলোভনে বিভীষিকায় মেরুদণ্ডহীন করা হয়েছে তাই নয়, দলভাঙাভাঙিও

অনেক হয়েছে, বিপ্লবী এবং প্রতিবিপ্লবী দলকে সমান প্রতিষ্ঠা দেবার চেষ্টা হয়েছে, কার্যকালে যে-নামের কোনো বিপ্লবী দলের অস্তিত্ব ছিলো না, ইতিহাসে তারা স্থান পেয়েছে। এ-সব ঘটনাপরম্পরা এতই জটিল যে, এখানে তার বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। মোটের উপর ইতিহাসের বিকৃতিই আজ স্বাভাবিকে দাঁড়িয়েছে।

এই অবস্থার ভিতর শ্রীমতী কমলা যা করেছেন, সত্য ইতিহাসের উপাদান সৃষ্টির তা-ই একমাত্র পথ। আরবের লরেন্সের (Lawrence of Arabia) মতো ডায়েরির আকারে ঘটনার বিন্যাস বাংলার বিপ্লবীদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁদের ভিতর যিনি যা করেছেন বা প্রত্যক্ষ করেছেন তা লিপিবদ্ধ ক'রে গেলে ভবিষ্যতে সত্য ইতিহাস লেখা সম্ভব হ'তে পারে। কমলা নিজে একান্ত-ভাবে যে-সব ঘটনার সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত সেগুলি এই বইতে স্থান পেয়েছে —ইতিহাসের যতটুকু না দিলে তাঁর কাহিনীর সূত্র ধরা যাবে না ততটুকুই মাত্র এই বইয়ের দ্বাদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে তিনি দিয়েছেন।

কমলা সাহিত্যিক— দীর্ঘকাল মাসিক 'মন্দিরা' সম্পাদনায় তাঁর পরিচয়। তাঁর লেখার ভঙ্গিও এমনি ঝরঝরে যে তার ভিতর ফাঁকির অবকাশ নেই। অন্তরের যে-দৈন্যে মানুষ নিজেকে বাড়িয়ে ব'লে সুখ পায়, সে-দৈন্যের কোনো পরিচয় এ-লেখার ভিতর নেই— বরং তিনি নিজের এবং তাঁর কার্যকলাপের দিনে দলের যে-নিঃস্বতা অনুভব করেছেন, তা-ও অকপটে লোকসমাজে খুলে ধরেছেন। প্রধানত যে-কয়টি চরিত্রের উল্লেখ এখানে আছে, তার ভিতর দীনেশ মজুমদার শহীদ হয়েছেন, তা ছাড়া, রসিক দাস, বীণা দাস (ভৌমিক), সুধীর ঘোষ বাংলার রাজনীতির বা সমাজসেবার ক্ষেত্রে একান্ত অপরিচিত নন— এঁরা আজও জীবিত। এঁদেরও বাড়িয়ে বললে তা অম্লানবদনে স'য়ে যাবার হীনতা এঁদের চরিত্রকে স্পর্শ করে না। সেই হিসাবে, বিপ্লবী যুগের বহু কর্মী জীবিত থাকতে-থাকতে যদি শ্রীমতী কমলার মতো অনেকে তাঁদের নিজের-নিজের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ ক'রে যান, তা হ'লে বাংলার সেই গৌরবোজ্জ্বল যুগের একখানা সত্যিকার ইতিহাস লেখা কোনো ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের পক্ষে কতকটা সহজ হবে।

করাচি
১৬।৬।৫৪

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত

পূর্বাভাষ

বিপ্লবীজীবনের কাহিনী চিরদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে একান্ত গোপনে থাকবে এই ছিলো বিপ্লবীদের শিক্ষা ও সাধনা। ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্টের পূর্ব পর্যন্ত স্বাধীনতা আসছে জেনেও স্বাধীনতার বাস্তব রূপটি যে কি হবে তা আমি কল্পনায় ঠিকমতো আঁকতে পারতাম না। তাই বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে আমার নামটা তখনও প্রকাশ করা সংগত হবে কিনা সে-বিষয়ে মনের মধ্যে সংশয় ছিলো।

স্বাধীনতা আসবার পরও নিজের রাজনৈতিক জীবন সম্বন্ধে কিছু লিখবো এমন দুঃসাহস আমার ছিলো না। সে-সময়ে যে-কয়জন বারেবারেই আমাকে লিখতে অনুরোধ করেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন আমার স্নেহের পাত্রী সাহিত্যিকা শ্রীমতী বাণী রায়। কিন্তু কিছুতেই তখনও লিখবার কথা আমি ভাবতে পারতাম না। পরে আমার ভাই আমাকে লিখবার জন্য রীতিমতো পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। তার ক্রমাগত তাগিদে অবশেষে লিখতে শুরু করলাম।

কিন্তু লিখতে গিয়েও কেবলই মনে হয়েছে, কেন লিখছি? কী এর সার্থকতা? কে এই লেখা পড়বে? লজ্জা পেয়ে কতো বার কলম থেমে গেছে। তাই বোধ হয় এই লেখা ব্যক্তিগত রাজনৈতিক জীবনকে ছাপিয়ে কিছুটা স্পর্শ করেছে ইতিহাসকে। ইতিহাসের স্থানগুলি ভ্রমসংকুল হবারই সম্ভাবনা। তাই চ'লে গেলাম ভূপেনদা'র (শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত) কাছে। তিনি হাসিমুখে সস্নেহে লেখাটি হাতে তুলে নিলেন। আগাগোড়া পাণ্ডুলিপি তিনি দেখে দিয়েছেন এবং নানা পরামর্শ ও তথ্য দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করেছেন। ভূপেনদা'কে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার প্রতি তাঁর আন্তরিক স্নেহের অবমাননা করতে চাই না। তাঁদের তো কখনো কৃতজ্ঞতা জানাবার মতো পর মনে করতে পারি না। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা এঁরা শয়নে স্বপনে জানতেন না। এঁদের সংস্পর্শে এসে, এঁদের অনুবর্তী হ'য়ে আমাদেরও রাজনৈতিক জীবন ছাড়া আলাদাভাবে ব্যক্তিগত জীবন বিশেষ-কিছু ছিলো না। এঁদের সঙ্গে একই সুখ-দুঃখ, ঝড়ঝঞ্ঝা, উত্থান-পতন, ভাঙা-গড়াকে সামনে নিয়ে আমরাও চলেছিলাম। তারই একটু কল্লোলধ্বনি হয়তো

প্রকাশ পেয়েছে এই লেখায়। আমার সাধ্য কি তাকে পরিপূর্ণভাবে ভাষায় ফুটিয়ে তুলি। তবু কোনো অনুসন্ধিৎসু মনকে যদি এ-লেখা কিছু তৃপ্তি দিতে পারে সেটুকুই হবে লেখার সার্থকতা।

কলকাতা বেতারকেন্দ্র আমাকে জেলজীবন ও ১৯৩০ এবং ১৯৪২ সালের কংগ্রেস আন্দোলন সম্বন্ধে কিছু বলতে অনুরোধ করেন। সেখানে যা বলেছি তার থেকে বেছে-বেছে কিছু উপাদান এখানে সংগ্রহ ক'রে নিয়েছি। 'মন্দিরা'তে ধারাবাহিকভাবে লিখেছিলাম 'নোয়াখালির ডায়েরি'। এখানে নোয়াখালিতে গান্ধীজী-প্রসঙ্গ প্রধানতঃ তা থেকেই নেওয়া। তা ছাড়া নানা লেখা থেকে ও নানাভাবে সংবাদ সংগ্রহ ক'রে ঘটনাবলী এখানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলি যা প্রকাশ করতে চেয়েছি তা লিখতে গিয়ে কতো ঘটনা ভুলে গেছি, কতো নাম বিস্মৃত হয়েছি, কতো ত্রুটি র'য়ে গেছে, সব-কিছুর জন্য মার্জনা চেয়ে রাখি।

২০. ৪. ১৯৫৪
কলকাতা

কমলা দাশগুপ্ত
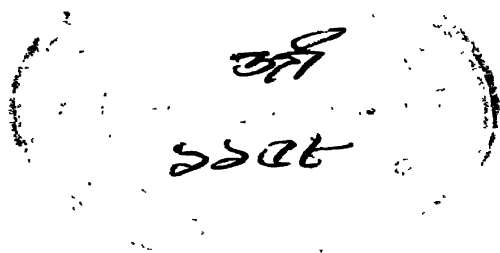
র ক্তে র অ ক্ষ রে

২৬ জানুয়ারি, ১৯৫০ সাল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে আমাদের সমস্ত সম্পর্ক আজ ঘুচে গেল। জাতির ললাট থেকে গোলামির গ্লানি আজ ধুয়ে মুছে গেছে। এই ব্রিটিশ রাজশক্তি উদ্ধত অবজ্ঞাভরে প্রায় দুই শতাব্দী ধ'রে জাতির চরিত্রকে তিলে-তিলে ক্ষইয়ে দিয়েছে, দেহে মনে দুর্ভিক্ষ এনে দিয়েছে, তাকে পঙ্গু করেছে, অসাড় করেছে, আত্মবিস্মৃত করেছে। বিশ্বের দরবারে গোলামের জাত নামে ছিলো আমাদের পরিচয়। ইংরেজ তার বিজাতীয় অস্তিত্ব দিয়ে উপেক্ষাভরে জগতের সামনে আমাদের ঘৃণার পাত্র ক'রে রেখেছিলো। এই কলঙ্কের বোঝা নিয়ে মুখ তুলে আমরা কোথাও কথা কইতে পারিনি, আমাদের শ্রেষ্ঠ মনীষীকেও মাথা নত ক'রে চলতে হয়েছে। জগতের অন্যান্য জাতি যখন দুরন্ত পিপাসা নিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সন্ধানে পাগল হ'য়ে ছুটে চলেছে, আমরা তখনো হাসিমুখে ইংরেজের দাসত্ব করেছি। এই যে মারাত্মক বিষের শক্তি সেটা তো আর এখন জগদ্দল পাথরের মতো জাতির বুকে চেপে ব'সে থাকবে না। আজ থেকে ভারতবর্ষ স্বাধীন। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমাদের সার্বভৌম লোকরাজ। শাসনের স্বরচিত সংবিধান প্রস্তুত।

তবু জানি আজও সাধনা শেষ হ'য়ে যায়নি। শুধু অপসারিত হ'লো জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠিত হবার পথের একটা প্রধান বাধা। যে-দরজাটা বন্ধ ছিলো কঠিন লৌহবন্ধনে, সেটা আজ খুলে গেছে। দুশ্চর তপস্যার দুর্দম বেগ রয়েছে তার পশ্চাতে। কিন্তু সুমুখে রয়েছে আরো কতো কঠিন অর্গলবদ্ধ দিক। সেগুলিও মুক্ত হবে বৈকি! জাতীয় জীবনের দুর্নিবার স্রোতোধারা তো অবিশ্রাম এগিয়েই চলেছে উদ্দাম হ'য়ে, উচ্ছ্বসিত হ'য়ে, সেই জলতরঙ্গ রোধ ক'রে রাখার শক্তি কারো নেই। ইতিহাস নানা উত্থানপতন, ভাঙাগড়া নিয়ে আপন মনে এগিয়ে চলেছে। সেই তরঙ্গভঙ্গের

কোথাও ছেদ নেই, বিরাম নেই। তারই একটা বিরাট ঢেউ উঠে সংগ্রামকাহিনীতে ডুবে গেছে, সেটা ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-সংগ্রামের পরিচ্ছেদ। কিন্তু অবিশ্রান্ত স্রোত ব'য়ে চলেছে ঊর্মিমুখর হ'য়ে, গতিবেগ তার কোথাও থেমে থাকবে না। আমরা এই যুগের মানুষ যখন আর থাকবো না, তখনো এই স্রোত এমনি করেই ব'য়ে চলবে নব-নব ধারায়, নতুন ভঙ্গিমায়, নবীন ঐশ্বর্যে ভরপুর হ'য়ে।

জীবনের শেষ অধ্যায়ে এসে আজকের দিনে ইচ্ছে করে অতীত পানে একবার ফিরে তাকাই, ইচ্ছে করে আমাদের যুগকে প্রাণ ভ'রে আর-একবার দেখি। মনে পড়ে আজকের এই দিনটির জন্য জাতির কতো না আকাঙ্ক্ষা, কতো না কৃচ্ছ্রসাধনা। সেই অদ্ভুত জীবন-গুলির বিন্দু-বিন্দু ত্যাগের যে কঠিন তপস্যা তারই কয়েকটা স্মৃতি যেন ভেসে-ভেসে আসে। তাকে উড়িয়ে দেওয়া তো যায় না, ভুলে যাওয়াও সম্ভব নয়। সেই সহস্র হাসিকান্নার কাহিনী স্মৃতির অতল গহ্বর থেকে যেন কথা কইতে চাইছে। মৌন সেই অতীত, তবুও তার নীরব কাহিনী ব'য়ে চলেছে জাতির মজ্জায়-মজ্জায়।

এই তো সেদিনের কথা। খুব অস্পষ্ট তো নয়। সেটা ছিলো ১৯২৭-২৮ সাল। গান্ধীজীর প্রভাব তখন দেশকে এক বিপুল ধাক্কায় চঞ্চল ক'রে তুলেছে। বিদেশী শাসনকে ঘৃণার চোখে দেখতে শিখেছে তরুণের দল। যেখানে-সেখানে জেগে উঠেছে ইংরেজ শাসনশক্তির বিরুদ্ধে একটা তীব্র অবজ্ঞা, একটা ঘৃণাভরা রোষ। ১৯২১ সালের অসহযোগ অন্দোলন আপাতঃ ব্যর্থ হ'লেও দেশের আনাচে-কানাচে বইয়ে দিয়েছে জাতীয় জাগরণের একটা বিষম দোলা। চারিদিকে যেন একটা অভূতপূর্ব সাড়া প'ড়ে গেছে।

সেই আবর্তন তরুণ চিত্তকে ঘিরে ফেলতে চাইছিলো। আমাকেও যেন সেই হাওয়া ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যাচ্ছে। লিখে ফেললাম গান্ধীজীকে কাঁচা হাতে এবং ততোধিক ছেলেমানুষী ক'রে এক চিঠি। লিখলাম,

গান্ধীজীর কাছে সবরমতী আশ্রমে আমি থাকবো এবং দেশের কাজ করবো। সঙ্গে-সঙ্গেই এলো জবাব। কিন্তু তিনি বড়ো নিরুৎসাহ করলেন। লিখেছেন, বাপ-মায়ের অনুমতি নিয়ে এসো। তা ছাড়া, তুমি এখানে এত সরল জীবনযাপন করতে পারবে তো?

সরল জীবনযাপনে আমার বিন্দুমাত্রও ভয় ছিলো না। ভয় ছিলো বাবা-মা'র অনুমতির। তাঁদের অনুমতির কথা ভাবতেই পারতাম না। হ'লো না তাঁর কাছে যাওয়া। রুদ্ধ আবেগে মনটা রইলো খারাপ হ'য়ে।

ওদিকে বেরিয়েছে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'। আইনের বলে বন্ধ ক'রে দেওয়া সেই বই রাত জেগে প'ড়ে যেন অভিভূত হ'য়ে যাই, যেন নতুন জগতের আভাস পাই। তবুও ভালোবাসি গান্ধীজীকেই। তাঁকে যেন চিনি, যেন বেশি বুঝি। সহানুভূতিটুকু কিন্তু কেড়ে নিয়েছে 'ভারতী' আর 'ডাক্তার'।

বেথুন কলেজে ফোর্থ-ইয়ারে পড়ছি। একটা চাপা হাওয়া এসে কী কথা যেন কানাকানি করতে চায়। ছবি আমার বন্ধু। একসঙ্গেই পড়ি। সে বলে, একজনের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবো, তোমার মন সায় দেবে হয়তো। নাম ধাম তার বলে না, কি যেন চেপে যায়। ছবির ছিলো বুদ্ধি, ছিলো চাপা মিষ্টি স্বভাব, যতই তার কাছে যেতে চাই ততই সে দূরে স'রে যায়। তার না-বলা কথা চুম্বকের মতো আকর্ষণ করতে থাকে।

আমি একটা কথা জানতাম। ছবি বলেছিলো, ওর একটিমাত্র ভাই, সে বিপ্লবীদলের সভ্য। চট্টগ্রামে তাদের বাড়ি। থেকে-থেকে ভাইটি কাউকে কিছু না ব'লে কোথায় চ'লে যায়, তারপর যেদিন খুশি বাড়ি ফিরে আসে। ছবির বাবা-মা পাগলের মতো হ'য়ে যান। মায়ের কান্নায়-ভরা সেই চিঠি ছবির মতো গভীর শান্ত মেয়েকে অস্থির উদ্‌বিগ্ন ক'রে তোলে। চোখের সামনে তার এই

দুঃখ সহ্য করা দেখতে গিয়ে নিজে চঞ্চল হ'য়ে উঠি। বলি, বিপ্লবী দলে যোগ দিলে এত ভয়, এত দুঃখ কেন ভাই? ছবি শুধু করুণ হাসে। বিপ্লবীদের সংকটময় জীবনের কথা সে জানে সবই। কিন্তু আমার কাছে তা রহস্যময়। রোজ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, 'ছবির ভাইকে তুমি ভালো ছেলে ক'রে দাও, তার বাবা-মা'র দুঃখ দূর ক'রে দাও। সেই ভাইকে দিয়ে তুমি যে কাজ করিয়ে নিতে চাও তা আমাকে দিয়ে করিয়ে নিয়ো।'

ভগবানের কাছে কোনো কথা পৌঁছয় কিনা সে-মীমাংসা আজও শেষ হ'য়ে যায়নি।

ওদিকে ক্লাসের অন্য দুই বন্ধু, কল্যাণী দাস ও সুরমা মিত্র একদিন শচীন মিত্রের সঙ্গে আলাপ করতে আমাকেও ডেকে নিয়ে গেল। শচীনবাবু নিখিল বঙ্গ ছাত্রসংঘের সেক্রেটারি ছিলেন। সেই সূত্রেই গেছি। তখন কি জানি তিনি গুপ্তদলের সভ্য। কথার পর কথা। উত্তেজনা-ভরা আলোচনা। কোথায় গেল ছাত্র, কোথায় কংগ্রেস, কোথায় রইলো স্থান-কাল-পাত্র ভেদ। চলছে দুই পক্ষের যুক্তির প্রবল ঝংকার। শচীনবাবু সশস্ত্র বিপ্লবের দিক থেকে জগতের ইতিহাস মন্থন ক'রে বাছা-বাছা প্রমাণ আনছেন যে, সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া অন্য কোনো পন্থায় স্বাধীনতা আসতে পারে না। এই নাকি ইতিহাসের চিরন্তন শিক্ষা। আমরা বেথুন কলেজের তিন বন্ধু ঠিক ততখানি জোর দিয়েই তাঁর যুক্তিকে এই ব'লে খণ্ডন করতে চাইছি যে, গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলন ভারতবর্ষের অতীত ধারাকে দেশের মাটির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিশ্চয়ই স্বাধীনতা এনে দেবে। যুক্তিতর্কের অন্ত নেই। ফিরে এলাম একটা উল্টো পথের সন্ধান নিয়ে। মনের মধ্যে চললো প্রচণ্ড আলোড়ন। এতকালের বিশ্বাসের ভিত্তিতে যেন সন্দেহ উঁকি দেয়। ঘুমিয়ে শান্তি নেই, জেগে অন্য চিন্তা নেই, মনে হয়, তাই তো, শচীনবাবুর সব যুক্তির

তো উত্তর জানি না। সহস্র যুক্তি এবং প্রশ্নের জ্বালা ছটফটিয়ে তোলে। কখন কাগজ কলম নিয়ে ব'সে গেছি, চিঠি লিখছি শচীনবাবুকে।

শচীনবাবু তেমনি ক'রেই উত্তর দিলেন। চিঠির পর চিঠি। একবার জিগ্যেস করলেন যে, আমি ডালপালা ছেঁটে সমাজের পচা অংশটা সংশোধন করতে চাই কি না। চ'টে গিয়ে উত্তর দিলাম, আমি পচা গাছটা শিকড়সুদ্ধ উপ্‌ড়ে ফেলতে চাই। মনে-মনে তখন হয়তো তিনি হাসছেন আমার মধ্যে আমূল পরিবর্তনের সুর পেয়ে। পরিপূর্ণ বিশ্বাস আসছে না তখনো। তখনো অন্ধকার হাতড়ে-হাতড়ে বেড়াচ্ছে মন। একটা অজানা জগৎ যেন আশে-পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ধরা-ছোঁওয়া দিচ্ছে না। অথচ আমার যেন তাকে বুঝতেই হবে, ছুঁতেই হবে। একটা-কিছু না ক'রে থাকা যেন অসম্ভব। অথচ যে-কোনো লোক যে-কোনো কথা বললেই আমি তৃপ্তি পাচ্ছি না। বাতির সুইচটা যে ঠিক কোথায়, কোথায় টিপলে বাতিটা জ্ব'লে উঠবে তা যেন খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

তারই কিছুদিন পরের কথা। আমাদের কলেজের সেকেণ্ড-ইয়ারে পড়ে পারু (আসল নাম নয়)। ছবি তারই সঙ্গে আমাকে আলাপ করতে বলেছিলো। পারু একদিন এসে বলে, 'চলো, একজনের সঙ্গে আলাপ করবে, কথা বললে দেখবে, কাজ না ক'রে তুমি থাকতে পারবে না।' পারু এমন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথাগুলো ব'লে যায়, এমন জোর ক'রে আলাপ করিয়ে দেবার তারিখ এবং সময় স্থির করে যে, আমার কোনো জবাবের অপেক্ষাই সে রাখে না। পারুকে আমার ভালো লাগে।

পারু নিয়ে যায় কখনো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে, কখনো একটা অন্ধকার স্যাঁতসেতে ঘুপ্‌চি ঘরের মধ্যে। কেমন ভয়-ভয় করে। যেন বিপ্লবী গুপ্ত আড্ডার প্রতিনিধি হ'য়ে ওই ঘরটা আমার

দম বন্ধ ক'রে ফেলবে। যাঁর সঙ্গে পারু পরিচয় করিয়ে দেয় তিনিও যুক্তির শাখা টানছেন। কিন্তু শচীনবাবুর মতো ইতিহাস দিয়ে নয়, প্রবল অকাট্য প্রমাণ দিয়ে নয়। গাছের ডালপালাগুলি হাওয়ায় এ-পাশ ও-পাশ করে কিন্তু শিকড়সুদ্ধ বিশ্বাসকে টেনে ছিঁড়তে চায় না।

আমি শচীনবাবুর নাম করতেই তিনি হেসে বলেন, 'ওঃ, তাদের সঙ্গে কথা বলছেন? করেছেন কি? শিগ্‌গির আপনার চিঠিগুলো ফিরিয়ে আনুন, কখন পুলিসের হাতে ধরা পড়বে, তাতে সর্বনাশ হ'য়ে যাবে, শুধু আপনার ক্ষতি নয়, আমাদের সকলের ক্ষতি। একটা চিঠি লিখে দিন যেন আপনার চিঠিগুলো পত্রবাহক মারফৎ ফিরিয়ে দেন।' আমার মনে হ'তে লাগলো, ভারি মজার তো এঁরা! দু-জনেই বিপ্লবী, তবু তাঁর কাছে চিঠি রাখতে এঁর এত বাধা? আমার প্রবল আপত্তিতে তিনি কর্ণপাত করবার মানুষ নন। বললেন, 'অত সেন্টিমেণ্টাল হ'লে চলবে কেন? এ-সব কাজে নামলে কাজ ছাড়া সকলকে কতো আঘাত দিতে হবে। শচীনবাবুকে তো আপনি অবিশ্বাস করছেন না, শুধু আপনার হাতের লেখা ওই চিঠি তাঁর কাছে থাকা বিপজ্জনক। তাঁর পক্ষে তো আরো বিপদ। আর দেরি করবেন না, লিখুন চিঠি।' তিনি আমাকে সময় দিচ্ছেন না ভাবতে।

তাঁর হেঁয়ালিভরা কথার মুখে ভাবলাম, যদি আমার চিঠির জন্য শচীনবাবু অথবা এঁদের কারো জেলে যেতে হয় কিংবা কিছু বিপদেই পড়তে হয়, তার চেয়ে ফিরিয়েই চাই চিঠিগুলো, এঁরা কি আর মিথ্যা কথা বলছেন? ফিরিয়ে দেবার জন্য চিঠি দিলাম তাঁর হাতে দারুণ লজ্জা ও দ্বিধার সঙ্গে। কিছুই যেন বুঝে উঠতে পারছিলাম না বিপ্লবীদের রহস্য।

মূর্খ আমি তখন কি জানি কেন এই চিঠি ফিরিয়ে আনার জন্য

এত পীড়াপীড়ি! এ যে দলে টানবার কৌশল! এ যে পুলিস, বিপদ, কালোছায়া সৃষ্টির জাল! শচীনবাবুর চেয়ে যেন কতো বেশি কাজ করেন এঁরা, কতো সাবধান, সজাগ! একটা নতুন আনাড়ী মনকে আচ্ছন্ন ক'রে দেবার চেষ্টা তাঁর। আসল কথা ছিলো এই যে, তিনি শচীনবাবুর কাছ থেকে আমাকে সরিয়ে আনতে চাইছিলেন। সর্বরকমে শচীনবাবুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হ'য়ে যাক্, এই ছিলো তাঁর উদ্দেশ্য। ধ'রেই নিলেন তিনি যে, আমি তাঁর সঙ্গেই কাজ করবো। কিন্তু তিনি আমার মনের ধাতুকে চিনতে পারেননি। তাই ভুল করলেন।

তারপর যতদিন তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি, তাঁর কথায় মনে হ'তো যেন একমাত্র তাঁরাই ঠিক কাজ করছেন, ঠিক পথে চলছেন, অন্য সব গুপ্ত দলই ভুল এবং অন্যায় করছে। একটা অবজ্ঞাভরা হাসি নিয়ে উল্লেখ করতেন। আবার, তাঁদের নিজেদের যেন সবই প্রস্তুত, কতো অস্ত্রশস্ত্র, কতো কর্মী, পুলিস চারিদিকে ওৎ পেতে ব'সে আছে। শুধু আমি এলেই কাজে লেগে যেতে পারি। এমন লোভনীয়, আকর্ষণীয় কথা, তবু আমাকে স্পর্শ করলো না। যতই দিন যেতে লাগলো, কেন যেন বার-বার আমার মনে হ'তে লাগলো, এঁদের বড়ো ধাপ্পা আর বাজে কথা, আসল ফাঁকি।

শচীনবাবুর কাছে যেন আমি মহা অপরাধী। এঁরা তাঁকে যাই বলুন, তিনি নিশ্চয় নিজের বিপদ জানেন। দরকার হ'লে আমার চিঠি তিনি নিজেই ছিঁড়ে ফেলতেন। আমি এঁদের কথায় কেন সেই চিঠি এঁদের হাতে দিতে বললাম! এঁরা তো আমাকে চিঠি ফিরিয়ে দেননি! আমার মন ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠলো। ভাবলাম, শচীনবাবুর কাছে নিজেই যাই। আবার লজ্জা পেলাম, কী বলবো?

সেই সময়ে শচীনবাবু হয়তো আমার ব্যবহারে দুঃখিত হ'য়ে

আর চিঠি লেখেননি বা বোঝাতে চেষ্টা করেননি। অথচ তিনি আর-একটু চেষ্টা করলে হয়তো আমি তাঁর সঙ্গেই কাজ করবার সিদ্ধান্ত করতাম। কিন্তু আমি তাঁর কাছে অপরাধী র'য়ে গেলাম।

সেই ১৯২৮ সাল, আর আজ ১৯৫০। তারপর বিপ্লবী শচীন মিত্র কবে বদলে গিয়ে গান্ধীপন্থী হ'য়ে গেলেন, সে-খবর জানিনি। মাঝখানের বছরগুলি তাঁকে একপথে টেনে নিয়ে গেল, আমাকে অন্য পথে। গান্ধীবাদী আমার মনকে তিনিই বিপ্লবের প্রথম সন্ধান দিয়েছিলেন। আবার কর্মরত বিপ্লবমুখী মন তাঁর কখন গান্ধীবাদে ডুবে গেল। বিপরীত দুই দিকে দুই অনুসন্ধিৎসু মন কখন যে চ'লে গেছে জানতে পারিনি। তবু কিন্তু দেখি, আমিও কখন নানা পথ অতিক্রম ক'রে এক পথের বাঁকে গান্ধীজীরই কাছে রয়েছি।

একদিন দেখলাম, শচীনবাবু হাসতে-হাসতে তাঁর জীবনবেদীর শেষ অর্ঘ্য বাপুজীর আদর্শে সাজিয়ে আপন পূজা সাঙ্গ ক'রে কোথায় চ'লে গেলেন। আহুতি দিয়ে জীবন তাঁর সার্থক হ'য়ে গেল।

॥ দুই ॥

পারুকে আমার ভালো লাগে, কিন্তু ভালো লাগে না তার দলের লোকদের চালচলন, কথাবার্তা। যতই তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করি, আমার ভিতর থেকে 'ইন্‌ট্যুইশান্‌' যেন স'রে যেতে বলে। কোথায় যেন একটা ধাপ্পা, একটা আসল ফাঁকি আমার কাছে ধরা পড়তে চায়। এঁরা বলেন, এঁদের সমস্ত প্রস্তুত আছে, তবু আমার এত হাল্‌কা লাগে কেন? কোনো ফাঁকির মধ্যে আমি কিছুতেই যাবো না। ওদিকে শচীনবাবুর সঙ্গে এঁদের ব্যবহার— সব মিলে মনটা আমার বিরূপ হ'য়ে উঠতে লাগলো। আমার মনে এঁরা দাগ কাটতে পারেননি, প্রভাব বিস্তার করা তো দূরের কথা।

১৯২৮ সালে বি.এ. পরীক্ষার পর ইউনিভার্সিটিতে এম.এ. পড়তে গেছি। একটু-একটু ক'রে নিজের পায়ে দাঁড়াবার জোর পাচ্ছি। মনটা কিন্তু অশান্তিতে আচ্ছন্ন। মনে হয় কিছু-একটা আমাকে করতেই হবে, চুপ ক'রে থাকা অসম্ভব। অথচ পথ খুঁজে পাচ্ছি না।

বন্ধু কল্যাণী দাস বলে, ওদের বাড়ির তিন তলার দীনেশ মজুমদার খুব ভালো ছেলে, স্বদেশী করেন, আমি তাঁর সঙ্গে কথা ব'লে দেখতে পারি। কল্যাণী ঠিক করেছে, ওদের ছাতে তিনি মেয়েদের লাঠিখেলা শেখাবেন। কল্যাণীর অনুরোধে অন্য মেয়েদের সঙ্গে আমিও যাই। দীনেশ মজুমদার লাঠিখেলা শেখাতে এলেন— খেলোয়াড়ের মতোই বলিষ্ঠ দোহারা চেহারা, মুখে একটা দৃঢ় সংকল্পের ছাপ। চমৎকার লাঠিখেলা দেখিয়ে যান তিনি।

সেইদিনই আমার মন স্থির ক'রে নিলো যে, লাঠিখেলা শিখতেই হবে। তারপর থেকে তিনি শেখাতে থাকেন মেয়েদের লাঠিখেলা। শিক্ষক এবং ছাত্রী আমরা প্রায় সমবয়সী। এমন গম্ভীর সেই পরিবেশ যে, মনে হয়, লাঠিখেলার মধ্যে যেন নিঃশব্দ সাধনা লুকানো

আছে ; সেখানে কথা কম, ভাষার উচ্ছ্বাস নেই। মনে-মনে আমরা জানি, ইনি বিপ্লবীদলের সভ্য। তাঁর অভ্যাস এই যে, কথা দিয়ে তিনি টানতে চেষ্টা করেন না। বরং যেন লাঠিখেলার মধ্য দিয়েই যে যা বুঝবার বুঝে নাও, দরকার হ'লে অন্যে তার প্রয়োজনে কথা বলবে, তিনি আগে বলবেন না।

অদ্ভুত এই পৃথিবী। কেউ অতিরিক্ত কথা বলেন, অতিরঞ্জন দিয়ে উন্মুখ মনের উৎসাহকে দমিয়ে দেন, কেউ কাজের মধ্য দিয়ে দুর্বার আকর্ষণ করেন, আবার পরে দেখেছি কেউ দ্বন্দ্বভরা দু-চারটে প্রশ্নের অত্যন্ত স্থির জবাবে মনে দাগ কেটে চ'লে যান। গ্রহণকারী তার আপন ধাতু ও স্বভাব অনুযায়ী সাড়া দিতে থাকেন।

পারু একদিন বলে, তার দলের নেতা আমাকে ডেকেছেন। দেখা করতে যেতে হবে দক্ষিণেশ্বরে। একা গেছি। আগের মতোই তিনি অনেক ভারি-ভারি কথা ব'লে গেলেন। সে কথাগুলি ওজনে যত ভারিই হোক, আমার মনে হ'তে লাগলো, একেবারে বিস্বাদ, সব যেন ফাঁকি। আমাকে বোঝাতে লাগলেন, প্রতি পদে বিপ্লবীদের কতো মিথ্যা কথা বলতে হবে, নইলে এ-পথে চলা অসম্ভব। মন আমার এঁদের উপর বিরূপ হ'য়েই ছিলো। কাজেই অসন্তুষ্ট মন মিথ্যা কথা বলার সাড়ম্বর প্রস্তাবে একেবারে রুষ্ট হ'য়ে উঠলো। আমি তাঁদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলাম। তাড়াতাড়ি জানিয়ে দিলাম যে, অমন মিথ্যা কথা বলা আমার সম্ভব নয়। কাজেই তাঁদের সঙ্গে কাজ আমি করবো না। বিশ্বাস করলেন কিনা জানি না, আমি দ্বিরুক্তি না ক'রে চ'লে এলাম। পথে বেরিয়ে মনে হ'তে লাগলো, শূন্য মনে থাকা তো আরো অসম্ভব। কিছু একটা না-ক'রে থাকবো কেমন ক'রে? সোজা চ'লে গেলাম দীনেশ মজুমদারের বাড়িতে।

ডেকে পাঠিয়েছি দীনেশবাবুকে। সন্ধ্যে হ'য়ে এসেছে। দীনেশ-

বাবু হাসিমুখে এসে দাঁড়ালেন। বড়ো-বড়ো চোখ দুটো তাঁর প্রশ্ন-সংকুল। সোজা ক'রে আমিই বললাম, তাঁর সঙ্গে আমি আলোচনা করতে চাই। আমার ইচ্ছা কিছু কাজ করি। কিন্তু যাঁদের সঙ্গে এখন আলোচনা করছি তাঁদের আমার ভালো লাগছে না, ওখানে কাজ করতে পারবো না। দীনেশবাবু এমন সুন্দর ক'রে হাসলেন যেন সহানুভূতি দিয়ে আমার সব কথা বুঝে নিলেন। মুখে বললেন, 'সন্ধ্যে হ'য়ে এসেছে, আজ বাড়ি যান। কাল একজনের কাছে আপনাকে নিয়ে যাবো, তখন সব কথা হবে।' দু-চারটে কথা ব'লে আমি বাড়ি ফিরে এলাম।

॥ তিন ॥

তার পরদিন দুপুরবেলা। ১৯২৯ সাল চলছে। দীনেশবাবুর বাড়িতে গিয়ে খবর দিতেই বেরিয়ে এলেন তিনি। জ্বরে পড়েছেন হঠাৎ, সকাল থেকেই খাওয়া হয়নি। তবু আমাকে ঠিক সময়ে আসতে দেখে খুশি হ'য়ে উঠলেন। আমাকে নিয়ে রওনা হবার জন্য পা বাড়ালেন। কেমন অপ্রস্তুত হ'য়ে উঠলাম। জ্বরের মধ্যে যাবেন? তিনি কিন্তু শোনবার পাত্রই নন। একেবারে বাসে উঠবার জন্য রাস্তায় চ'লে এলেন। বললেন, 'বোটানিক্যাল গার্ডেন্‌স্‌-এ চলুন'।' বিব্রত মুখে বলি, 'অত দূরে জ্বর নিয়ে? থাক্‌গে আজ।'

বললেন, 'না, না, আমার কিছু হবে না। একটু জ্বরে কি হয়?'

সেই সময়ে দীনেশ মজুমদার নাকি ৭১ নম্বর মির্জাপুর স্ট্রিটের বাড়িতে প্রতিদিন আড্ডা দিতেন। সেখানেই ছিলো তাঁর প্রাণ। এই বাড়িটা ছিলো 'যুগান্তর' দলের তখনকার একটা অতিবিখ্যাত আড্ডা। মৌচাকের মতো যত মৌমাছি ভীড় করতো এখানে এসে। পুলিসের শ্যেনদৃষ্টি কখনো এই বাড়িটাকে মুহূর্তের জন্যও ছাড়তো না। তবুও দীনেশ ছিলেন পুলিসের অজানা, তাদের কালো খাতায় তাঁর নাম ছিলো না। এর আগে নাকি বগুড়াতে এবং চব্বিশ পরগণার সোনারপুর, কোদালিয়া, মাহিনগর অঞ্চলে লাঠি ও ছোরাখেলা শেখাতে সুদক্ষ দীনেশবাবুকেই পাঠানো হয়েছিলো। তবুও তিনি পুলিসের কাছে অজ্ঞাত অখ্যাতই ছিলেন—এমনি নীরব এবং কৌশলী ছিলেন তিনি। এত কথা আমি তখন কি জানি! আমাকে নিয়ে তো বাসে উঠে বসলেন তিনি।

কী উৎসাহ-উদ্দীপ্ত মুখ তাঁর তখন! কে বলবে লাঠিখেলার মহা-নির্লিপ্ত সেই মাস্টারমশাই! অতি সহজভাবে কথা ক'য়ে চললেন। আমিও সহজ হ'য়ে উঠলাম। রাস্তায় যেতে-যেতে তিনি আমাকে প্রস্তুত ক'রে নিচ্ছিলেন। বললেন, 'আমরা একসঙ্গে কাজ ক'রে যাই

কিন্তু সব সময়ে সকলের নাম জানতে পাই না, প্রশ্ন করতেও পারি না, ডিসিপ্লিনে বাধে। কাজেই যাঁর কাছে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি তাঁর নাম আপনি জিগ্যেস করবেন না। তিনি আমাদের একজন দাদা। আমি যে-ক'জনকে সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করি, ইনি তাঁদেরই একজন। আপনার যা-কিছু দ্বন্দ্ব এবং প্রশ্ন আছে সবই আপনি তাঁকে জিগ্যেস করবেন। আমি নাম ধাম কিছুই জিগ্যেস করলাম না। আমার আসল জবাব পেলেই হ'লো।

প্রায় ঘণ্টাদেড়েক বাসের ঝাঁকুনি খেয়ে জ্বর এবং পিপাসায় ক্লিষ্ট দীনেশ মজুমদার আমাকে নিয়ে পৌঁছলেন শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন্স-এ। এত দূরে আসার কারণ ছিলো বোধ হয় উপযুক্ত স্থানের অভাব এবং স্পাই-এর দৃষ্টি থেকে অতি সাবধানে নিজেদের বাঁচানো। স্পাই-এর উপদ্রব কাকে বলে আমার তখন জানা ছিলো না।

দীনেশবাবুর সেই দাদা একই বাসে উঠেছিলেন, শুধু আমি জানতে পারিনি। ওঁরা এমনভাবে চলছিলেন যেন কেউ কাউকে চেনেন না। এঁরা নাকি প্রয়োজন ছাড়া কাজের কথা আলোচনা করেন না, নিরাপদ জায়গা ছাড়া রাজনৈতিক বন্ধুদের চেনেন না, বিনা প্রয়োজনে প্রশ্ন করেন না। কী দারুণ রহস্যভরা, তবু ছিলো দুর্জয় আকর্ষণ এঁদের।

একটা গাছের তলায় ব'সে একতরফা পরিচয় হ'লো। অর্থাৎ আমার নাম ধাম, কি পড়ি, কাদের সঙ্গে এত দিন আলোচনা করেছি, ইত্যাদি। অন্যপক্ষের কিছুই আমি জানতে পেলাম না। জানবার নিয়ম নেই, কড়া হুকুম বাসের মধ্যেই জারী করা ছিলো। তারপর আমার প্রশ্ন করবার পালা। তাঁরা হাসি ও সহজ কথাবার্তার মধ্য দিয়ে আবহাওয়াটাকে আমার প্রশ্ন করবার মতো সহজ ক'রে তুললেন। নিঃসংকোচে আলোচনা শুরু হ'লো।

আগের দলটি তাঁদের বিপ্লব সম্বন্ধে মতবাদ দিয়ে আমাকে বিশেষ

স্পর্শ করতে পারেননি। তাই প্রথমেই প্রশ্ন করলাম, 'কী ক'রে আমাদের দেশে বিপ্লব দিয়ে স্বাধীনতা আসবে? সশস্ত্র বিপ্লব দিয়েই বা আসবে কেন?'

দীনেশের দাদা আমার প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে আগে আমাকে নানা প্রশ্নে বুঝে নিতে লাগলেন যে, একে কতোখানি বলা নিরাপদ। কি বুঝলেন কি জানি। অন্ততঃ এটুকু হয়তো বুঝেছিলেন যে, ধাপ্পা দিয়ে কাজ হবে না। তিনি আরম্ভ করলেন তাঁর বক্তব্য। কোথায় আইরিশ বিদ্রোহ, সিনফিনদের উদাহরণ, ইটালির কাভুর, রাশিয়ার বিপ্লব— সব শুরু হ'য়ে গেল। সারা দুনিয়ার ইতিহাস যেন বাদ যাবে না। পটভূমিকা তৈরি হ'য়ে গেল। শচীনবাবুকে কোথায় ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যায়। কিন্তু এখানে যেন আরো ব্যাপক, আরো বাস্তব-মুখী কথাবার্তা। কেমন ক'রে বিপ্লবের সাহায্যে এ-দেশে স্বাধীনতা আসবে তার উত্তরে দীনেশের দাদা যা ব'লে গেলেন তাতে দেখি একটার-পর-একটা ছোটো থেকে ক্রমে বড়ো বিদ্রোহ ফেনিয়ে আসছে, ক্ষুদ্র ঢেউগুলি বৃহৎ এবং বৃহত্তর হ'য়ে একেবারে শেষ বিপ্লবে সারা ভারতবর্ষ থেকে বিপুল আলোড়নে ইংরেজকে উৎপাটিত ক'রে দিচ্ছে। এলো ১৯০৭-১৯০৮ সালের ক্ষুদিরাম কানাইলালের প্রথম তরঙ্গ। দ্বিতীয় তরঙ্গ ছিলো আরো ব্যাপক ও বিশাল, সে একটা ভারতব্যাপী বিপ্লব-আয়োজনের প্রচণ্ড ঢেউ। বিদ্রোহী ভারতের সমস্ত শক্তি সংহত ক'রে সংগ্রামের আহ্বান দিয়েছিলেন যতীন মুখার্জী, পশ্চাতে তাঁর তরুণ বিপ্লবীদের নিঃশব্দ আত্মদানের প্রস্তুতি। সে-বিদ্রোহ বাস্তবে ব্যর্থ হ'লেও তা নাকি দেশকে বিপ্লবের পথ দেখিয়ে গেছে। এক ক্ষুদিরাম এক যতীন মুখার্জী নাকি শত ক্ষুদিরাম, সহস্র যতীন গ'ড়ে উঠবার উর্বরতা এনে দিয়ে গেছেন। অনাগত ভবিষ্যতে এর চেয়েও অনেক বড়ো-বড়ো বিপ্লবের ঊর্মিমালা আসতে থাকবে, তার জন্য চাই প্রস্তুতি। প্রস্তুত থাকতে হবে কথায়,

কাজে, অস্ত্রসম্ভারে, প্রতিষ্ঠানে, কর্মীতে এবং আঘাতের পর আঘাতে রাজনৈতিক অবস্থাকে ক্রমবিস্তারশীল বিপ্লবের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। প্রস্তুত থাকবে সকলে নিঃশেষে আত্মদানের জন্য। কেউ তিলে-তিলে মরবে, কেউ ফাঁসিতে, কেউ গুলিতে। জীবন থাকতে প্রত্যেককেই আদর্শের কণামাত্র প্রয়োজনে সর্ববৃহৎ ত্যাগের জন্য তৈরি হ'তে হবে।

আমার মনে হ'তে লাগলো, এমনটিই তো আমি চাই, এই পথই আমার। চারিদিকে কেমন যেন সত্যিকার বিপ্লব ভেসে বেড়াতে লাগলো। এ তো শুধু ভাবপ্রবণতার কথা নয়, বিপ্লব এ-দেশের মাটিতেও ছিলো, আবার আসবে। জিগ্যেস করলাম, 'আচ্ছা, আপনাদেরও কি অস্ত্রশস্ত্র, ছেলে-মেয়ে সব প্রস্তুত আছে?' এ-সব জিগ্যেস করা যে নিয়মবিরুদ্ধ সে-কথা ভুলে গেছি।

তিনি বললেন, 'অস্ত্রশস্ত্র? ছেলে-মেয়ে? সে কি? আমাদের তো কিছুই নেই। মনে রাখবেন, সবই আপনাকে তৈরি ক'রে নিতে হবে, আমাদের কিছুই নেই।' অন্য কোনো দলের আছে, এ-কথা শুনে তিনি এবং দীনেশবাবু কেমন অদ্ভুতভাবে একে অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

আবার প্রশ্ন করলাম, 'আপনারা কি মনে করেন যে, আপনারা যা করছেন তাই একমাত্র ঠিক এবং অন্যরা যা করছেন সব ভুল?'

তিনি বললেন, 'আমরা যা করছি তা নিশ্চয় ঠিক করছি এমন আত্মবিশ্বাস আছে ব'লেই তো এরকম কঠিন পথে চলতে পারছি। তবে অন্যেরা সবাই ভুল করছেন কি না? আমাদের দিক থেকে হয়তো তা মনে হ'তে পারে, কিন্তু তাঁদের দিক থেকে তাঁরাও হয়তো ঠিকই করছেন। নিজের-নিজের বিশ্বাস নিয়ে সবাই চলছে, কে ভুল কে ঠিক ইতিহাস দেবে সে-উত্তর।

মনে হ'তে লাগলো, নিজেদের বড়ো করবার জন্য অন্যকে ছোটো

করতে বা আমাকে ফাঁকি দিতে তো চেষ্টা করছেন না। আবার প্রশ্ন করলাম, 'আপনারা মিথ্যা কথা বলতে বলেন?' এবারে দীনেশের দাদা হেসে ফেললেন। জবাব দিলেন, 'মিথ্যা কথা? আমরা কখনো মিথ্যা বলি না, সর্বদাই প্রয়োজনে সত্যের সৃষ্টি করি।' উত্তর শুনে আমিও হাসলাম, মনে পড়লো 'পথের দাবী'।

তিনি বললেন, 'ধরুন, পুলিস আপনাকে গ্রেপ্তার করলো। আপনি পুলিসকে সব সত্যকথা ব'লে প্রকাশ ক'রে দিলেন যে, আমরা কে-কে কোথায়-কোথায় কি-কি বিপ্লবী কাজে লিপ্ত আছি। তারপর কি হবে? কোথায় থাকবে বিপ্লবের স্বপ্ন? স্বাধীন ভারতের কল্পনা তৎক্ষণাৎ কি আপনার তথাকথিত সত্য কথায় লুপ্ত হ'য়ে যাবে না? সেই সময়ে প্রয়োজন হবে এই কথা বলার যে, আপনি কিছু জানেন না। 'জানি না' বলাতে বেঁচে যাবে প্রতিষ্ঠান, বাঁচবে বিপ্লবের সম্ভাবনা, সেইটাই তো আমাদের কাছে সত্য। যা-কিছু আমাদের বিপ্লবের পথে বিঘ্ন ঘটায় তাই মিথ্যা, এবং যা-কিছু আমাদের আদর্শের পথে অনুকূল তাই একমাত্র সত্য। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য আমরা মিথ্যা বলি না। এই হচ্ছে আমাদের সত্য-মিথ্যার আদর্শ। এটা কি মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেওয়া? অথবা প্রয়োজনে সত্যের সৃষ্টি করা? কি বলবেন একে?'

আমার মনটা কিন্তু বিরূপ না হ'য়ে সায় দিয়েই উঠলো। তাই তো! বুঝিয়ে দিতে হয় এমনি ক'রেই!

প্রায় তিন চার ঘণ্টা আলোচনার পর সেদিনের কথা শেষ হ'লো। ফিরে এলাম দীনেশবাবুর সঙ্গে। পথে বেরিয়ে মনটা আমার খুশি ছিলো, কথাগুলো যেন দাগ কেটে-কেটে ব'সে গিয়েছিলো। ঘুরে ফিরে চোখে ভাসে কতো ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, প্রফুল্ল চাকী, কতো যতীন মুখার্জী যেন আবার আসবেন, তাঁদের পাশে যেন আমিও আছি। দীনেশবাবু চুপিচুপি বললেন, 'আমাদের দলের নাম

'যুগান্তর'। ওই ক্ষুদিরাম, ওই যতীন মুখার্জীদের যা-কিছু কর্মসাধনা সবই যুগান্তরের যাত্রা।' তখনো তো জানি না দীনেশ মজুমদারও একজন ক্ষুদিরাম। ফিরে এলাম বাড়িতে একটা পরিপূর্ণ আনন্দ-উজ্জ্বল পথের সন্ধান পেয়ে।

তারপর থেকে আমার মনের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে সেদিনের আলোচনা নাড়া দিয়ে ফিরতে লাগলো, সঙ্গে-সঙ্গে খুশির একটা ফল্গু ধারা ভিতরে-ভিতরে ব'য়ে চলেছিলো। এঁদের মধ্যে ফাঁকি দেবার চেষ্টা নেই, বরং যেটুকু করেন তাও স্বীকার করেন না। কথা যেখানে কম কাজ সেখানে খাঁটি। একটা বিশ্বাস, একটা আস্থা জেগে উঠতে থাকলো। নিজে কাজ করতে পারার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা ভিতর থেকে চাপ দিচ্ছিলো। দীনেশবাবু এবং তাঁর দাদা সমানে যোগ রেখে চলেছিলেন। লাঠিখেলার পরে সেই বাড়ির ছাতেই দীনেশবাবু আমার ছোটো-ছোটো প্রশ্নের উত্তর দেন। আবার কখনো বলেন, 'এ-সব প্রশ্ন আমাকে নয়, দাদাকে।' আসেন তাঁর দাদা, চলে নানা আলোচনা। তাঁরা আমার প্রশ্নের উত্তর দেন বটে, কারণ সেটা আমার প্রয়োজন। কিন্তু তাঁদের প্রয়োজনে তাঁরা প্রতিদিনের আলোচনার ফাঁকে-ফাঁকে আমাকে তৈরি করেন, পরীক্ষা করেন। তখন কিন্তু আমি কিছুই বুঝিনি।

একদিন বললাম, 'কল্যাণী না এলে আমি একা এদিকে আসতে পারবো না।' আমার দুর্বলতা দেখে দীনেশবাবুর দাদা হেসে বললেন, 'সে কি? এই দুর্গম পথে সাথী ছাড়া আসতে পারবেন না? এখানে সঙ্গী পাবেন কোথায়? সবই তো একা করতে হবে।'

খুব লজ্জা পেলাম। বাড়ি ফিরে এসে মনে হ'তে লাগলো, একেবারে একা চলতে হবে, করতে হবে, সইতে হবে। জেলে যেতে হবে একা, গুলি খেয়ে মরতে হবে একা, স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে ফাঁসি যেতে হবে একা। শেষ অবধি সবই যার একা করতে হবে

সে চলবার পথে সাথীর প্রত্যাশা করে কেন? শুরু থেকে একা চলতে শিখলে তবেই তো শেষ অবধি হাসিমুখে একা এগুতে পারবো।

আমাকে শিক্ষা দিতেন কখনো হেসে, কখনো ঠাট্টা ক'রে বা অপ্রস্তুত ক'রে। কিন্তু কখনো আঘাত করতেন না, চাল দিতেন না। বরং এত বেশি ঢেকে-চেপে কথা বলতেন যে, ভাবতাম, এঁরা অনর্থক বড়ো বেশি চেপে থাকেন।

কয়েক মাস ধ'রে চলেছে আলোচনা। বই এনে দেন একটার-পর-একটা। আয়ারল্যাণ্ডের বিদ্রোহ, রাশিয়ার বিদ্রোহ, বিপ্লবী-দের জীবনী, ইতিহাস, আরো কতো কি। একদিন আলোচনা যখন ঘনিয়ে উঠেছে তখন দীনেশের দাদা প্রশ্ন করলেন, আমি কি স্থির করেছি? অর্থাৎ ওঁদের সঙ্গে কাজ করবো কিনা। সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিলাম, না-ক'রে আমি থাকতে পারবো না।

তিনি তখন ব্যক্তিগত জীবনের কষ্টকর দিকটা খুলে ধরলেন আমাকে তৈরি করবার জন্য। বললেন, 'এটা কিন্তু একটা খেয়াল বা খুশি নয়, তু-দিনের হুজুগ বা উত্তেজনা নয়। বিপ্লবীদের হচ্ছে সারাজীবনব্যাপী সাধনা, এটা একটা ব্রত। এই সাধনায় একবার ব্রতী হ'লে সুখ নেই কোথাও, শান্তি নেই, শুধু নিরাশার অন্ধকার কেটে-কেটে পথচলা। কেবলি আসবে আঘাত আর নৈরাশ্য। একদিকে নাম নেই, যশ নেই, প্রতিষ্ঠা নেই, অন্যদিকে নিজের পারিবারিক জীবন প্রচণ্ড ধাক্কায়, নিষ্ঠুর আঘাতে ভেঙে পড়ে, সবই হাসিমুখে সইতে হয়। বাবা-মাকে তিলে-তিলে কষ্ট দিতে পারবেন তো? সংসারে তাঁরা আপনার কাছ থেকে বিন্দুমাত্র আশা যেন না রাখেন তেমনি ক'রে তাঁদের মনকে নিরাশায় ও নিরাশ্বাসে তৈরি করতে হবে। সেখানেও শক্ত হ'তে হবে। নিজে তুঃখ পাওয়ার চেয়ে বাবা-মাকে তুঃখ দেওয়া অনেক বেশি কঠিন। পারবেন তো?'

'পারবো।' আমার দুর্বল জায়গায় আঘাত করেছিলেন তিনি। আঘাত দেওয়া যে সত্যিই কতো কঠিন সে-পরীক্ষা চলেছিলো আমার এবং বাবার বাকি জীবনের উপর দিয়ে। কিন্তু তখন তা জানতাম না।

শেষকালে তিনি বললেন, 'এখানে সবই তো দুঃখকষ্ট, তবুও আমরা কাজ ক'রে যাই। স্বাধীনতা আনবার জন্য আমরা তৈরি হচ্ছি, পরাধীনতার অপমান নীরবে সহ্য না ক'রে একটা অসম-সাহসিক চেষ্টায় ইংরেজকে জানাবো আমাদের প্রতিবাদ, হানবো আঘাত, এই হচ্ছে আমাদের একমাত্র তৃপ্তি ও সান্ত্বনা। দেশব্যাপী বিপ্লবের পর যেদিন ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আসবে, সেদিন আমাদের সাফল্য ও সার্থকতা। এ ছাড়া আর-কিছু আমরা জানি না।'

বাড়ি ফিরে আসার পথে আমার মনে হ'তে লাগলো, এঁদের চরিত্রে কোথাও শিথিলতা নেই। দীনেশবাবু এবং তাঁর দাদা যেন এক-একটি জমাটবাঁধা নিরুদ্ধ শক্তি।

বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছি। কল্যাণীকে একদিন জিগ্যেস করলাম, সে এদিকে আসবে কিনা। কল্যাণী তখন ছাত্রীসংঘ নিয়ে খুব ব্যস্ত। মধুর ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে কল্যাণী বললে, 'দেখ্ ভাই, ছাত্রীসংঘ গ'ড়ে তুলতে আমি খুব তৃপ্তি পাচ্ছি। তুই বিপ্লবীদের মধ্যে গিয়ে ভালো আছিস, ভালোই হ'লো। আমি না-গেলাম।'

সুরমা বললে, 'আমি এম. এ. পাস ক'রে জ্ঞান আহরণ করবো।'

ব্যর্থ হ'য়ে ফিরি। সঙ্গীহীন হ'তে আর তত ভয় নেই। আমাকে ওঁরা বলেছেন প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলতে। যাকেই একটু বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়, তাকেই লক্ষ্য করতে থাকি, কথা ব'লে বোঝাতে থাকি। একটু এগিয়ে এলেই বড়োদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। লাভ বড়ো হয় না। সত্যিই খুব কম লোক এ-পথে আসে।

ছাত্রীসংঘ সাঁতারকাটা শেখায়। পুকুর আছে শ্রীশ নন্দীর বাগানে। আমি সাঁতার জানি, তবুও যাই। কতো মেয়ে আসে সেখানে সাঁতার শিখতে। প্রায়ই দেখি পুটু সাঁতার কাটে। পুটু অর্থাৎ সুহাসিনী গাঙ্গুলি লম্বা-চওড়া মেয়ে, হাসিতে খুশিতে ভরপুর। একটা জীবন্ত ভাব ওর চোখেমুখে। অফুরন্ত কথা বলার মধ্যে ওর অজস্র হাসি আমাকে আকর্ষণ করে। খেয়াল করতে থাকি। একদিন তাকে ধ'রে ফেললাম। যতই কথা বলি ততই সে হাসে, সবই যেন হাল্‌কা ক'রে উড়িয়ে দিতে চায়। আমি তবু ছাড়ি না। আমার চোখে পুটু তখন একটি নতুন ধরনের মানুষ। সংসারে কতো টাইপের মেয়ে আছে, পুটুও একটি। বাইরে মিশতে গিয়ে নানা লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়। নানান্ তাদের বৈশিষ্ট্য। সকলের মধ্যেই নানা গুণ, দোষও যথেষ্ট। আমি তখনো মানুষের দোষের দিকটা ততখানি ধরতে পারতাম না। যত লোকের সঙ্গে মিশেছি, আলাপ করেছি, বেশির ভাগের কাছ থেকে ব্যর্থ হ'লেও আমার

জীবনের প্রাচুর্য বেড়েছে নানারকমটি দেখতে-দেখতে, বুঝতে-বুঝতে। তারপর পুটুকে পরিচয় করিয়ে দিই দাদার সঙ্গে, দীনেশ-বাবুর সঙ্গে। এবার তাঁরা বুঝুন, আমার প্রারম্ভিক কাজ হ'য়ে গেছে।

পুটু ডেফ্ অ্যাণ্ড ডাম্ব্ স্কুলের শিক্ষয়িত্রী, সেখানেই বোর্ডিং-এ থাকে। পুটু তো আমার মতো কাঠখোট্টা নয়। আমি দাদাদের নিয়ে গেলাম পরিচয় করিয়ে দিতে। পুটু একেবারে সাড়ম্বরে থালা সাজিয়ে খাবার তৈরি ক'রে রেখেছে আমাদের আগমনের প্রতীক্ষায়। আমার সঙ্গে দাদাদের ছিলো শুক্‌নো আলোচনা। পুটু তার ধার ধারে না। সে খাইয়ে-দাইয়ে হেসে হাসিয়ে একটা নতুন পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে তুললো। তারপর বললো, 'এবার বলুন।'

শুরু হ'লো পুটু-অধ্যায়। একটা বিশেষ জিনিস লক্ষ্য করলাম। আমার সঙ্গে কথা বলার সময় ঠিক আমার মতনটি হ'য়ে এঁরা কথা বলেছেন। আবার পুটুর সঙ্গে অন্যরকম পরিবেশে অন্য ধরনের আলোচনা চলছে। ঠিক পুটু যা চায় তাতে এটাই যেন খাপ খায়। আমার কেবলি মনে হ'তো, শেষ অবধি এঁরা তো একই জায়গায় পৌঁছবেন, তবে সেই আসল কথাটা এঁরা কেন বলছেন না? কবে সেই কথা বলবেন? কিছুতেই কোনোদিনই পুটু সেই আমার মতো প্রশ্ন করেনি। তাই আমার বার-বার মনে হ'তো যেন আসল প্রশ্ন পুটুর বাকি র'য়ে গেল। প্রশ্ন যে সবার এক নয়, চিন্তাধারা যে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন ধারায় ব'য়ে চলে এ-কথা আমার সেদিন জানা ছিলো না বটে, কিন্তু দাদাদের জানা ছিলো। তাই তাঁরা আমার কাছে আমার মতো আবার পুটুর কাছে পুটুর মতন। তবু সবাই চলেছি একই পথে, একই পরিণতির দিকে। পুটুকে নিয়ে হয়েছিলাম মেয়েরা তিন বন্ধু। আড্ডা ছিলো লেডিস্-পার্কে। এমনি ক'রে কাটছিলো ১৯৩০ সালের প্রথম দিক অবধি।

॥ পাঁচ ॥

ওদিকে আমাদের বাড়িতে চলেছে প্রলয় কাণ্ড। বাবা তাঁর বড়ো কন্যাকে অনেক আশা নিয়ে, অনেক কষ্টে বড়ো ক'রে তুলেছেন। ইউনিভার্সিটিতে পড়ে সে। কিন্তু কেমন যেন বিগ্‌ড়ে গেছে মেয়ে। বি. এ. পাস করার পর থেকেই সে বদ্‌লে যাচ্ছে। আতঙ্কে আশঙ্কায় তিনি আর বাঁচেন না। মেয়েকে উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করার আকাঙ্ক্ষা যতই বাবা-মা'র মনে জোর পেতে লাগলো, মেয়ে ততই বেঁকে বসতে থাকলো। অশান্তির আগুন কাকে বলে তার সঙ্গে হ'তে লাগলো পিতা-পুত্রীর নিত্য পরিচয়। সমস্ত সংসারটা ঝল্‌সে যেতে চাইছিলো। ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যায় মেয়ে, কিন্তু সেখানে তাকে প্রায়ই খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রতিদিন বিকেলে যায় লেডিস্‌-পার্কে। কোথায় যাচ্ছে জিগ্যেস করলে বলে, অত কৈফিয়ত দেবো না। একদিনও বাধা মানে না। ফেরে সন্ধ্যার পরে যখন খুশি। বিয়ের কথা শুনলে খেপে আগুন। বাধ্য, শান্ত মেয়েটি কখন এবং কেমন ক'রে যে এমন অবাধ্য এবং নির্মম কঠিন হ'য়ে উঠলো সে-কথা বাবা-মা'র কাছে দুর্বোধ্য হ'য়ে আসে। তবে কি মেয়ে লেখাপড়া শিখে বাইরে প্রেম ক'রে বেড়াচ্ছে? মেয়ে ভাবে, ভালোই হ'লো, তাই ভাবুন, তা হ'লে বিপ্লবীদলের কথা এঁরা সন্দেহ করতে পারবেন না। সেই পরীক্ষা শুরু হোক্‌।

মেয়ের কাহিনী তো বাবা জানেন না। তিনি থেকে-থেকে ডেকে পাঠান মেয়েকে। পাশে বসিয়ে আদর ক'রে পিঠে হাত বুলিয়ে জিগ্যেস করেন, কী হয়েছে তার? কেন অমন পালিয়ে বেড়ায়? কেন বাড়িতে মুখভার ক'রে থাকে? কেন বিয়েতে তার আপত্তি? কী সে চায়?

তিনি বোঝাতে থাকেন, ভবিষ্যৎ জীবন আসে সহস্র সংঘাত নিয়ে। তার সম্মুখীন হ'তে উপযুক্ত হ'তে হয় বিবাহিত জীবনের

মধ্য দিয়ে। এমনি মিষ্টি ক'রে কতো উপদেশ দিয়ে যান। মেয়ে তো কোনো কথারই উত্তর দেয় না। অনুরোধ উপরোধের কোনো মূল্যই নেই যেন। কখনো বাবার স্বর কঠিন হ'য়ে উঠলো, আবার তখনি মিনতি ক'রে বলেন, 'আমি বাবা হ'য়ে তোমার কাছে এমন কি অপরাধ করেছি যে, আমার কথার উত্তর দাও না? শুধু বলো, তুমি কি চাও? কেন আমার সঙ্গে কথা বলো না? আমি তোমার উপযুক্ত বাবা নই, তাই এমন হ'লো?' তবুও উত্তর না পেয়ে তিনি নিজের বুকে নিজে করাঘাত করতে থাকেন। তাঁর চোখের জলে আর নিজেকে মারার দৃশ্যে মেয়ে বিহ্বল হ'য়ে যায়। তবুও দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সে ভাবে, সে যেন পাথর হ'তে পারে। বাবার এই দুঃখ পাওয়া যেন পাথরে আঘাত খেয়ে দাগ না কেটে চ'লে যায়। এর চেয়ে বাবা যদি মেয়েকে মারতেন তা হ'লে বোধ হয় সহ্য করা সহজ হ'তো। মেয়ে জানে আঘাত পাওয়ার চেয়ে বাবা-মাকে আঘাত দেওয়া কতো কঠিন, কতো সাংঘাতিক। বিনা অপরাধে নিষ্ঠুর হওয়া যে কতো মর্মান্তিক সে-কথা জানে সেদিনকার বিপ্লবী ছেলেমেয়েরা।

জানি না বাবার জীবনের সেই চোখের জলের মূল্য কোথাও আছে কিনা। মেয়ের দেওয়া দুঃখ বাবাকে যে দাম দিয়ে গ্রহণ করতে হয়েছিলো তার কোনো সার্থকতা কোথাও আছে কিনা তাও জানি না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-যুদ্ধে কতো প্রাণই যে বলি গেছে, কতো হৃদয়-নিংড়ানো দুঃখ তারা জীবন ভ'রে তিলে-তিলে বহন ক'রে গেছে, সে-কথা জানে ইতিহাস, জানে জগৎ। কিন্তু এ-কথা কি জানে তারা যে, কতো বাবা সন্তানকে চোখের জলের স্রোতের মধ্য দিয়ে কেমন ক'রে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিলেন আর কেমন ক'রে সন্তানেরা নিষ্ঠুর আঘাতে তাঁদের ছিট্‌কে ফেলে দিয়ে নিজেদের ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলো? কোমল মায়ের অশ্রুধারা অনেককেই দুঃখ দেয়, কিন্তু পিতার অশ্রু? সে যে পুরুষের পাথরগলা বন্যা।

তাই বুঝি এত বেশি বিচলিত করে। একটি ছেলে বা একটি মেয়েকে কেন্দ্র ক'রে সে-সংসারের রূপ আগুনের ঝলকে আধপোড়া হ'য়ে যায়। লোকে দেখে শুধু কর্মীকে, দেখে না সংসারটিকে, জানে না বাড়ির পরিপূর্ণ রূপকে। সংসারের সব অবস্থা দেখেশুনেও, বুঝে নিয়েও কিন্তু কর্মী সেই যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আর ফিরে আসে না। এই কর্মজগতের নেশা এমনই দুর্দম, এমনই চুম্বকময়।

॥ ছয় ॥

নানা কারণে শরীর আমার খারাপ হ'য়ে গিয়েছিলো। ইউনিভার্সিটিতে যাই কিন্তু পড়াশুনা করি না। পড়াশুনা ছাড়া বাকি সব কাজই তখন আসল। সময় যেন নিজের স্বার্থের জন্য নয়। শরীর যখন আর বইতে পারছে না তখন মাকে দিয়ে বাবা ব'লে পাঠালেন দার্জিলিং যাবার কথা। বাড়ির সবাইও যাবে। কিন্তু সবই আমার জন্য। বাবা হয়তো ভেবেছিলেন চেঞ্জে গেলে আমার শরীর মন ভালো হবে, পরীক্ষার জন্য তৈরি হ'তে পারবো। কারণ সে-বছরেই ছিলো পরীক্ষা।

বোধ হয় মার্চের শেষে যাচ্ছি দার্জিলিং। দলের দিক থেকে দাদা জানিয়ে দিলেন শিগ্‌গির শরীর সারিয়ে নিতে, খবর পেলেই যেন চ'লে আসি। তখন কি জানি কেন এই তাড়া!

দার্জিলিং গিয়ে শরীরটা সেরে উঠছিলো। কিন্তু সংসারে আমি আর জোড়া লাগছিলাম না। সব-কিছু থেকেই নিজেকে আলগা রেখে, সরিয়ে রেখে চলেছিলাম, যেন তাঁরা আমাকে আর আশা না করেন। কাজেই বাড়িতে ছিলো একটা গভীর বেদনার ছায়া। আমি চাইলেও বাবা আশা না ক'রে পারতেন না, কাজেই যতই আশা করতেন, যতই আমাকে কাছে টানতে চেষ্টা করতেন ততই আঘাত পেতেন। আমার মনে প্রলেপ দেবার জন্য, একটু আনন্দ দেবার জন্য কতো জায়গায় যে বেড়াতে নিয়ে যেতেন তার ঠিক নেই।

হঠাৎ একদিন খবরের কাগজে দেখি চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হ'য়ে গেছে, বিপ্লবীরা লুণ্ঠিত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ইংরেজের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে চলেছে পাহাড়ে-পাহাড়ে, ইত্যাদি আরো কতো কি। প্রাণটা আমার নেচে উঠলো। আমার মনে পড়ছিলো, সেই যে দাদা বলেছিলেন, আমাদের দেশে ইন্‌সারেকশান আসবে,

ক্রমবর্ধমান বিদ্রোহ বিপ্লবের রূপ গ্রহণ করবে। এ কি তাই? কাউকেই কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারি না। নিজের মনে ছট্‌ফট্ ক'রে মরি। দম বন্ধ ক'রে প্রস্তুত থাকি যদি আমারও ডাক পড়ে। তৈরি ক'রে রাখি পথঘাট, যেন ডাক এলেই একটুও দেরি না হয় পা বাড়িয়ে দিতে।

আমাদের বাড়ির নিচেই ছিলো স্বামী অভেদানন্দের আশ্রম। সেখানকার একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমার বেশ পরিচয় হ'য়ে গিয়েছিলো। তাঁর নামে মাঝে-মাঝে আমার চিঠিও আসতো। তিনি এক-একদিন আমার সঙ্গে দেশের নানা কথা আলোচনা করতেন। একদিন আলোচনা তুললেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কথা, সেই সঙ্গে তাঁর শোনা চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের ক্রিয়াকলাপের নানা কাহিনীও ব'লে গেলেন। আলোচনার মধ্যে ফুটে উঠলো তাঁর পরিপূর্ণ সহানুভূতি। সন্ন্যাসীর আগ্রহপূর্ণ আলোচনা আমাকে প্রস্তুত থাকতে পথ দেখায়। একটু আভাসে আমি ব'লে রাখি যে, যদি আমি কখনো কোনো কারণে একা দার্জিলিং থেকে চ'লে যাই তবে তিনি আমাকে সাহায্য করবেন কিনা। একটুও দ্বিধা না ক'রে তিনি ব'লে ওঠেন, 'নিশ্চয়ই।' আমি বলি, 'টাকা?' তিনি বললেন, 'তাও দেবো।'

সন্ন্যাসীর মধ্যেও যে কতোখানি স্বদেশ প্রেম, সন্ন্যাসজীবনের বাইরের জীবনের প্রতিও যে কতোখানি আগ্রহ ও উদারতা থাকতে পারে তা দেখেছি এই সন্ন্যাসীর মধ্যে। আমি যেন একটা মস্ত অবলম্বন খুঁজে পাই। আর প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে অপেক্ষা করতে থাকি কখন আমিও ডুবে যেতে পারবো বিপ্লবের ওই বিরাট প্লাবনে।

প্রায় আড়াই মাস ছিলাম দার্জিলিং-এ। বোধ হয় সেটা ছিলো ১৯৩০-এর জুন মাস। দাদা এবার চিঠি লিখলেন কলকাতায় ফিরে যেতে। কাজের দরকার আছে। এই ডাক এলে আমি

যেন প্রস্তুত থাকতে পারি সেজন্যই চারিদিকের আটঘাট বেঁধে আগে থেকেই তৈরি ছিলাম।

তখনকার দিনে সাধারণতঃ মেয়েরা কলকাতাতেই বড়ো-একটা একা যাতায়াত করতো না। দার্জিলিং থেকে কলকাতা একা আসা তো কল্পনার বাইরে। বেদান্ত আশ্রমের সেই সন্ন্যাসীকে গিয়ে এবারে বললাম, 'আমি কলকাতা যাবো, টাকা নেই, আমাকে টিকেট কিনে দেবেন?' কখন ট্রেন, কোথায় নামবো, কোথায় ট্রেন বদলাতে হবে সব তিনি খুব যত্নের সঙ্গে ব'লে দিলেন। আর গভীর সহানুভূতির কণ্ঠে বললেন, 'মা-বেচারীকে একখানা চিঠি লিখে ভোরে আমাকে দেবেন, আমি ডাকে দিয়ে দেবো, সন্ধ্যাবেলায় সেই চিঠি পেয়ে সব জানবেন তিনি। তখন আপনি শিলিগুড়িতে।' আমি রাজি হ'য়ে ভোরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। অন্ধকার থাকতে উঠে খান দুই শাড়ি ব্লাউজ একটা পোঁটলা ক'রে এক মুসলমান ভদ্রমহিলার কাছে রেখে, মাকে চিঠি লিখে সন্ন্যাসীর হাতে দিয়ে আমি ভালো মানুষটির মতো বাড়ি ফিরে এলাম। ট্রেন বারোটায়।

কাউকে কিছু না-ব'লে ট্রেনে উঠে বসলাম। তারপর শিলিগুড়িতে ট্রেন বদ্‌লে নিশ্চিন্ত হ'লাম। ভোরে যখন শিয়ালদাতে ট্রেন এলো, দেখি, আমার জ্যাঠতুতো ভাই দাঁড়িয়ে আছে। আমি তো অবাক। সে বললে আমার মা নাকি তাকে টেলিগ্রাম করেছেন স্টেশনে এসে আমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে। হায়রে মায়ের মন! দার্জিলিং থেকে যে-মেয়ে একা কলকাতা আসতে পারে সে নাকি শিয়ালদা থেকে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের কাছে বাড়িতে একা যেতে পারবে না!

তারপর দীনেশবাবু এবং দাদার সঙ্গে দেখা। তাঁরা বললেন, এখন যে-কাজ করতে হবে তা আমার বাড়িতে থাকলে করা সম্ভব হবে না। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা দরকার। অতএব বোর্ডিং বা হোস্টেল একটা যোগাড় করতে হবে।

গড়পারে কল্যাণীদের একটা হোস্টেল ছিলো। সেখানেই আস্তানা ঠিক করলাম। হোস্টেলের বাসিন্দারা আমাকে ম্যানেজার হ'তে অনুরোধ করলেন। রাজী হ'য়ে গেলাম। ওদিকে বাবা-মা ভয় পেয়ে দার্জিলিং থেকে চ'লে আসছেন। কাজেই তাঁরা আসবার আগেই আমি হোস্টেলে চ'লে গেলাম। মাকে রোজই একবার এসে দেখা দিয়ে যেতাম যে, আমি ভালো আছি। মা রোজই সেই সুযোগে ভাত খাইয়ে দিতেন, আমি খেয়ে যেন তাঁদেরি দয়া করতাম। বাবা অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন। শুরু হয়েছিলো তাঁর পিত্তকোষে পাথরের বেদনা। তবু আমি নির্দয়, কঠিন। বাড়িতে থাকা আমার সম্ভব নয়।

দাদা বলেছেন, কর্মীদের টাকা পয়সা সম্বন্ধে দলের বোঝা হওয়া উচিত নয়, বরং দলকেই সাহায্য করা উচিত। কাজেই হোস্টেল-খরচ চালাবার জন্য তুটো টিউশানি যোগাড় করেছি। বাকি সময়টা ভালোমানুষটির মতো থাকছি আর দলের আদেশ পালন করছি।

সে-সময়ে পুটু ছিলো চন্দননগরে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পাঁচজন পলাতক বিপ্লবীকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিলো চন্দননগরের একটা বাড়িতে। অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, জীবন (মাখন) ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্ত। দাদা পুটুকে পাঠিয়েছিলেন সেই বাড়ির দায়িত্ব দিয়ে।

মেয়েরা তো আগেও অনেকেই পলাতকদের আশ্রয় দিয়েছেন। কিন্তু চট্টগ্রামের পলাতকদের আশ্রয় দেবার জন্য একটা নতুন পরিকল্পনা করা হয়েছিলো। পুলিসের অজ্ঞাত কোনো তুঃসাহসী মেয়ে-কর্মী যদি কারও স্ত্রী সেজে নিজের-গড়া-সংসারে ওঁদের আশ্রয় দেয় তা হ'লে ব্যবস্থাটা খুব নিরাপদ হ'তে পারে। এই পরিকল্পনা কাজে পরিণত করবার জন্য দাদা পুটুকে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, সে এই কাজ করতে পারবে কিনা। পুটুর ছিলো একটা তুঃসাহসী প্রাণ।

কর্মী হ'য়ে পারবো না বলা পুটুর কর্ম ছিলো না। হাসতে-হাসতেই পুটু রাজি হ'য়ে গেল। দাদা সাজিয়েছিলেন সেটা যেন পুটুর সংসার। সেখানে একটা স্কুলে পুটু চাকরি করতো। তার স্বামী সেজে সেখানে ছিলেন শশধর আচার্য। তিনি চাকরি করতেন রেলওয়েতে। দেখতে গোবেচারী ভালো মানুষটি, ঠিক পুটুর উল্টো। পুটুর ছোটো ভাই সেজে রয়েছে সেখানে হেমন্ত তরফদার। পরিপূর্ণ একটি দার্শনিক মন তার। বছর কুড়ি বয়স। অতি শান্ত, নির্দোষ চেহারার এই ছেলেটি 'মেজদি' ডেকে পুটুর স্নেহ কেড়ে নিয়েছে প্রথম দিন থেকেই।

অনেকদিন পর্যন্ত পুলিস টের পায়নি যে, ওই তিনটি বিপ্লবী কর্মীর পাতানো সংসারে বিপ্লবীরা লুকিয়ে থাকতে পারে।

এবার আমার অবস্থাটা বলি। একদিন দীনেশবাবু এসে বললেন, 'চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন দিয়ে যে-বিপ্লবের সূচনা হয়েছে তার পরিণতি দেখবেন সারা দেশে ছেয়ে গেছে।'

আছি গড়পার হোস্টেলেই। দাদার কাছ থেকে যা-কিছু নির্দেশ আসছে তা পালন করছি অক্ষরে-অক্ষরে একেবারে বেদবাক্যের মতো। একদিন দাদা খুলেই বললেন, একটা বিপ্লবী প্রচেষ্টা চলছে, তারই প্রয়োজনে আমাকে দার্জিলিং থেকে ডেকে আনা হয়েছে। বড়োরা অনেকেই গ্রেপ্তার হ'য়ে গেছেন। কিন্তু বিপ্লবী প্রচেষ্টাকে কাজে পরিণত করতে হবে বাকিদের। দাদা যদি গ্রেপ্তার হ'য়ে যান তবে মনোরঞ্জন গুপ্ত নামে তাঁর এক দাদা সোজাসুজি যোগ রাখবেন আমার সঙ্গে। অর্থাৎ যোগসূত্রটা জানিয়ে রাখলেন যাতে আমি তাঁকে অবিশ্বাস না করি। বললেন, বড়োরা যদি সবাই গ্রেপ্তার হ'য়ে যান তবে যেন আমার নিজের ওপরে ভার এসেছে মনে করি। আরো বললেন, কতকগুলি বোমা তৈরি হয়েছে,

সেগুলি আমাকে নির্দিষ্ট স্থানে বিলি করতে হবে। সমস্তটা দায়িত্ব এবং গুরুত্ব বুঝিয়ে দিলেন। তার পরে এক-একদিন স্যুটকেস এবং টিনের বাক্স বোঝাই বোমা উনি আমার হাতে দিয়ে দেন। তাঁর কথামতো আমি সেগুলি নিয়ে কখনো পৌঁছে দিয়ে আসি যথাস্থানে, কখনো এনে রাখি হোস্টেলে। অপরিচিত কিন্তু চিহ্নিত মানুষ এসে সেগুলি নিয়ে চ'লে যায়।

আর-একদিন দাদা বললেন, বোমাগুলি তৈরি হ'য়ে যেখানে আছে সেখানে রাখা আর নিরাপদ নয়। জিগ্যেস করলেন আমার কাছে রাখা যায় কিনা। আমি তো কৃতার্থ। মহানন্দে রাজী হ'য়ে গেলাম।

সেদিনই রাত্রে একটি ভদ্রলোক একটা ট্যাক্সি নিয়ে এসে উপস্থিত। আমি কাছে যেতেই বললেন, ফল এসেছে। বুঝে নিলাম ব্যাপারটা। বিরাট একটা ধামা ট্যাক্সিতে বসানো রয়েছে। ধামার ওপরটা ফল দিয়ে ঢাকা। কারো সাধ্য নেই যে বুঝবে, ফলের তলায় কি আছে। এমনি ক'রেই হয়তো মরাঠীশ্রেষ্ঠ শিবাজী পালিয়েছিলেন ফল আর মিষ্টান্নভরা ঝুড়িতে। আমাদের অত বড়ো একটা ফলের ঝুড়ি শিখ ড্রাইভারেরও সাধ্য ছিলো না একা নামায়। হোস্টেলের ঠাকুরকে ডাকলাম। বিহারীঠাকুর খুব জোয়ান। তুই শক্তিমান পুরুষ সেই ঝুড়িটা দোতলায় আমার ঘরে এনে দিয়ে গেল। ট্যাক্সি বিদায় হ'লো। এই ভদ্রলোকের নাম আমি তখন জানিনি। তাই আমি উল্লেখ করতাম 'ধামা' ব'লে। পরে জেনেছি, ইনি মনোরঞ্জন রায়।

বোমাগুলির জন্য আগেই কয়েকটা ছোটো-ছোটো টিনের স্যুটকেস কিনে রাখা ছিলো, তা ছাড়া ছিলো আমার বড়ো ট্রাঙ্ক। ট্রাঙ্কে যত ধরলো সব তো রেখে নিশ্চিন্ত। কিন্তু স্যুটকেসগুলি রাখি কোথায়! অত ভারি দেখে কেউ যদি কিছু জিজ্ঞাসা করে? একটা

বুদ্ধি মাথায় এলো। আমিই তো ম্যানেজার। একতলায় ভাঁড়ারের চাবি তো আমার কাছে। কাজেই ভাঁড়ারঘরে তালা বন্ধ ক'রে রেখে দিলে কেউ টের পাবে না। তাই সেখানেই রাখলাম।

রাত্রে আর ঘুম আসে না। খুট্ ক'রে একটু শব্দ হ'লেই মনে হয় কেউ বুঝি সন্দেহ ক'রে ট্রাঙ্ক খুলছে। আবার দূরে শব্দ হ'লেই মনে হয় কেউ বুঝি ভাঁড়ারঘর খুলে সব নিয়ে গেল। উঠে গিয়ে ঘুরে-ঘুরে সমস্ত বাড়িটা দেখে আসি সব ঠিক আছে কিনা। যেন ওই জিনিসের জন্য তুনিয়াসুদ্ধ লোক অনুসন্ধান ক'রে বেড়াচ্ছে, আমি রয়েছি পাহারা, একটু অসতর্ক হ'লেই সর্বনাশ। সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে তাই কড়া প্রহরী দিবানিশি জেগে থাকবে, বিন্দুমাত্র ত্রুটি হ'লে ক্ষমা নেই, মৃত্যুদণ্ড নিয়েও প্রতিবিধান নেই।

দাদা এক-একদিন এক-একজন অপরিচিতকে বিশেষ পরিচয় দিয়ে পাঠিয়ে দেন। আরো স্যুটকেস আসে। নির্দেশমতো এক একটা স্যুটকেস আমি ভর্তি ক'রে রাখি। নির্দিষ্ট মানুষ এসে সেগুলি নিয়ে চ'লে যায় নীরবে। এমন নিঃশব্দে চলেছিলো সেই নিয়ে চ'লে যাওয়া, অথবা আমার দিয়ে চ'লে আসা, যেন কথা বলারও কারো সময় নেই, প্রশ্নেরও ভার সইবে না। আমাদের হোস্টেলটা যেন একটা প্রয়োজনীয় জংশন স্টেশন। গাড়ি বদলাবার জন্য নামতেই হবে, থামতেই হবে, আবার কাজটুকু হ'য়ে গেলেই অন্য গাড়িতে চ'লে যেতে হবে, পিছন ফিরে তাকিয়ে অপেক্ষা করবার সময় নেই। গুরুতর দায়িত্বভার মুখ বন্ধ ক'রে দিয়ে সামনের চাকায় ক্রমাগত চাপ দিচ্ছে এগিয়ে যেতে।

হোস্টেলের মেয়েরা বলতো, আমার নাকি ভিজিটার আসে অনেক এবং একই লোক দু-বার বড়ো-একটা আসে না। আরো বলতো যে, এই ভিজিটাররা যখন-তখন আসে এবং পাঁচ মিনিটের বেশি থাকে না। তাই হোস্টেলের মেয়েরা অবাক হ'য়ে যেতো।

সত্যিই তো দীনেশ মজুমদারের মতো দু-একজন ছাড়া বেশিক্ষণ তো কেউই থাকতেন না।

এমনি ক'রে দিন যায়। রাত্রে ঘুম সহজ হ'য়ে আসে। একদিন কি-একটা অত্যন্ত দরকারী কাজে বেরিয়ে গেছি। ফিরবার পথে দারুণ বৃষ্টিতে জল জ'মে গেল রাস্তায়। আমার কিন্তু সে-সময় একটা খবর নিয়ে ফিরতেই হবে। মনে হ'লো, বজ্রপাত নয়, ভূমিকম্প নয়, সামান্য বৃষ্টি আমাকে বাধা দেবে কেন ? কাজেই জেদ ক'রে সমস্তটা ফিরবার রাস্তা বৃষ্টিতে ভিজে কাজ সেরে ঠিক সময়ে ফিরলাম। কিন্তু অবাধ্য শরীর সে-ধাক্কা সামলাতে পারলো না। জ্বর আর গলার কষ্ট শুরু হ'লো। কথাও প্রায় বলতে পারছি না। সেদিন মাকে দেখা দিতে যাইনি। কাজেই মা নিজেই হোস্টেলে এসে হাজির। বললেন, 'ও মা, তোর অসুখ, এখানে কে তোকে দেখবে ? বাড়ি চল্। ভালো হ'লে আবার আসিস।' আমার বাড়ি যাবার প্রশ্ন তখন উঠতেই পারে না। মাথা নেড়ে চুপ ক'রে রইলাম। মায়ের অশ্রুধারা এবং সেদিনের বৃষ্টিধারা কি মনের কোথাও দাগ কেটেছিলো ? কোনো ধারাকেই গ্রাহ্য করা সেদিন সম্ভব ছিলো না।

তার পরদিন রাত্রে এলেন বাবা। বাবাকেই তখন সব চেয়ে ভয় পাই। তাঁর পিত্তকোষের বেদনা আগের দিনও উঠেছে। অল্প-অল্প বেদনা লেগেই আছে। উপুড় হ'য়ে পেট চেপে ধ'রে বাবা যখন হোস্টেলে এসে উপস্থিত হ'লেন, আমি ভাবলাম, অত বৃষ্টিতে কেনই বা ভিজতে গেলাম ! এখন বাবাকে নিয়ে কি করি ! বললাম, 'বাবা, আমি ভালো হ'য়ে গেছি। কালই ভাত খাবো, পরশু থেকে আবার বাড়ি যাবো, তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে বাড়ি যাও।'

'না, না, তা কি হয় ? তুমি বাড়ি ফিরে চলো। আমরা থাকতে তুমি কি হোস্টেলে অসুখে ভুগতে পারো ? চলো, আমি নিতে এসেছি।' বাবার গলা কাঁপছে, পেটটা চেপে ধ'রে আছেন। সবই

দেখছি, কিন্তু তাঁর অনুরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। কাঠ হ'য়ে রইলাম। এই কঠিন মূর্তি বাবা চিনতেন। ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে গেলেন তিনি। হৃদয়ের রুদ্ধ বেদনা গলা আট্‌কে ধরেছিলো তাঁর। তেমনি ক'রে পেট চেপে ধ'রে চ'লে গেলেন। আমি দরজায় দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে। রাত তখন ন'টা।

একদিন রাত্রে এলেন দীনেশবাবু।

'জানেন, আজকাল সিগারেট খাচ্ছি।'

'কেন ?'

'আর-একদিন হবে সে-কথা। আজ নয়।'

কেমন যেন বিদায়-বিদায় ভাব। তবু কিছুতেই বললেন না। অন্য গল্প ক'রে উঠে গেলেন।

আসল ব্যাপারটা ছিলো এই: তখন কলকাতার পুলিস কমিশনার টেগার্ট সাহেবকে হত্যা করবার ভার ছিলো দীনেশ মজুমদার, অনুজা সেন প্রভৃতির উপর। যে-বোমা তখন তৈরি হয়েছিলো তার বৈশিষ্ট্য ছিলো এই যে, ফিউজ-ওয়্যারে (fuse wire) আগুন লাগামাত্র ছুঁড়ে দিতে হবে, আগুন লেগেছে কিনা চেয়ে দেখবার সময় নেওয়া যাবে না, তা হ'লে তখুনি বোমা ফেটে গিয়ে সে নিজেই নিহত হবে। তাই দীনেশ বোমায় আগুন ধরাবার জন্য সিগারেট খাওয়া অভ্যাস করছিলেন। দীনেশবাবুর এ-সব কথা তো আমি তখন জানি না, কারণ, প্রয়োজন ছাড়া জানবার নিয়ম নেই।

দীনেশবাবু কেমন অদ্ভুত করুণভাবে বিদায় নিলেন, আমি বোকার মতো কিছুই বুঝতে পারলাম না। যাবার সময়ও বললেন, 'চ'লে যাচ্ছি বহুদূরে, হয়তো আর কোনোদিনও দেখা হবে না।' মূর্খের মতো জিগ্যেস করলাম, 'বলুন না কি হয়েছে ?' তিনি শুধু হেসে বিদায় নিলেন। সে-হাসির অর্থ আমি তখনো বুঝতে পারিনি।

একবারও মনে পড়লো না, দীনেশবাবুই বলেছিলেন, চট্টগ্রাম দিয়ে যে বিপ্লব শুরু হয়েছে সে-দাবানল ছড়িয়ে পড়বে দেশের সর্বত্র। দীনেশ নিজেই যে সে-আগুন ছড়িয়ে দিতে নিজের মাথাটি হেলায় বাড়িয়ে দিয়েছেন তা তো জানিনি। আমার দিক থেকে কোনো-দিনই তাঁকে বিদায় দেওয়া হ'লো না, তিনি কিন্তু চ'লে গেলেন।

॥ সাত ॥

দু-একদিন পরে। ১৯৩০ সালের ২৫ অগস্ট দুপুর বেলা। কাজকর্ম সেরে হোস্টেলে ফিরেছি। আমাদের বাড়ির কাছেই একটা বাড়ি পুলিসে তল্লাসী করছে। তারা সেখানে গ্রেপ্তার করতে গেছে 'ধামা'কে অর্থাৎ মনোরঞ্জন রায়কে। তাঁকে সেখানে পায়নি সেদিন, পেয়েছিলো আরেকদিন অন্যত্র। তল্লাসী করতে গিয়ে বালিশ ফেড়ে ফেলছে, মেজে খুঁড়ে দেখছে। অথচ বাড়িটার বাইরে রেখেছে শাদা পোশাক পরা সি. আই. ডি-র লোক। ভিতরে যে তল্লাসী হচ্ছে সে-কথা একেবারেই বোঝা যাচ্ছে না। না-বুঝে সে-বাড়িতে যারাই ঢুকছে তাদেরই গ্রেপ্তার করছে।

এই বাড়ির ভিতরে যে-ধরনের গ্রেপ্তার চলছিলো তার একটা কাহিনী বলি। সুধীর ঘোষ নামে একটি সতেরো বছরের ছেলে তার পরদিন ২৬ অগস্ট ঢুকে পড়েছে সেই বাড়িতে। কোমরে তার দুটো রিভলভার, একটা বোমা ও কিছু কার্ট্রিজ। হাতে একটা ছাতা। ঢুকে ভিতরে এগুতেই পুলিস তাকে গ্রেপ্তার করলো। মুহূর্তে ছেলেটি একেবারে ক্যাবলা সেজে গেল। বললে, তার নাম বিশ্বনাথ সরকার। বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। মনোরঞ্জন রায় তার মাস্টারমশাই। তাঁর কাছে পড়তে এসেছে। পুলিস তার অতি-গোবেচারী ভালোমানুষী ভাব দেখে একেবারে অবিশ্বাস করতে পারলো না। তার দেহ তল্লাসী না ক'রেই নিয়ে চললো ইলিসিয়াম রো-তে। সেখানে একটা ঘরে তাকে বসিয়ে রেখে অন্য ঘরে তারা টেলিফোন করতে গেল যে, এই ছেলেটাকে নিয়ে কি করা যায়। যে-সিপাইকে তার পাহারা রেখে গেল তার হাতে সুধীর চারটে পয়সা দিলো বিড়ি আনতে। সেও বোকা ছেলেটাকে বসিয়ে রেখে বিড়ি আনতে চ'লে গেল। তখন সুধীর তার কোমরের রিভলভার বোমা ও কার্ট্রিজগুলিকে একে-একে চট্‌পট্ ছাতাটার মধ্যে ঢোকাতে

লাগলো। পুলিস ইনস্‌পেক্টার ফিরে এসে তাকে প্রথমে একটা থানায় নিয়ে চললো ট্যাক্সি ক'রে। সুধীর ঘোষ ট্যাক্সি থেকে নামবার সময় ছাতাটাকে ইচ্ছে ক'রে ট্যাক্সির মধ্যে ফেলে গেল। থানায় ঢুকতেই ইনস্‌পেক্টার বললে, 'আপনার ছাতাটা তো ফেলে এলেন ট্যাক্সিতে, ডাকো ট্যাক্সিকে।' সুধীর তখন খুব তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে নিজেই নিয়ে এলো ছাতাটা, পাছে অন্যরা নিতে যায়। থানায় সুধীরের দেহ তল্লাসী হ'লো, কিন্তু ছাতাটা নয়। সেখান থেকে তাকে তার বাড়িতে তল্লাসী করতে নিয়ে চললো। বাড়িতে সুধীর পুলিসের পিছন-পিছন চলেছে। একটা ঘরের একপাশে লেপ-তোশক বোঝাই জায়গা ছিলো। তারই কোনায় সেই ভারি ছাতাটা রেখে, পুলিসের পিছনে যেতে-যেতে সুধীর তার দিদিকে আঙুলের ইশারায় ছাতাটা দেখিয়ে দিলো। দিদি আগেই কিছু জানতেন। কাজেই সহজে ব্যাপারটা বুঝে নিলেন। তিনি ছাতা এবং লেপ-তোশকগুলোতে ঠেস দিয়ে ব'সে নিজের সাত-আট মাসের শিশুকে ঠিক গ্রামের অশিক্ষিত মায়ের মতো আনাড়ীভাবে আপন বক্ষ অনাবৃত ক'রে দুধ পান করাতে লাগলেন। পুলিস যখন এই ঘরখানা তল্লাসী করতে এলো তখন ওই কোনাটুকু আর তল্লাসী করা প্রয়োজন বোধ করলো না। বেঁচে গেল সুধীর ও তার বাড়ি। তার ভগ্নীপতি তার পরে এগুলি একে-একে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসেন।

সুধীরকে আবার নিয়ে গেল ইলিসিয়াম রো-তে। ততক্ষণে পুলিস এই ক্যাবলা ছেলের অনেক খবরই জেনে গেছে। নামও তার বিশ্বনাথ সরকার নয়, দীন দুঃখী মায়ের একমাত্র সন্তানও নয়। শেষ জেরার সময় তাকে পুলিসের কর্তা বললেন, 'This time you have escaped. But next time we get you, you will have a rope round your neck.' অর্থাৎ এবার তুমি বেঁচে গেলে, পরে কায়দামতো পেলে তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবো।

এ-সমস্ত খবর আমি পরে জেনেছি। ২৫ অগস্ট আমাদের হোস্টেলের আশেপাশের বাড়িতে এইভাবে তল্লাসী চলেছিলো। পিছনের দিকে দীনেশ মজুমদারের বাড়িতেও পুলিস এসেছে। পুলিসের এত তল্লাসী দেখে আমার মনে ঘোর সন্দেহ এলো।

ব্যাপারটা কি জানবার জন্য এক বাড়িতে গেলাম। গিয়ে দেখি পুটু সেখানে ব'সে আছে। দু-দিনের জন্য এসেছে সে চন্দননগর থেকে। দাদাও আছেন। যে-বাড়িতে পলাতক অবস্থায় তিনি আছেন সেটা আর নিরাপদ কিনা সন্দেহ ক'রে তিনি আপাতত এ-বাড়িতে এসে ব'সে আছেন। আমি খবর জিগ্যেস করলাম। দাদা যা বললেন তাতে এটুকু বুঝলাম যে, দীনেশ মজুমদার, অনুজা সেন এবং আরো দু'টি ছেলে অতুল সেন ও শৈলেন নিয়োগী—এদের উপর ভার ছিলো টেগার্ট সাহেবকে হত্যা করবার। ড্যালহাউসি স্কোয়ারে টেগার্টের গাড়িটা ওরা বোমা এবং রিভলভার দিয়ে থামিয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু টেগার্ট মারা যায়নি। নিহত হয়েছেন অনুজা সেন। হয়তো বোমাটা ছুঁড়বার আগেই তাঁরই গায়ে ফেটে গেছে। গ্রেপ্তার হ'য়ে গেছেন দীনেশ মজুমদার। দীনেশের গ্রেপ্তারের এক ঘণ্টার মধ্যেই গ্রেপ্তার হয়ে যান ডাক্তার নারায়ণ রায় প্রভৃতি কয়েকজন। তার কারণ, দলের মধ্যে এমন লোক ছিলো যে পুলিসকে সব খবর দিতো এবং হয়তো আগে থেকেই কতকগুলি নাম ঠিকানাও সে পুলিসকে জানিয়ে রেখেছিলো।

সেই সময়ে অনেক বিপ্লবী কর্মী পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে নানাস্থানে আত্মগোপন ক'রে ছিলো। শিবু ও গোবিন্দ (শিবশংকর মিত্র ও গোবিন্দলাল ব্যানার্জি) নামে এমনি দু'টি কর্মী মানিকতলার একটা বাড়িতে পলাতক হ'য়ে রয়েছে। তাদের কিছু-কিছু দেখাশোনা

করতাম আমি। অন্ধকার স্যাঁৎসেতে ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে কী ভাবে যে তারা দিন কাটাতো! নোংরা নর্দমার দুর্গন্ধ। খেতো ডিম আর আলুসিদ্ধ ভাত, একটা স্টোভে রান্না ক'রে। না জানে রাঁধতে, না আছে বিছানা বালিশ। শোয় খবরের কাগজ বিছিয়ে ইট মাথায় দিয়ে। কেমন যেন হতভাগা তারা। কিন্তু প্রাণভরা ফুর্তি তাদের। শিবু বলে, মায়ে তাড়ানো বাপে খেদানো ছেলেরা এইরকমই থাকে, তারা ভালোই আছে। ভাবলাম, ওদের উপরেও হয়তো ওইরকম কিছু ভার দেওয়া আছে। রোজই প্রায় সন্ধ্যার পরে গিয়ে হতভাগা ছেলে দুটোকে দেখে আসি।

ওদিকে জিনিস তখনো এদিক-ওদিক আদান-প্রদান হচ্ছে। কখনো মাথায় বিরাট ঘোমটা টেনে, গাঁয়ের বধূর বেশে আড়ষ্ট পায়ে অন্যের সঙ্গে চলেছি, কখনো আধুনিকা সেজে রাত ন'টা দশটায় একা যাচ্ছি ট্যাক্সি ক'রে। জিনিস মানে আইনের নিষিদ্ধ বস্তু বোমা, রিভলভার ইত্যাদি।

একদিন রাত্রে গেছি মানিকতলায় পলাতক শিবুদের সেই অন্ধকার ঘরে। দাদার তখন থাকার জায়গার খুব অভাব। তিনি রয়েছেন সারাদিন অভুক্ত, গায়ে জ্বর প্রায় ১০২° ডিগ্রি। রাত্রে গেছেন মানিকতলার বাড়িতে, ওদের সঙ্গে দরকারী কথা বলবেন, আমাকেও নির্দেশ দেবেন। আসন্ন বিপদ তিনি প্রতি মুহূর্তেই আশঙ্কা করছিলেন। সব সময়ই নিজের গ্রেপ্তারকে মনে রেখে যা-কিছু বলবার ব'লে নিতেন। পুলিস চারিদিকে জাল ফেলে ছেঁকে তুলে গ্রেপ্তার চালিয়েছে। স্বয়ং টেগার্ট তখন সন্থ প্রাণে বেঁচে গেছে, তাকে হত্যার চেষ্টার প্রতিশোধ সে নেবে না? ডাক্তার নারায়ণ রায় থেকে মনোরঞ্জন রায় পর্যন্ত সবাই গ্রেপ্তার হ'য়ে গেছেন, আরো অনেকে যাচ্ছেন। কাজেই দাদা গ্রেপ্তার হ'য়ে গেলে কার-কার সঙ্গে যোগ রেখে কী ভাবে কাজ করতে হবে সে-সব কথা বুঝিয়ে দিলেন।

তিনি তখনো জানেন না যাঁদের সঙ্গে যোগসূত্র রাখতে বলছেন তাঁরাও অনেকে সেদিনই ধরা প'ড়ে গেছেন।

কথা শেষ ক'রে আমি যখন হোস্টেলে ফিরে গেলাম তখন বেশ রাত হয়েছে। ওদিকে দাদা যখন ও-বাড়ি থেকে বেরিয়ে চ'লে যাচ্ছেন তখন মানিকতলার মোড়ে চারিদিক থেকে এসে শাদা পোশাক পরা সি. আই. ডি-রা তাঁকে ঘিরে ধ'রে একেবারে আচম্‌কা গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গেল। আমি কিন্তু কিছুই জানলাম না।

রাত যখন তিনটে, হঠাৎ হোস্টেলের দরজায় ভীষণ ধাক্কা। দরজা ভেঙে ফেলে পুলিস ঢুকেছে। দারোয়ানটা ভয় পেয়ে আমাকে জানাতে এসেছে, 'পুলিস'। রাত তিনটে থেকে চললো তল্লাসী প্রত্যেকের প্রতিটি জিনিস।

ভোরের দিকে এক সি. আই. ডি আমার দিকে অঙ্গুলিসংকেত করলো, একজন অফিসার-গোছের পুলিস হুকুম করলো আমাকে একটা নির্দিষ্ট ঘরে ব'সে থাকতে। তন্ন-তন্ন ক'রে তল্লাসী ক'রেও কিছুই পেলো না—বোমাগুলো আগেই নিরাপদ স্থানে সরিয়ে দিয়েছিলাম। ভালোমানুষ আমাকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দেখিয়ে বললো, 'চলুন একবার আমাদের সঙ্গে, কয়েকখানা কাপড় নিয়ে নিন।'

হোস্টেলের মেয়েরা রাত তিনটে থেকে ভয়ে ম'রে যাচ্ছিলো। এখন আমাকে গ্রেপ্তার করছে শুনে অবাক হ'য়ে গেল। তারা কাপড়-জামা গুছিয়ে একেবারে খাইয়ে-দাইয়ে তৈরি ক'রে দিলো, যেন বাড়ির মেয়ে বহু দূরদেশে চ'লে যাচ্ছে। দরজার কাছে এসে সমস্বরে তারা ব'লে উঠলো, 'বন্দে মাতরম্‌'। তাদের চোখে ছিলো জল। তারিখ সেটা ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০ সাল।

নিয়ে চললো ইলিশিয়াম রো-তে। অত ভোরেও গিয়ে দেখি ঘর-ভর্তি লোক। সবাইকেই তখনি গ্রেপ্তার ক'রে আনা হয়েছে, আমারি অবস্থা সবার। দু-জন ছিলো আমার পরিচিত মেয়ে।

এক সময়ে পুলিসের এক বড়োকর্তার কাছে আমাকে নিয়ে গেল। পুলিসের সেই কর্তা এস. বি-র ডেপুটি কমিশনার কঠিন স্বরে প্রশ্ন করলো, 'রসিকলাল দাসকে চেনেন?'

'না।'

'চেনেন না? ওঃ, আপনারা বুঝি সবার নাম জানেন না?' সিপাইকে হুকুম দিলো, 'নিয়ে এসো রসিককে।' হাতকড়া বাঁধা অবস্থায় যাঁকে নিয়ে এলো তিনি হচ্ছেন দাদা।

আবার সেই প্রশ্ন—'চেনেন একে?'

'না।'

দাদাকে প্রশ্ন হ'লো—'চেনেন একে?'

'না।'

কমিশনারের মুখ আরো রুক্ষ হ'য়ে উঠলো। সিপাইকে আবার আদেশ করলো, 'নিয়ে যাও একে।' দাদাকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

আমাকে তখন আর-একটা ঘরে নিয়ে বসানো হ'লো। একজন সি. আই. ডি জেরা আরম্ভ করলো আমাকে। আমি তখন নিজের নাম, বাবার নাম, ঠিকানা ছাড়া আর কিছুই জানি না। সমস্ত দিন ধ'রে জেরা চললো। এক সময় টেগার্ট এসে আমাকে ভালো ক'রে নিরীক্ষণ ক'রে ওদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা ক'রে চ'লে গেল।

সন্ধ্যার পর দেখি বাবা এসেছেন। পুলিস তাঁকে বুঝিয়েছে, আমি যা জানি সে-কথা পুলিসকে বললেই তারা আমাকে এখনি ছেড়ে দেবে। আমি বললাম, 'আমি তো কিছুই জানি না, কি বলবো?' আমার কথা বাবা বিশ্বাস করলেন। তিনি পুলিসকে বোঝালেন, 'আমার মেয়ে কখনো মিথ্যা কথা বলে না। সে যখন বলছে যে জানে না তখন সত্যিই সে জানে না।' পুলিস তবু ছাড়লো না।

রাত প্রায় সাড়ে আটটায় আমাকে তারা কয়েদী-গাড়িতে

(prison van) তুলে দিলো, লালবাজার হাজতে নিয়ে যাবে। অন্ধকার সেই গাড়িতে উঠে উপরের সরু জালটুকু দিয়ে আমি বাবাকে দেখতে লাগলাম। বাবা দাঁড়িয়ে আছেন প্রিজন্-ভ্যানের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত শূন্য দৃষ্টিতে।

ঝনাৎ ক'রে এক বিরাট তালা কয়েদী-গাড়ির দরজায় বন্ধ হ'লো। গ্রেপ্তার-করা বন্দীদের ঠেসে গাদাগাদি ক'রে তুলেছে ওই গাড়িতে, চললো নিয়ে লালবাজার থানাতে। একই তীর্থক্ষেত্রের যাত্রী আমরা, চিনি না প্রায় কেউ কাউকেই। তবু মনে হ'লো এরা যেন চির-পরিচিত, চির-আপন। একই ঝড় মাথায় নিয়ে চলেছি আমরা নিরুদ্দেশ যাত্রায়। না-জানি কতো বন্দী সেদিন কতো নির্যাতনের পর কী অবস্থায় ছিলেন। তবু নিঃশব্দে চলেছি সবাই।

লালবাজারে নিয়ে মেয়ে দু'টিকে আমাদের একটা পৃথক ঘরে তালাবন্ধ করলো, বাকিদের কথা জানি না।

ড্যালহাউসি স্কোয়ার বোমার মামলা সম্পর্কে আরো কয়েকটি মেয়েকে গ্রেপ্তার করেছিলো পুলিস। শোভারানী দত্ত, সত্যরানী দত্ত, কমলা দাস ও রেণু সেন। কমলা দাসকে হাজতে নেয়নি। শোভারানীকে আমাদের আগেই গ্রেপ্তার করেছিলো এবং জামিনে খালাস দিয়েছিলো। সত্যরানীকে লালবাজারের অন্য ঘরে বন্ধ রেখেছে। আমি এবং রেণু আছি একসঙ্গে একই ঘরে। এদের মধ্যে রেণু ছাড়া সকলেই ছিলাম আমরা এক দলের। তাই বোধ হয় ওরা রেণু ও আমাকে একসঙ্গে রাখা নিরাপদ ভেবেছিলো।

হাজত-ঘরে ঢুকিয়েই জমাদারনী দু'টো ক'রে কালো কম্বল দিয়ে গেল। ওগুলো বোধ হয় শত লোকের শতদিন ধ'রে শোওয়া কম্বল। কতো রকমের অসুখ নিয়ে কতো আসামী রোজ আসছে, থাকছে, চ'লে যাচ্ছে। ভোরে নিয়ে জড়ো ক'রে রাখে সব কম্বল এক সঙ্গে, আবার সন্ধ্যায় হাজতীদের বণ্টন ক'রে দেয়।

শুয়ে-শুয়ে কারো আর যেন সেদিন ঘুম আসতে চায় না। হাজত-ঘরের মধ্যে কড়া বাতিটা কয় শত পাওয়ারের কে জানে। চোখ ছু'টো ভেদ ক'রে ওর রূঢ় আলো হাজতীদের যেন বেত মেরে শাসন করতে চাইছে। ছু-জনেই ক্লান্ত। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। সকালে উঠে দেখি বাতিটা আর শাসন করছে না। কিন্তু ঘরটায় কেমন আবছা আলো, যেন সকাল হয়নি। আসলে জানালা দিয়ে আলো আসছে কম। কী বিরাট ঘর! কী উঁচু ছাদ! কী কালো আলকাতরা-মাখা ঘরের ভিতরের দেওয়াল! দেওয়ালে যে চুনকামের বদলে আলকাতরা মাখানো থাকে তা কি কখনো জানি! কালোকে হয়তো মানুষ বেশি ভয় করে, তাই এমন ভয়-দেখানো-ব্যবস্থা। এর ওপর ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ঘরের চতুর্দিক শাদা ক'রে রেখেছে। সেই ছুর্গন্ধের মধ্যে, আলকাতরা-মাখানো আধো-অন্ধকার ঘরে ব'সে মনে হ'লো, এরই নাম লালবাজার হাজত বটে!

একটা বালতি আর একটা হাঁড়িতে জল দিয়ে বললো, এতেই সব কাজ সারতে হবে, খাওয়া স্নান এবং অন্য সব। স্নান করা সম্ভবই হ'লো না। লালবাজার হাজতের সেই ষোলো দিনের একদিনও স্নান করতে পারিনি। ছু-জনেই মুখ হাত ধুয়ে নিলাম। ভাত এলো যথাসময়ে কোনো হোটেল থেকে। সে-খাবারের বর্ণনায় আর প্রয়োজন নেই।

লালবাজার হাজত থেকে রোজই আমাদের সকাল ন'টা দশটায় নিয়ে যায় ইলিশিয়াম রো-তে, ফিরিয়ে দিয়ে যায় সন্ধ্যার পর। রোজই জেরা চলে সেখানে। ছু-জনকে আলাদা ঘরে নিয়ে গিয়ে জেরা চালায়, ফোটো তোলে, নানা বন্দীকে সামনে এনে জিগ্যেস করে—'চেনেন একে?' উত্তর পায়—'না।' জেরার সঙ্গে-সঙ্গে চলে ধমকানি, অপমানজনক ভাষা, ভয় দেখানো। অনুনয়, বিনয়ও কম করে না।

ওদিকে খবর পেলাম, ইলিশিয়াম রো-তে ভিতরে-ভিতরে চলেছে সাংঘাতিক অত্যাচার। একজন সি. আই. ডি বললেন, 'সবাই তো সব কথা ব'লে দিচ্ছে, আপনি চেপে রাখছেন কেন? কি লাভ? সবই তো আমরা জানি।' মনে পড়লো দাদা ব'লে দিয়েছিলেন, যদি কারো স্বীকারোক্তি লিখিত অবস্থায়ও দেখায় তবু যেন বিশ্বাস না করি। কাজেই ওদের কথায় আমি টলবার পাত্র নই।

প্রায় চোদ্দ দিন এইভাবে চলার পরে একদিন ওরা বললে, 'আমাদের লিখে দিন যে, ভবিষ্যতে এইরকম কাজ আর করবেন না।' দাদা শিখিয়েছিলেন, পুলিসের কাছে কোনো undertaking কখনো না দিতে। আমিও দিলাম না। দু-দিন ধ'রে ওরা চেষ্টা করলে ওটা আদায় করতে। কিছুতেই যখন লিখে দিতে আমি রাজী হ'লাম না তখন ওরা আমার বাবাকে ডেকে আনলো। বাবা আস্তে ক'রে আমাকে বললেন, 'তোমার মা ব'লে দিয়েছেন, তুমি যা ভালো মনে করবে তাই কোরো, আমি তোমাকে অন্য কিছু করতে বলবো না।' বাবার মুখে এই কথা শুনে আমি অবাক হ'য়ে গেলাম। পুলিসের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'য়ে গেল। অবশেষে পুলিস গম্ভীরভাবে হুকুম দিলে, 'যান তা হ'লে জেলে।'

ষোলো দিন লালবাজার হাজতবাসের পর আমাদের নিয়ে চললো জেল-হাজতে।

॥ আট ॥

প্রেসিডেন্সি জেল, ১৯৩০ সাল। প্রকাণ্ড উঁচু দেওয়াল-ঘেরা এক বিরাট দৈত্যপুরী যেন তর্জনী খাড়া ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। লোহার গরাদসুদ্ধ প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড দরজাগুলো তালাচাবির শব্দে দাঁত কড়মড় করতে থাকে। দেওয়ালের বাইরে এবং ভিতরে কতো সিপাই যে সঙিন উঁচিয়ে পাহারা দিচ্ছে! এই উদ্যত তর্জনী, কট্‌মটে দাঁত এবং রক্তচক্ষু নিয়ে ইংরেজের তৈরি জেলখানা বন্দীকে তার প্রথম অভিনন্দন জানায়। প্রস্তুত হ'য়েই এসেছে সে, আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করে সেই অভিনন্দন।

কয়েদী-গাড়ি থেকে নেমে কড়া প্রহরীর সঙ্গে জেল দরজার কাছে আসতেই ঝন্‌ঝন্ ক'রে প্রকাণ্ড তালাটা খুলে দৈত্য যেন হাঁ করলো। বন্দীকে গিলে নিলো সে। বাইরের জগতের আর কোনো অধিকার রইলো না সেখানে। সঙ্গে-সঙ্গে দৈত্যের মুখ বন্ধ হ'য়ে গেল। তালাটা ঝুলতে লাগলো শুধু।

জেল-গেটে সিপাই কিছু লিখে নিলো, বন্দীদের সংখ্যা বেড়ে গেল। জেলে বন্দীদের নাম নেই, আছে নম্বর। সেখানে মানুষ আর মানুষ নয়, শুধু সংখ্যা।

গেট পার হ'য়ে নিয়ে গেল আপিসে। সেখানে রয়েছে বহু সিপাই শান্ত্রীর আনাগোনা, আছে জেলার, অ্যাডিশনাল জেলার, ডেপুটি জেলার, কেরানী-ঘেরা টেবিলে অজস্র মোটা-মোটা খাতাপত্র, ফাইল, টিকিট। ঘোরাফেরা করছে কর্মরত জমাদার, জমাদারনী, মেট্রন। জেল-আপিসের মেজাজটা নির্মম, হাওয়া কঠিন, চালচলন কড়া। সবাই এখানে মেপে-মেপে চলছে, নইলে রক্তবর্ণ চক্ষু ফেটে পড়বার জন্য তৈরি রয়েছে। এখানে সিপাই ছুটে আসে বন্দীর জিনিসের তল্লাসী নিতে। নীরব ঔৎসুক্যে তাকিয়ে আছি। জিনিসপত্র নাকি হয়ে গেছে জেলের সম্পত্তি। খুশিমতো তল্লাসী করে। টাকা-

পয়সা, সোনার জিনিস, ঘড়ি, কলম, সব গেটে জমা রেখে সামান্য কিছু জামাকাপড় নিয়ে ভিতরে যেতে দেয়। মুক্তির দিনে ফেরত পাবে সব। জেলে বন্দী যেন নতুন ক'রে একবার জন্মগ্রহণ করে।

তারপর দু-দিকে প্রহরীবেষ্টিত আমাদের একটার-পর-একটা দরজা পার ক'রে নিয়ে চললো এক অজানা ব্যূহের দিকে। ডাইনে ফেলে চলেছি একটা প্রকাণ্ড বটগাছ, কতো শত বছর যে ওর বয়স তার সংখ্যা নেই। তার উপরে ব'সে হাজার-হাজার পাখি শত বছর ধ'রে চিৎকার ক'রে হয়রান হ'য়ে গেল। তবু তার নিচে দিয়ে আসে যায় আজও হাজার-হাজার বন্দী। কেউ বেড়ি পায়ে, কেউ ডাণ্ডাবেড়ি, কেউ চাবুক খেয়ে, আবার কেউ বুটের লাথি খেয়ে, কেউ রুগ্ন, কারো-বা মৃতদেহ। করুণ চোখে কতো দুঃখেরই সাক্ষী হ'য়ে রয়েছে এই বটগাছটা। আবার সে দেখে, এত শত বছর পরে, গত প্রায় পঁচিশ বছর ধ'রে কেমন যেন নতুন ধরনের বন্দী আসে দলে-দলে। এরা অবজ্ঞায় হেসে চলে, দুঃখকে সুখ মানে। জেলখানা এরা কেঁদে ভাসিয়ে দেয় না, হেসেই উড়িয়ে দেয়। কিসের এই গর্ব, কেনই বা এত হাসি, বটগাছ অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকে।

বটগাছের তলা দিয়ে যেতে-যেতে দেখি, কয়েকজন রাজবন্দী বটগাছটার গুঁড়িতে ব'সে খুব হাসছেন। ওঁদের মধ্যে রয়েছেন 'ধামা' অর্থাৎ মনোরঞ্জন রায়। তিনি কথা বলবার জন্য কাছে আসতেই সিপাইরা গর্জে উঠলো, 'হুকুম নেই কথা বলার।' ইশারায় বন্দীদের কথার বিনিময় হ'য়ে যায়। ইঙ্গিতে তিনি জানালেন, বটগাছের পরে যে মস্ত পুকুরটা আছে, তারই ওপারে বিরাট ইয়ার্ডে তাঁরা থাকেন। চোখ বুলিয়ে দেখে নিই সেই দিকটা।

তারপর যেতে-যেতে বাঁ দিকে পড়ে চুয়াল্লিশ ডিগ্রি সেল। তার মধ্যেই নাকি আছে ফাঁসির সেল। তারপর আসে কুষ্ঠরোগীদের

গেল। আহা! কী দুঃখী এরা! একে এই রোগ, তাতে ওই কুঠুরিতে বন্ধ। ক্রমে এলো ইয়োরোপীয়ান ইয়ার্ড, সব চেয়ে ভালো বন্দোবস্ত, রাজার জাতের থাকবার মতো ব্যবস্থা। আরো এগিয়ে চলতে-চলতে ডাইনে বাঁয়ে রেখে যাই খাটুনিঘর। কয়েদীরা খাটছে সশ্রম কারাদণ্ড। শেষে জেনেছি, খাটুনি তাদের ঘানি, তাঁত, ধোলাই, ডালভাঙা, কারখানার কাজ, মেথরের কাজ, ধোপার কাজ, জুতোর কাজ, রান্না, বাগানের কাজ, আরো কতো কাজ আছে কে জানে! সবই তো প্রায় অদৃশ্য।

অবশেষে আসে হাসপাতাল। রাস্তাটা এখানে এসে সরু হ'য়ে গেছে। দু-ধারে প্রকাণ্ড উঁচু দেওয়াল। তার ভিতরে বাঁ দিকে হাসপাতাল। বেলগাছের মাথার ফাঁকে-ফাঁকে দোতলাটুকু দেখা যাচ্ছে। এখানকার একটা ইতিহাস আছে। ১৯০৮ সালে মানিকতলা বোমার মামলার রাজসাক্ষী নরেন গোসাঁইকে এই হাসপাতালে গুলি করেছিলেন কানাইলাল দত্ত এবং সত্যেন বোস। নরেন গোসাঁই ছুটে পালাতে চেষ্টা করেছিলো এই সরু রাস্তাটা দিয়ে, কিন্তু তাঁরা এখানেই আবার তাকে গুলি ক'রে চিরদিনের জন্য মুখ বন্ধ ক'রে দেন। তারপর হাসতে-হাসতে ফাঁসির মঞ্চে উঠে গেলেন কানাইলাল আর সত্যেন। আজও এই পথ দিয়ে যেতে-যেতে রাজবন্দীরা সেই অগ্রদূতদের মুখ নতশিরে স্মরণ করেন।

হাসপাতাল পার হ'য়ে আসে ফিমেল ইয়ার্ড, আমাদের গন্তব্য ফাটক। সিপাই সেই জেনানা ফাটকের সামনে এসে সজোরে ঘন্টি নেড়ে দিলো। জমাদারনী ভিতর থেকে তালা খুলে ফাটক মেলে ধরলো। আমরা ইয়ার্ডে ঢুকে গেলাম। জেনানা ফাটকের গুনতির সংখ্যা বেড়ে গেল। আবার ফাটক সশব্দে তালা বন্ধ হ'য়ে গেল। জমাদারনী নিয়ে গেল আমাদের মেট্রনের কাছে। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেট্রন হুকুম করে, 'শরীর তল্লাসী করো।' আবার তল্লাসী! ঠাণ্ডা

সাপ গায়ের ওপর ছেড়ে দিলে যেমন লাগে তেমনি শির্‌শির্ ক'রে ওঠে শরীর ওদের স্পর্শের ধরনে। প্রতিবাদ মানে না।

তল্লাসী শেষ হ'লে চারিদিক থেকে অনেক পরিচিত মুখ হাসি-মুখে এসে ঘিরে ধরলো। সবাই আজ এক-পরিবার। কেউ জিগ্যেস করে, পিকেটিং ক'রে এসেছো? না কি বিলিতী মাল বিক্রি বন্ধ করতে গিয়েছিলে? কতো জন আজ এসেছো? কেউ বলে, আইন ভঙ্গ ক'রে কোথায় বক্তৃতা দিলে? কতো দিনের জেল? আমি যখন বিব্রত মুখে শত প্রশ্নে জর্জরিত, হঠাৎ দেখি পুটু কাছেই দাঁড়িয়ে খুব হাসছে। তক্ষুনি আমার হাত ধ'রে পুটু ব'লে ওঠে, 'ও যে আমার সাথী, বম্ব্ কেস (Bomb case)।'

লালবাজারের আলকাতরা-মাখা কালো বিরাট পুরী ছেড়ে আজ ষোলো দিন পরে, জেলের আকাশটুকু দেখে, পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে আমি যেন স্বর্গে এলাম। ইংরেজ যে বছরের পর বছর লালবাজারের গুদামে না রেখে বন্দীদের কৃপা ক'রে জেলখানায় নিয়ে আসে এ তার অসীম দয়া। তুলনায় জেলখানাকে মনে হ'তে লাগলো যেন নন্দনকানন। এখানে দিনের বেলায় একটুখানি খোলা আকাশ আছে, বাতাসও আছে, পরিষ্কার খাবার আছে, স্নানের জন্য অজস্র জল আছে, যত খুশি ঘুমিয়ে নেবার সময় আছে, এর চেয়ে বেশি আর কি চাই? ভাগ্যে জেলখানা মানে লালবাজার হাজত নয়! আমার পক্ষে এটা ছিলো একটা বিরাট আনন্দের পরিবর্তন।

পুটু নিয়ে গেল তার সেলে। কতো কথা আছে। সে ব'লে চললো একে-একে তার কাহিনী। কেমন ক'রে টেগার্ট সাহেব নিজে গিয়ে চন্দননগরে ওদের বাড়ি ঘেরাও করে। চট্টগ্রামের পলাতকদের সঙ্গে পুলিসবাহিনীর কেমন ক'রে গুলি বিনিময় চলে-ছিলো ওদেরই বাড়ির বাগানে। জীবন ঘোষালের গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ পাওয়া গেল পুকুরের মধ্যে। অন্য পলাতকেরা, গণেশ ঘোষ,

লোকনাথ বল ও আনন্দ গুপ্ত মাটিতে শুয়ে প'ড়ে পুলিসের সঙ্গে গুলি বিনিময় করতে-করতে ধরা প'ড়ে গেছেন। ওদিকে পুটু এবং তার সাজানো-স্বামী শশধরবাবুকে পলাতকদের আশ্রয়দাতা হিসাবে বাড়ি থেকেই গ্রেপ্তার ক'রে নিয়েছে। সভ্য ইংরেজ টেগার্ট পুটুকে তার কর্মের জন্য পুরস্কারস্বরূপ চপেটাঘাত করতে ছাড়েনি। অবশেষে পুটু এসেছে এই জেলে।

এখানে তখন লবণ ও অন্যান্য আইন অমান্যকারী বন্দীদের দলে-দলে এনে রাখছে। প্রতিদিনই তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জেলখানার ফিমেল-ইয়ার্ড প্রায় কানায়-কানায় পূর্ণ। পুটুকে রেখেছে সেগ্রিগেটেড সেলে আলাদা ক'রে। আমার এবং রেণুরও সেই ব্যবস্থা। কিন্তু আমরা ছিলাম ক্লাসিফায়েড, পুটু নন-ক্লাসিফায়েড। অর্থাৎ আমরা থাকি দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের সুবিধা নিয়ে, পুটু তৃতীয় শ্রেণীর মতো। পুটুর সেলে আলো-বাতাস কম, নিচের সেল সেটা। আমি বলি, দু-জনে একসঙ্গে থাকবো, খাবো। পুটু বলে, তাতে দু-জনেরই শাস্তি মিলবে, জেল রুলে বাধবে। কথা বলছি তাই যথেষ্ট।

আস্তে-আস্তে সবই বুঝলাম। জমাদারনী এবং মেট্রন যেন মাথা কিনে রেখেছে, এমনি ব্যবহার। তাদের শাসনের পিছনে রয়েছে জেলার, সুপার, জেলরুল। প্রতি পদেই গণ্ডী, তার বাইরে গেলেই শাস্তি। দোতলা থেকে মাথা বাড়ালেই দেখা যায় হাসপাতাল, কিন্তু দেখতে গেলেই মিলবে শাস্তি। মেট্রন যেন রুলার উঁচিয়েই আছে, জমাদারনী গর্জন ক'রেই চলেছে। মাফিকাটা, ডিগ্রিবন্ধ, ছালার চট পরানো, চালান দেওয়া সব শাস্তিই তাদের হাতের মুঠোয়। রাত্রে কিছু খেতে দেয় না, বিকেলেই খাওয়া চুকিয়ে সন্ধ্যায় লক-আপ ক'রে দেয়। বম্ব্ কেসের বন্দী এবং আইন অমান্যকারী বন্দী থাকবে পৃথক। মেলামেশা তাদের

নিষেধ। লুকিয়ে কিন্তু সবাই কথা বলছে। অতটুকু ফিমেল-ইয়ার্ডে আলাদা ক'রে রাখা অসম্ভব। শুধু সন্ধ্যার লক-আপ বিচ্ছিন্ন ক'রে দেয়। এত নিষেধের গণ্ডী রয়েছে ব'লেই রাজনৈতিক বন্দীরা কেবলি গণ্ডী ভেঙে চলে। হট্টগোলের অন্ত নেই।

জেলে জাতীয় পতাকা তুলবার নিয়ম নেই। ইংরেজ-শাসনে আবার ভারতের জাতীয় পতাকা! সেখানে থাকবে ইংরেজের জাতীয় পতাকা, ইউনিয়ন জ্যাক্। ওদিকে কংগ্রেসের আদেশে আইন অমান্য ক'রে দলে-দলে বন্দী এসে ভিড় করেছে জেলখানায়। তারা ইংরেজের জেলরুল মানবে কেন? ইংরেজের স্বার্থে তৈরি করা আইন ভঙ্গ ক'রে স্বদেশী লবণ তৈরি ক'রে তারা জেলে এসেছে। এখানেও জেল-আইন ভঙ্গ ক'রে যে-কোনো শাস্তি নিতে তারা প্রস্তুত।

আইন অমান্যকারী বন্দীমেয়েরা বলে, তারা একদিন তৈরি ক'রে ফেললো একটি জাতীয় পতাকা। আভা দে দুর্ধর্ষ সাহসী এবং বেপরোয়া। গাছে উঠতে, দৌড়ে পাল্লা দিতে, জেলখানা জমিয়ে গরম ক'রে রাখতে তার জুড়ি ছিলো না। আভা একদিন উঠে গেল ফিমেল-ইয়ার্ডের বিরাট অশথ গাছটার ওপর। আগায় উঠে গিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে ভারতের জাতীয় পতাকা। জেলখানা ফাটিয়ে ধ্বনিত হ'তে লাগলো 'বন্দে মাতরম্'। জমাদারনী, মেট্রন যে যেখানে ছিলো সব ছুটে এলো। কেড়ে টেনে ছিঁড়ে ফেললো জাতীয় পতাকা। বাইরে ছুটে গেল বিপদের জরুরি বার্তা। বিদ্যুৎগতিতে ছুটে এলো জেলার, জমাদার, সিপাই। জেলখানা তোলপাড়। ইংরেজ রাজত্ব বুঝি যায়-যায়। বন্দীরা তো মহাউল্লাসে সগর্বে চিৎকার করতে থাকে, 'বন্দে মাতরম্', 'জাতীয় পতাকা কী জয়', 'মহাত্মা গান্ধীজী কী জয়' ইত্যাদি। জয়ধ্বনির স্ফূর্তিতে জেলখানা বুঝি ফেটে গেল! জেলের আকাশ শুধু স্মিতহাস্যে বন্দীদের সেদিন আশীর্বাদ ক'রে যায়।

॥ নয় ॥

প্রেসিডেন্সি জেল থেকে কয়েকদিন পরেই আমি ও রেণু মুক্তি পেলাম। আমার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ ছিলো না। ওদিকে ড্যালহাউসি স্কোয়ার বোমা নিয়ে পুলিস তখন দু'টো মামলা খাড়া করে। একটাতে দীনেশ মজুমদার একা আসামী, অনুজা সেন তো বেঁচেই ছিলেন না। দীনেশ মজুমদারকে দিলো যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। দ্বিতীয় মামলা ছিলো অনেকের বিরুদ্ধে। তার স্পেশাল ট্রাইবুনালের রায়ে দেখা গেল আটজনের সাজা দিয়েছে এইরকম— ডাক্তার নারায়ণ রায় ও ডাক্তার ভূপাল বোস, বিশ বছর দ্বীপান্তর। রসিকলাল দাস ও সুরেন দত্ত, পনেরো বছর দ্বীপান্তর। যতীশ ভৌমিক ও রোহিনী অধিকারী, বারো বছর দ্বীপান্তর। অদ্বৈত দত্ত ও অম্বিকা রায়, সাত বছর দ্বীপান্তর।

পরে হাইকোর্টে আপীল করা হয়। তার রায়ে অনেকের সাজা ক'মে গেল এবং কয়েকজন খালাস পেলেন। হাইকোর্টের রায় ছিলো— ডাক্তার নারায়ণ রায় ও ডাক্তার ভূপাল বোস, পনেরো বছর দ্বীপান্তর। রসিকলাল দাস খালাস। সুরেন দত্ত, বারো বছর। যতীশ ভৌমিক, দুই বছর। রোহিনী অধিকারী, পাঁচ বছর। অদ্বৈত দত্ত ও অম্বিকা রায় খালাস।

রসিকলাল দাসকে প্রমাণাভাবে খালাস ক'রে দিয়ে জেল-গেটে এনে সঙ্গে-সঙ্গেই আবার ডেটিনিউ ক'রে জেলে বন্দী ক'রে রাখলো। এবং চার মাস পরে ১৮১৮ সালের রেগুলেশান তিন আইনে তাঁকে স্টেট প্রিজ্‌নার ক'রে পেশোয়ার সেন্ট্রাল জেল, বেরিলি সেন্ট্রাল জেল প্রভৃতি বাংলার বাইরের ও ভিতরের বিভিন্ন কারাগারে আটক রাখে প্রায় আট বছর। মুক্তি পান তিনি ১৯৩৮ সালে। অদ্বৈত দত্ত ও অম্বিকা রায়কেও ডেটিনিউ ক'রে রাখে।

এই ড্যালহাউসি স্কোয়ার বোমার মামলাকে তখন লোকে

examplary punishment বলতো—এত কঠিন উৎপীড়ন এবং এত বেশি সাজা দিয়েছিলো। তাতে বিপ্লবীরা কিন্তু দমেননি।

বিপ্লবের তরঙ্গ চলতে লাগলো বাংলাদেশ জুড়ে একটার-পর-একটা— ঢাকায়, মেদিনীপুরে, রাজসাহীতে। আমরা লক্ষ্য করতে থাকি।

আমি বাড়ি ফিরে এসেছি, পুটুও খালাস পেয়েছে। আমি একটা স্কুলে চাকরি পেয়ে গেলাম, বালিগঞ্জ গার্লস্ স্কুলে, বর্তমানে নাম মুরলীধর গার্লস্ স্কুল। পুটুও চাকরি নিয়েছে। দু-জনেই দিনে স্কুলে পড়াই, বিকেলে সেই লেডিস্-পার্কে আলোচনা করি, কাজের চেষ্টায় থাকি। ছেলেদের চিনি কমই। মনোরঞ্জনদাও (গুপ্ত) ধরা প'ড়ে গেছেন। কাজেই বড়ো এমন আর কেউ রইলেন না যে, আমাদের নির্দেশ দেবেন। আমরা তো যাকেই একটু ভালো মনে করি তাকেই দলে টানতে চেষ্টা করি। বেশির ভাগই ব্যর্থ হই, তবু হাল ছাড়ি না। স্কুলে পড়াই বটে, আসল মনটা কিন্তু স্কুলের মেয়েদের খেয়াল ক'রে ফেরে। বেছে-বেছে মেয়েদের নিয়ে আলোচনা করি। একটা সহানুভূতির আবহাওয়া সৃষ্টি হয় স্কুলে। ভালোবাসতাম স্কুলকে।

১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে হঠাৎ শুনি কুমিল্লার স্কুলের দু'টি কিশোরী মেয়ে ওখানকার অত্যাচারী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে গুলি ক'রে হত্যা করেছে। মেয়ে দু'টির নাম শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী। বয়েস তাদের পনেরো এবং চোদ্দ। সাজা পেয়েছে তারা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। বাংলার মেয়েদের মধ্যে আসে মরীয়া-হওয়া চঞ্চলতা। এর আগে মেয়েরা এমন সামনে এসে ডিরেক্ট অ্যাকশান্ আর করেনি। এমনি ফুটন্ত মেয়ের আগুন-জ্বালানো কাহিনী যেন বাংলাদেশকে অগ্নিযুগের চরম সীমায় নিয়ে চললো। বিপ্লবের আগুন তখন ক্রমে বাংলা ও ভারতবর্ষের আকাশ রাঙিয়ে দিচ্ছিলো দিক্-বিদিকে।

শান্তি, সুনীতির মামলার সঙ্গে-সঙ্গেই গভর্নমেণ্ট মেয়েদের গ্রেপ্তার করতে লাগলো ডেটিনিউ হিসাবে, অর্থাৎ বিনা বিচারে জেলে আটক। বন্দী তারা, কিন্তু খাটুনি নেই এবং কতোদিন আট্‌কে রাখবে তারও কোনো মেয়াদ নেই। ১৯৩২ সালের প্রথমে গ্রেপ্তার করলো পুটুকেও। আমি একেবারে একা হ'য়ে গেলাম।

সুধীর ঘোষ নামে সেই ছোটো ছেলেটির বয়েস এখন হবে আঠারো-উনিশ বছর। তার কথা দাদা আমাকে বহু আগে বলেছিলেন সুখ্যাতি ক'রে। তার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিলো না আগে। এবার হ'লো সাক্ষাৎ পরিচয়। বেশ লাগে ছেলেটিকে। ছোটো ছেলে, মুখে ফুটে রয়েছে প্রখর বুদ্ধির উজ্জ্বলতা। মিষ্টি ক'রে কেবলি হাসে কিন্তু কথা বলে কম। যতটুকু বলে, ততটুকু সে করে। কোনো কষ্টই ওর গায়ে লাগে না। যেন খেলা করতে-করতে অথবা পা দুলিয়ে-দুলিয়ে দুষ্টু চোখে গল্প করতে-করতে ফাঁসির দড়িটা অনায়াসে গলায় তুলে নিতে পারে।

আমি বলি, 'আমাকে লাঠি এবং ছোরা খেলা শেখাও।' তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয়, 'কাল থেকেই।' সত্যি-সত্যি রোজ শেখায়। শুধু তাই নয়, শেখায় সাইকেল চড়তেও। আমার চেয়ে কতো ছোটো সে, তবু ছিলো বন্ধু। প্রয়োজনীয় আলোচনা ও পরামর্শ সবই চলতে থাকে সুধীরের সঙ্গে।

১৯৩২ সালে চলেছে নতুন ক'রে আবার আইন অমান্য আন্দোলনের ঢেউ। কল্যাণী আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছে। তার খবর জানতে কল্যাণীদের বাড়িতে গেছি দুই এক দিন পরে। বীণা দাস, কল্যাণীর ছোটো বোন, ব'সে-ব'সে খবরের কাগজ পড়ছিলো। আমাকে দেখে বীণা কাছে এসে মিষ্টি হেসে বললে, 'তোমায় একটা কথা বলবো, কমলাদি? আমার ইচ্ছা গভর্নরকে গুলি (attempt) করি। তুমি আমাকে রিভলভার দেবে?'

আমি বলি, 'রিভলভার? সে কি?'

বীণা বলে, 'আমি সিরিয়াস্‌লি বলছি, তুমি আমাকে বিশ্বাস করো।'

আমি জানতাম দীনেশ মজুমদার বীণাকে নিজের দলে আনবার জন্য একবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বীণা ইতিমধ্যেই অন্য দলে যোগ দিয়েছে, কাজেই আমাদের সঙ্গে কাজ করা তার তখন আর সম্ভব ছিলো না। অতএব অন্য দলের মেয়েকে দিয়ে অ্যাক্‌শান্ করাবার দায়িত্ব আমি নেবো কি ক'রে? তাই বললাম, 'তোমার বড়ো যাঁরা তাঁদের কাছে চাও'না কেন?'

দুঃখ ক'রে বীণা বললে, 'আমাদের বড়োরা কেউ ধরা প'ড়ে গেছেন, কেউ স'রে গেছেন, আমাদের দল ভেঙে গেছে। আমি নিজেই ইন্‌ডিভিজুয়াল হিসাবে (ব্যক্তিগতভাবে) কিছু-একটা করতে চাইছি, আর কারো দায়িত্ব নেই আমার জন্য।'

বীণার দিক থেকে সে নিজেকে ইন্‌ডিভিজুয়াল বা ব্যক্তিবিশেষ ভাবতে পারে, কিন্তু সেখানে আমাদের দলের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক হবে সেটা সম্পূর্ণ বুঝে নেওয়া প্রয়োজন ছিলো। সেদিন নানা কথা আলোচনা ক'রে বাড়ি ফিরে এলাম।

আমি জানি বীণা মিথ্যা বলতে পারে না, কাউকে আঘাত দিতে

পারে না। তার মুখখানিতে প্রতিফলিত হ'য়ে আছে আদর্শ জগতের ছবি। অতি কোমল, মধুর স্বভাবের মেয়ে। সে ইন্‌টেলেকচুয়াল, সে সাহিত্যিক, চমৎকার ডিবেট (তর্ক) ক'রে চলে, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে সে। আর আছে তার আবেগপ্রবণ মনটি। সমস্ত আবেগ নিয়ে আজ সে আমাকে যে-কথাটি বলছে, যদি তার আলো পরে স্তিমিত হ'য়ে আসে, যদি সে অনুতপ্ত হয়? তা হ'লে তাকে দিয়ে এই অ্যাক্‌শান করাবার দায়িত্ব যে আরও গুরুতর! বিপ্লবের বন্যাকে আমরা যেন দুর্জয়শক্তিতে এগিয়েই নিয়ে যেতে পারি, সেটুকু দেখতে হবে আমাদের।

আমি বীণার সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ করলাম। সমস্ত বিপদ-সংকুল দিক (dark side) জোর দিয়ে বোঝাতে বসলাম। যেন মুহূর্তের আবেগে সে কিছু করতে না যায়। সর্বরকমে বাধা দিয়ে তার মন পরীক্ষা করতে লাগলাম।

বীণার আরও একটা দিক ছিলো। সেটা হচ্ছে তার বাবা-মা। বাবা-মাকে এত বড়ো প্রচণ্ড আঘাত দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিলো কিনা! ভিন্ন আদর্শের বাবা-মায়ের অতি আদরের কন্যা সে। কতো বড়ো সাংঘাতিক বজ্রাঘাত তাঁদের দিতে হবে সে-কথা বীণা জানতো কিনা জানি না, আমি কিন্তু অনেকখানি জানতাম।

বললাম, 'হয়তো তাঁরা সহ্য করতে পারবেন না, হয়তো তোমার এই কাজ তাঁদের মৃত্যু নিয়ে আসবে, অথবা হয়তো তাঁরা পাগল হ'য়ে যাবেন।' বীণা হঠাৎ দু-হাতে মুখ ঢেকে বললে, 'বোলো না, কমলাদি, বোলো না, বাবা-মা সম্বন্ধে তুমি কিছু বোলো না।'

'জেনে রাখাই তো ভালো, ভাই।'

তবু বীণাকে কোনো কথা দিলাম না। শুধু তাকে ভাবতে দিয়ে চ'লে এলাম।

সুধীরকে ডেকে সব বলেছি। তার সঙ্গে আমার আলোচনার

সার কথাটা দাঁড়ালো এইরকম—বিদেশী গভর্নমেণ্ট আমাদের শাসন ক'রে চলেছে, সেই প্রভুত্বের মূর্ত প্রতীক হচ্ছে গভর্নর নিজে। তখন পর্যন্ত যে-সব অ্যাক্‌শান চলেছিলো ঢাকা, মেদিনীপুর, কুমিল্লা ইত্যাদি স্থানে, সেগুলির আঘাত পড়েছিলো স্থানীয় শিকড়ের উপর। কিন্তু গভর্নর হচ্ছে প্রদেশের দিক থেকে বিদেশী শাসনের শ্রেষ্ঠ প্রতিমূর্তি, সুপ্রীম সিম্বল (supreme symbol)।

আমাদের কথা হয়েছিলো যে, এই সুপ্রীম সিম্বলকে আঘাত করতে পারলে তবে যে-বিপ্লবকে ধীরে-ধীরে ধাপে-ধাপে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো তা উঠবে সর্বোচ্চ শিখরে। সেটাই সেদিন প্রয়োজন ছিলো। সে-সময়ে প্রায় সবাই গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, আমাদেরও বেশি দেরি ছিলো না। কাজেই যাবার আগে এই বিপ্লবী বন্যার শেষ আঘাত হেনে দিয়ে যেন যেতে পারি। এর পরে আর হয়তো এ-সুযোগ আসবে না। মোমেণ্টামটা (momentum) বজায় রেখে যাওয়া তখন একান্ত প্রয়োজন। বিপ্লবের চরম আঘাতে তার দুর্বার গতিটাকে যেন তীব্রতম স্রোতে এগিয়ে নিয়ে এসে চ'লে যেতে পারি, এই হ'লো আমাদের লক্ষ্য। স্থির হ'য়ে গেল গভর্নরকে গুলি করা হবে। সুধীরের সঙ্গে আলোচনা ক'রে আমি বাড়ি চ'লে এলাম।

আলোচনার কথাগুলো আমার কানে বাজতে লাগলো। সমস্ত দিক থেকে বিপ্লবের বিপুল জলরাশি যেন আমার চারিদিকে ফেনিয়ে উঠছে। মনে হ'তে লাগলো, যে-গতি আনবার জন্য চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হ'য়ে গেছে, যে-তরঙ্গরাশি দীনেশ মজুমদারকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, গেছেন বিনয় বোস, দীনেশ গুপ্ত, বাদল গুপ্ত, গেছে শান্তি, সুনীতি, তারই একটা প্রবলতম স্রোতে বিলীন হ'য়ে যাবো বীণা, সুধীর ও আমি। সেখানেই আছে সার্থকতা।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে ঘুম আর আসে না। আরো কতোদিক ভাববার বাকি প'ড়ে আছে। চললো মনের সঙ্গে অন্তরের দ্বন্দ্ব।

বীণা যদি স্বীকারোক্তি করে?

খারাপ দিকটা জেনেশুনেই তো চলবো। ড্যালহাউসি স্কোয়ার বোমার মামলায় যত কর্মীকে পুলিস গ্রেপ্তার করেছিলো, তাঁদের উপর নাকি এমন অত্যাচার চালিয়েছিলো যে, কেউ-কেউ সহ্য করতে না পেরে স্বীকারোক্তি ক'রে ফেলেছিলেন। ওই ভাবে অত্যাচার করলে বীণাও হয়তো স্বীকারোক্তি করতে পারে, ধ'রে নিলাম। অবশ্য দাদার মতো লোকও ছিলেন। তিনি ১০২° জ্বর নিয়ে ধরা পড়েন। হাতকড়া দেওয়া অবস্থায় আপাদমস্তক বুটের লাথি খেতে-খেতে তিনি অজ্ঞান হ'য়ে গিয়েছিলেন, মুখ দিয়ে ফেনা বেরিয়েছে, তখন ওরা মুখে-চোখে জল দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছে, আবার তৎক্ষণাৎ মারতে-মারতে অজ্ঞান ক'রে ফেলেছে, আবারও সেই অর্ধমৃত অবস্থায় মুখ দিয়ে ফেনা উঠেছে, তবু সে-মুখ দিয়ে কথা বেরোয়নি, স্বীকারোক্তি করাতে পারেনি। আমাকে যখন মারবে, আমিও যেন ওই রকমই সইতে পারি, বীণাও যেন পারে। কিন্তু বীণা যদি স্বীকারোক্তি করে তাও যেন আমি অসম্ভব মনে না করি। যেন প্রস্তুত থাকি।

দ্বন্দ্ব আরো ঘনিয়ে চেপে ধরলো।

যদি ফাঁসি হয়?

দীনেশ মজুমদার ফাঁসির জন্য প্রস্তুত ছিলেন। দীনেশ গুপ্ত কী আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ফাঁসির জন্য ব্যস্ত হ'য়ে অপেক্ষা করছিলেন, ওজন তাঁর বেড়ে গেল। সেই ক্ষুদিরাম থেকে আরম্ভ ক'রে আমাদের দীনেশ মজুমদার, দীনেশ গুপ্ত পর্যন্ত সকলে মিলে যেন ডাকছে তাদের খেলায় যোগ দিতে, তাদের কাছে চ'লে যেতে। মনে-মনে চিৎকার করি— আসছি ভাই, আসছি।

যদি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়?

তাও হোক। ড্যালহাউসি স্কোয়ার বোমার মামলায় তো

হ'তে পারতো। নেহাতই প্রমাণ পায়নি, তাই ফাঁকি দিতে পেরেছি।

যদি তিলে-তিলে মৃত্যু হয়?

তা হোক। দাদা তো জানিয়ে দিয়েছিলেনই যে, এখানে দুঃখটাই স্বাভাবিক, সুখটা আকস্মিক।

সমস্ত রাত আর ঘুম এলো না। নায়গ্রা প্রপাত যেন প্রচণ্ড বেগে টেনে নিয়ে চলেছে, মহাসমুদ্রে না পৌঁছানো পর্যন্ত নিস্তার কোথায়?

সুধীরের সঙ্গে দেখা হয় রোজই। তার সঙ্গেই আমার সব মনের কথা, বিশ্বাসের আমার অন্ত নেই। আমার যত দ্বন্দ্ব আর সংশয় সব নিয়ে প্রশ্ন ক'রে-ক'রে তাকে অস্থির ক'রে তুলেছি। আমার সকল দায়িত্বের সমান অংশ সে কখন হেলায় নিজের মাথায় তুলে নিয়েছে, যেন জানা কথাই। আমি যদি রাত্রে না ঘুমুতে পারি, সুধীর দ্বিগুণ ঘুমিয়ে তার প্রতিশোধ নেয় আর হাসে।

আমি বলি, 'রিভলভার? তুমি দিতে পারবে?' সুধীর বলে, 'বোধ হয় চেষ্টা করলে পারবো। কিন্তু অনেক টাকা লাগবে যে!'

বলি, 'টাকার যোগাড় আমি করবো, তুমি রিভলভার দাও।'

বীণার সঙ্গে আগে যত কথা হয়েছিলো, সব কথার মধ্যেই আমি তাকে বাধা দিয়েছি, দেখিয়েছি বিপদের ঘন কালো ছায়া। তবু আজও দেখছি সে দ'মে যায়নি। ইচ্ছার তীব্রতা পুরোপুরি বজায় আছে।

প্রশ্ন করি, 'যদি তোমার ফাঁসির আদেশ হ'য়ে যায়, মনু?'

বীণা ভারি মিষ্টি ক'রে মাথা দুলিয়ে উত্তর দেয়, 'আমি হাসতে-হাসতে চ'লে যাবো, দেখো তুমি কমলাদি।'

জিজ্ঞাসা করি, 'যদি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়?'

বীণা বলে, 'শান্তি, সুনীতি ছোট্টো দু'টি মেয়ে আছে সেখানে।

তাদের দু-জনকে পড়িয়েই আমি জেল-জীবন কাটিয়ে দেবো। তুমি কিছু ভেবো না সেজন্য।'

আমি বলি, 'পুলিসের অমানুষিক অত্যাচারে যদি সব ব'লে দাও ?' দৃঢ়কণ্ঠে বীণা বলে, 'নিশ্চিন্ত থাকো, কমলাদি, তোমার কথা আমি জীবন থাকতে বলবো না।'

তারপর শুরু হয় প্ল্যান সম্বন্ধে আলোচনা। দু'টো প্রস্তাব হ'তে পারে। একটা হচ্ছে, রেসকোর্সে গভর্নর আসেন, সেখানে তাঁকে চেষ্টা করা যেতে পারে। দ্বিতীয়টা হচ্ছে, কন্‌ভোকেশান-হলে বীণা যখন বি. এ. ডিগ্রি আনতে যাবে। আমার মনে পড়লো, ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত এঁরা দিল্লীর অ্যাসেম্বলী-হলে বোমা ফেলেছিলেন, সেই প্ল্যানই ভালো। গভর্নর যখন ডিগ্রি দিতে সেনেট-হলে থাকবেন সে-সময়ে নিশ্চিতভাবে তাঁকে সামনে পাওয়া যাবে। রেসকোর্সের মাঠ যেন বেশি অনিশ্চিত, তার চেয়ে কন্‌ভোকেশানে অনেক বেশি সহজ হবে। কাজেই সমস্ত দিক থেকে আলোচনা ক'রে কন্‌ভোকেশান-হলটাই স্থির হ'য়ে গেল।

বীণা বললে, দু-জন হ'লে ভালো হ'তো। মনে পড়ে, শান্তি সুনীতি দু-জনই ছিলো। বীণার একটি বন্ধু ছিলো, তাকে নেওয়া যায় কিনা সে-কথা আলোচনা হ'লো। সেই বন্ধুটির বাবা কিছুদিন আগে মাত্র মারা গেছেন। সমস্ত পরিবার একেবারে নিঃসম্বল হ'য়ে অসহায় দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ছিলো। সে-অবস্থায় তাকে ছিনিয়ে নিতে কোথায় যেন বাধছিলো। তাই শেষ অবধি তাকে আর ডাকা সম্ভব হ'লো না। একা কি কেউ যায়নি ? সব জায়গায়ই তো সঙ্গী পাওয়া যায় না। কন্‌ভোকেশান-হলে ডিগ্রি আনতে যাবার মতো সেই বছরে আর-কেউ এমন পরিচিত বিপ্লবী মেয়ে ছিলো না। কাজেই বীণার একা যাওয়াই স্থির রইলো।

বীণা আর আমি তখন আলাদা মানুষ ছিলাম না, যেন একটি

মানুষ। তার সমস্ত ভালোমন্দ, সুবিধা-অসুবিধা, প্রয়োজন সবই ছিলো আমার।

কাজের দিক থেকে বাড়িতে না থেকে দূরে থাকাই সব রকমে সুবিধা। কাজেই বীণার ডায়োসেসান কলেজের বোর্ডিং-এ যাওয়া ভালো মনে হ'লো। কলেজের একটি আদর্শ ছাত্রী হিসাবে বীণার সুখ্যাতি ছিলো। তখন সে ওই কলেজ থেকে বি. এ. পাস ক'রে ওখানেই বি. টি. পড়ছিলো। কাজেই কারো কোনো সন্দেহ হ'তে পারবে না।

ওদিকে রিভলভার যোগাড়ের প্রাণপণ চেষ্টা করছে সুধীর। দাম অত্যধিক, smuggle করা জিনিস। বীণা সুধীরকে জানে না, চেনে না। প্রয়োজনও ছিলো না। বীণার সমস্ত বিষয় আমি সুধীরের সঙ্গে আলোচনা ক'রে সিদ্ধান্ত করি। সে-কথা বীণা জানে না। সুধীরকে বললাম, 'রিভলভার প্র্যাক্‌টিস্‌ করতে পারলে ভালো হ'তো। বীণারও ইচ্ছা। কোথাও গিয়ে প্র্যাক্‌টিস্‌ করা যায় না? শুধু আমি আর বীণা যাবো।'

সুধীর বললে, 'টেগার্ট নিজের ওপর আক্রমণ হবার পর থেকে সর্বত্র এমন সাংঘাতিক কড়া পুলিসের বেড়াজাল ফেলে ব'সে আছে যে, এখন কাছাকাছি কোথাও প্র্যাক্‌টিস্‌ করা অসম্ভব। করতে গেলে হয়তো কন্‌ভোকেশানে যাবার আগে প্র্যাক্‌টিসের সময়ই ধরা পড়তে হবে। রিভলভারটা একটু নিচে রেখে কোমরের কাছ থেকে লক্ষ্য (aim) করতে বলবেন। নইলে ঝাঁকুনি লেগে রিভলভার ওপর দিকে উঠে যায়, গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।'

বীণা এবার প্র্যাক্‌টিসের কথা বলতেই আমি অসুবিধার কারণ বুঝিয়ে বলি। আর, সঙ্গে-সঙ্গে বলি, কোমরের কাছে রিভলভার রেখে লক্ষ্য (aim) করতে।

রিভলভার কিনতে টাকা যোগাড় করতে হবে। চ'লে যাই

এক বন্ধুর কাছে। হাত পেতে বলি, 'টাকা দে, বড্ডো দরকার।' সে মুখে কিছু জিগ্যেস না ক'রে হাসতে-হাসতে ড্রয়ার খুলে ষাট টাকা বের ক'রে দিলো। যেন টাকাটা দিয়ে নিজেই পরম তৃপ্তি পেয়েছে। বললে, 'তোর জন্যই তো রেখে দিয়েছিলাম।' আশ্চর্য মেয়ে সে! জানে না কিসের জন্য টাকা চাইছি। একবার জিজ্ঞাসাও করবার প্রয়োজন বোধ করলো না। শুধু সে জানতো যে, আমি আছি বিপ্লবী দলে। তাই আগে থেকে আমাকে ভেবেই সে টাকা সঞ্চয় ক'রে রেখেছিলো। বিপ্লবী কাজের প্রতি ছিলো তার এত-খানি নীরব দরদ, তীব্র আগ্রহ। সেই সময়ে যে-ক'টি মেয়ে বিপ্লবী কাজে এগিয়ে সামনে এসেছিলো, তাদের পশ্চাতে এমনি আরো কতো মেয়ে যে ছিলো, যারা শুধু সামনে এসে কিছু করেনি, কিন্তু বিপ্লবী কাজের প্রতি ছিলো তাদের অন্তরের নিবিড় সহানুভূতি, গভীর অনুরাগ। যে-মেয়েটি আমাকে টাকা দিলো, তার নাম সুলতা কর। আমার বন্ধু সে, সহপাঠী।

আস্তে-আস্তে প্রয়োজনীয় বাকি টাকারও যোগাড় হ'য়ে যায়। রিভলভারটা কিনবার জন্য ২৮০৲ টাকা সুধীরের হাতে তুলে দিলাম। বীণা চেয়েছে আর-একটা জিনিস— পটাসিয়াম সায়নাইড। সে-কথাও বলি সুধীরকে। একটু জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে শেষে সুধীর শুধু বললে, 'আচ্ছা।'

কয়েকদিন পরে সুধীর আনলো রিভলভার, আনলো পটাসিয়াম সায়নাইড। রিভলভারের অংশগুলো খুলে-খুলে শেখালো আমাকে তার ব্যবহার। আমিও সমস্ত মন দিয়ে বুঝে নিলাম জিনিসটাকে, মুখস্থ ক'রে রাখি কথাগুলো।

সুধীর একগাদা গুলি আলাদা প্যাকেট ক'রে রেখেছিলো। রিভলভারটা গুলিশূন্য রেখে এবং গুলির প্যাকেটটা আলাদা ক'রে আমাকে দিয়ে দিলো। শুধু সায়নাইডটা দেবার সময় হাসতে-

হাসতে বললো, ‘সাবধান, এটাতে হাত দিয়ে তখুনি আবার মুখে হাত দেবেন না। কে জানে!’

সেদিন বিকেলে দেখা হ’লো বীণার সঙ্গে লেডিস্-পার্কে। বীণাকে নিয়ে বসলাম একধারে সঙ্গোপনে। বীণাকে পাঠাচ্ছি ‘দুর্গম মরুতে’, কানে বাজে, ‘লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার’।

আস্তে-আস্তে বলি, ‘এনেছি ভাই জিনিস।’ তার হাতে তুলে দিলাম রিভলভারটা, দিয়ে দিলাম গুলিভরা প্যাকেট। শুধু সায়নাইডটা দিতে মন সায় দিচ্ছিলো না। শেষ অবধি তাও দিলাম। বললাম, ‘কিন্তু খুব দরকার না হ’লে তুমি খেও না, মনু।’ মধুর হেসে বীণা বললে, ‘অত ভাবছো কেন, কমলাদি? দরকার না হ’লে খাবো না। কিন্তু, অতগুলো গুলি নিয়ে কি হবে? কয়েকটা দাও।’ কয়েকটা দিয়ে বাকিগুলো ফিরিয়ে নিলাম।

রিভলভারটা খুলে প্রতিটি কথা বীণাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। লেডিস্-পার্কে ব’সে লোকচক্ষুর মধ্যে সেটা বার করাই সম্ভব ছিলো না। চললাম দু-জনে রামমোহন লাইব্রেরিতে। সেখানে তিনতলার ছোট্টো ঘরটাতে গিয়ে দু-জনে নিরিবিলি বসলাম। বোঝানো যখন শেষ হ’য়ে গেল, ঠিক সেই সময়ে একজন ভদ্রলোক উপরে উঠে এলেন। মুহূর্তে সব লুকিয়ে ফেললাম। তারপর আস্তে-আস্তে বাকি কথা শেষ ক’রে দু-জনে বেরিয়ে এলাম।

বীণার বাস এসে পড়লো। অপরূপ হেসে বিদায় নিলো সে। মনে হ’তে লাগলো, ‘ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান, আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা দিবে কোন্ বলিদান!’

ফিরে এলাম বাড়িতে। মন আমার শত আশঙ্কায় আচ্ছন্ন। সুধীর রিভলভার আর সায়নাইড দিয়ে তার পরদিনই জামসেদপুর রওনা হ’য়ে গেছে। অ্যাক্শানের সময় সে কলকাতা থাকবে না, যেন অ্যাক্শানের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই।

কন্‌ভোকেশনের আর কয়েকটা দিন মাত্র বাকি। বীণ ডায়োসেসান কলেজের বোর্ডিং-এ আছে, সুধীর জামসেদপুরে, আমি বাড়িতে। তিন প্রান্তে তিন জন, তবু সেই ক'দিন কেউ বোধ হয় আর অন্য কোনোও চিন্তাই করেনি।

বোর্ডিং থেকে দু-একদিনের ছুটিতে বীণা বাড়ি এসেছিলো, বাবা-মা'র সঙ্গে শেষ একসঙ্গে থাকবে। শেষ দেখা করতে আমিও গেছি। বীণা বললে, 'জানো কমলাদি, রিভলভারটা আমি সব সময়ে নিজের সঙ্গে-সঙ্গে রাখি। এমন নিরাপদ জায়গা আর আমি পাই না। রাত্রিতেও ওটা নিয়েই শুই।' তার সঙ্গে আর-একবার সব কথা আলোচনা করি। দৃঢ়, শান্ত সে। শিশুর মতো সরল দৃষ্টি তার। অপেক্ষা ক'রে রয়েছে, আর কি বলবো। ছোটো বোনটি যেন নতমস্তকে সমস্ত নির্দেশ পালন করতে প্রস্তুত হ'য়ে আছে। দু-জনের যা-কিছু বলার ছিলো সবই শেষবারের মতো বলা হ'য়ে গেল। তারপর বিদায় নিলাম নিঃশব্দে। ভাষা মূক হ'য়ে গেছে। তাকিয়ে রইলো বীণা আমার চ'লে যাওয়ার দিকে, অপূর্ব মুখচ্ছবি তার।

৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩২ সাল। সেনেট-হলে বিকেলে কন্‌ভোকেশান চলছে। আমি বাড়ির ছাতে ব'সে আছি। সমস্ত প্রাণ ছট্‌ফট্‌ ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে বীণার চারিদিকে, কন্‌ভোকেশান-হলের মধ্যে। হঠাৎ বাবা বাইরে থেকে ছুটে এসেছেন বাড়িতে। বাবা ছাতে আসতেই আমি চম্‌কে উঠেছি, মনে হ'লো, বীণা ডাকতে এসেছে। বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি চম্‌কালে কেন? আজ কিছুক্ষণ আগে একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে। কন্‌ভোকেশান-হলে বীণা দাস নামে একটি মেয়ে গভর্নরকে গুলি করেছে। তুমি কি কিছু জানো?'

'না, বাবা।'

'পুলিস কলকাতার নানা জায়গা তন্ন-তন্ন ক'রে তল্লাসী করছে। সাবধানে থেকো।'

'আচ্ছা।'

চিন্তিত মুখে নিচে নেমে গেলেন বাবা। ঘটনাটা আমি যা শুনেছি তার মর্ম এইরকম: সেনেট-হলে গভর্নর জ্যাক্‌সান্‌ যখন তাঁর কন্‌ভোকেশনের অভিভাষণটা পড়ছিলেন, তখন বীণা তার আসন থেকে উঠে এসে গভর্নরকে গুলি করে। ঠিক কানের পাশ দিয়ে গুলিটা চ'লে যায়। গভর্নর নাকি তৎক্ষণাৎ মাথাটা সরিয়ে নিয়েছিলেন, সামান্য একটুর জন্য লাগেনি। সৈনিকের জাত! অতিসতর্ক কান! সঙ্গে-সঙ্গে কর্নেল সুরাওয়ার্দি ডায়াস থেকে নেমে ছুটে এসে বীণার গলাটা টিপে ধ'রে প্রাণপণে বসিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। বীণা সেই অবস্থাতেই বাকি গুলি ক'টা ছুঁড়তে থাকে। যে-ক'টা গুলি রিভলভারে পোরা ছিলো সব ক'টাই সে ছুঁড়েছিলো। গভর্নরের গায়ে হয়তো লাগেনি, কিন্তু গুলি থাকতে তার হাতকে বাধা দিতেও কারো সাধ্য ছিলো না। ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভিত্তির মূলে ফাটল ধরাতে সেই গুলি ছুটেছিলো, গুলি না চললে আজ বীণার চলবে কেন?

বীণাকে নিয়ে গেছে ইলিশিয়াম রো-তে। তারপর লালবাজারে। পরদিন পুলিস এলো আমাদের বাড়িতে। কী তল্লাসীর ধরন! যেন রিভলভারের স্বপ্ন দেখছে ওরা আনাচে-কানাচে, কাপড়ের ভাঁজে, বালিশের খোলে। তল্লাসীর পর হুকুম এলো, আমাকে যেতে হবে ইলিশিয়াম রো-তে।

সেই ইলিশিয়াম রো, সেই এস. বি. আপিস, সেই জেরা। বীণা কোথায় রিভলভার পেলো? কারা আছে এর পিছনে?

উত্তর দিই, 'আমি তো কিছুই জানি না।'

ওরা বীণার গায়ে হাত তোলেনি বটে কিন্তু অপমানকর ভাষায় জেরা করেছে। বীণা কিছুই বলেনি। তার সঙ্গে আমার কিন্তু দেখা হ'লো না।

সমস্ত দিন জেরার পর রাত ন'টায় আমাকে মুক্তি দিলো। বাবা হঠাৎ আশাতীত ভাবে আমাকে বাড়ি ফিরতে দেখে অবাক হ'য়ে একেবারে মাথাটা জড়িয়ে ধরলেন, যেন হারানো রতন ফিরে পেয়েছেন।

আমাকে কিন্তু পুলিস ছেড়ে দেবার মতলবে ছাড়েনি। গভর্নরকে গুলি করার ষড়যন্ত্রে কারা লিপ্ত আছে সে-কথা পুলিস হয়তো জানেনি, কিন্তু আমাকে ছেড়ে দিয়ে তারা বোধ হয় লক্ষ্য করছিলো আমার পিছু নিলে কিছু সন্ধান পাওয়া যায় কিনা। ছাড়বার উদ্দেশ্য যে ছিলো না সেটা বুঝেছিলাম এই জন্য যে, তার বাইশ দিন পরে ১ মার্চ আমাকে আবার গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গেল জেলে। রেখে দিলো ডেটিনিউ ক'রে প্রায় সোয়া ছয় বৎসর।

যে বাইশ দিন বাইরে ছিলাম সে-সময়ে অতি ভালো মেয়ের মতো স্কুলে পড়াই আর দু'-মাইল পথ বাড়ি থেকে স্কুলে হেঁটে যাই, ফিরিও। পয়সা বাঁচে।

চারিদিকে বীণাকে নিয়ে হৈ-হৈ ব্যাপার। গভর্নর শুটিং কেস একদিনেই শেষ ক'রে দিলো। বীণার স্টেট্‌মেণ্ট বেরোলো। সব কাগজে সাহস ক'রে সবটা ছাপাতেও পারলো না। সাজা হ'য়ে গেল বীণার নয় বছর সশ্রম কারাদণ্ড।

এই সময়ে ডায়োসেসান কলেজের সিস্টাররা নাকি বীণার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা বীণাকে খুব স্নেহ করতেন। বীণার মতো ভালো মেয়ে যে এরকম কাজ করতে পারে তা নাকি তাঁদের ধারণার বাইরে ছিলো। আমি ভাবি, ইংলণ্ড যদি আমাদের মতো পদানত দেশ থাকতো তবে তাদের দেশের তেজস্বী ইংরেজ মেয়েরা

কি পরাধীনতার গ্লানি ঘোচাবার জন্য ঠিক এমনিতরো কাজই করতে পারতো না? ভালো মেয়েদের বুঝি শুধু লেখাপড়ায় প্রথম স্থান অধিকার করতে হবে? অথবা সুবোধ বালিকার মতো নির্বিরোধ থেকে জাতির অপমানকে মাথা পেতে নিতে হবে? অন্ততঃ ইংরেজের মতো স্বাধীনতাপ্রেমিক জাতির পক্ষে এই মনোভাব যেন ভাবতে কেমন লাগে! মনে হয়, তাঁরা হয়তো শুধু রাজার জাত হিসাবেই বীণাকে বিচার করেছিলেন।

শৃঙ্খলিত দেশের ভালো ছেলেমেয়ের সংজ্ঞা বদলাবার সময় এসেছিলো অনেকদিন আগেই। পরাধীনতার অপমানের কালিমা লেগে থাকে প্রতিটি ছেলেমেয়ের গায়ে, তার অণু-পরমাণুতে, অস্তিত্বে। কেউ যদি সেই কলঙ্ক ঘোচাতে সাহস ক'রে এগিয়ে যায়, বাকিরা চম্‌কে উঠে ভাবে, তাই তো! আমরাও করবো, আমরাও আছি তোমাদেরই সঙ্গে। সেই আলোড়ন জেগেছিলো সেদিন জাতির বক্ষে। রক্ত তাদের চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিলো। ভালো ছেলে-মেয়ের উদাহরণ এই পথেই ব'য়ে চলেছিলো।

সুধীর জামসেদপুর থেকে ফিরে এলো কয়েকদিন পরেই। আলোচনা করি, গভর্নরকে গুলি করার ফলটা কি দাঁড়ালো। সুধীর বলে, 'আমরা যা চেয়েছিলাম তাই ফল দাঁড়িয়েছে। বাংলা প্রদেশে ইংরেজশাসনের যে সুপ্রীম সিম্বল সেই গভর্নরকে আঘাত করাতে চলেছে ওদের থরহরি কম্পন। গভর্নরের মৃত্যুটাই বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা হচ্ছে, আমাদের আঘাত ইংরেজ শাসনের দৃঢ় ভিত্তিকে কতো-খানি শিথিল করতে পেরেছে, বিপ্লবের স্রোতে আমরা কতোখানি আবর্ত আনতে পেরেছি। কী আলোড়ন চলছে! যে-মোমেন্টাম আমরা রেখে যেতে চেয়েছিলাম সেটাই তো এসে গেছে। তাঁর মৃত্যুতেও যা হ'তো, মৃত্যু না-ঘ'টেও বিশেষ কিছু কম হয়নি। এই তো আমাদের সার্থকতা। এ ছাড়া আর খুব বেশি-কিছু এমন কি হ'তে পারতো?"

ওদিকে বীণার বাড়ির অবস্থা বর্ণনার বাইরে। বীণার বাবা সাধু পুরুষ। বিদ্বান তিনি, ঋষিতুল্য মানুষ। তাঁর আদর্শে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে বীণা। একদিকে সেই আদর্শে আঘাত, অন্যদিকে বীণার জেলে যাওয়া, দু'টোতে মিলে বীণার বাবা-মা যেন পাগল হ'য়ে যাবার মতো। বুকে ছুরি বসিয়ে ছেড়ে দিলে যে-অবস্থা হয়, বুঝি সেই রকম বুকে ছুরি নিয়ে তিনি দিনের-পর-দিন কাটাতে লাগলেন। পরাধীন দেশের কতো ছেলেমেয়ে যে এমনি ক'রে কতো বাবা-মাকে শেলবিদ্ধ ক'রে চ'লে গেছে তার অন্ত নেই। কতো সন্তান আর এ-জীবনে ফিরে আসেনি। এই তো তাদের পুরস্কার।

॥ এগারো ॥

ওদিকে দীনেশ মজুমদার মেদিনীপুর জেল থেকে পালিয়ে এসেছেন। কিন্তু কোথায় তিনি আছেন, দেখা করা ঠিক হবে কিনা বুঝি না। একদিন স্কুলে পড়াচ্ছি এমন সময় একজন এসে খবর দিলেন, দীনেশবাবু আমাকে নিয়ে যেতে পাঠিয়েছেন। রওনা হ'লাম তাঁর সঙ্গে। দমদমে একটি ছোট্টো ঘরে ব'সে তিনি অপেক্ষা করছেন। সেই পরিচিত হাসি, সেই আপন পরিবেশ।

প্রথমেই তিনি বীণার কথা তুললেন। তাঁর মনে একটা ধারণা হয়েছিলো যে, ওই ঘটনার মধ্যে আমি হয়তো আছি। আমি কিন্তু এমন নির্লিপ্তমুখে চুপ ক'রে ব'সে রইলাম যেন এর বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানি না। এঁদেরই শেখানো সেই ডিসিপ্লিন আমাকে সেদিন উত্তর দিতে দেয়নি। অথচ তাঁর মতো আর ক'জনের অধিকার ছিলো আমার এই গুপ্তকথা জানবার? তবুও চুপ ক'রেই রইলাম। সে-কথা চিরদিনের জন্যই তাঁর অজ্ঞাত র'য়ে গেল।

তারপর তাঁর নিজের কথা। কী দারুণ দুর্যোগভরা জীবন তাঁর! টাকার অসুবিধা, থাকবার স্থানের অভাব, পুলিস হয়রান ক'রে তুলেছে। পলাতক জীবন যে কতো কঠিন, কতো বিপদসংকুল তা বর্ণনার অতীত। এই পলাতক জীবনের শুরু থেকে তাঁর ফাঁসির জন্য গ্রেপ্তার পর্যন্ত একটি দিনও বুঝি নিশ্চিন্তে কাটতে পারেনি। তবু সেই অশান্ত, দুর্দান্ত ছেলে মৃত্যু পর্যন্ত আর কোথাও থামতে পারেননি, দম নেবারও সময় ছিলো না।

বলতে লাগলেন, বন্ধুরা কেউ তাঁকে চীন যেতে, কেউ জাপানে গিয়ে রাসবিহারী বোসের সঙ্গে যোগ রেখে ভারতের বিপ্লবকে সাহায্য করতে পরামর্শ দিচ্ছেন। কিন্তু এ-সব প্রস্তাব তাঁর ভালো লাগেনি। বললেন, 'এখানেই বিপ্লবী কাজের অন্ত নেই, এখানে থেকেই কাজ ক'রে যাবো, কি বলেন?' আমি কি বলবো? শুধু

মনে হ'তে লাগলো, তাঁর অদ্ভুত সুখমাখা দুঃখময় জীবনে তাঁর নিজের যা ভালো লাগে তাই হোক্। মনে হ'তে লাগলো, এমন কিছু তাঁর করতে হবে যা দিয়ে জাগে দেশে বিপুল আলোড়ন, যাতে মানুষ উদ্দীপ্ত হ'য়ে জীবন দিতে আপনি এগিয়ে যায়, ওদিকে বিদেশী শাসনের ভিত্তি ওঠে ট'লে। জানতাম, এই ছিলো তাঁর সান্ত্বনার একমাত্র উপায়। তাঁর নিজের তৃপ্তিটুকু ছাড়া আর কিছুই আমি ভাবতে পারতাম না। ভারাক্রান্ত মনে বাড়ি ফিরে এলাম। আবার দেখা হবে এই আশা নিয়েই ফিরে এসেছিলাম। কিন্তু দেখা আর এ-জীবনে হ'লো না। যা আমার বলার ছিলো, যে-কথা জানতে তাঁর সর্বাপেক্ষা বেশি দাবি ছিলো, সে-কথা তাঁকে আর কোনোদিনই জানানো হ'লো না। দু-একদিনের মধ্যেই আমাকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গেল।

তারপর প্রায় দু-বছর ধ'রে পলাতক জীবনের অসম্ভব দুঃখ মাথায় নিয়ে কঠিন সংকট ও মহাদুর্যোগ পার হ'য়ে দীনেশ চলেছিলেন দুর্গম যাত্রায়।

ওয়াটসন্ ছিলেন স্টেট্সম্যান কাগজের সম্পাদক। স্টেট্সম্যান ছিলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যরক্ষার মুখপত্র, বিলেতি স্বার্থের প্রতিনিধি। শুধু তাই নয়, বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার চালিয়েছে তারা দিনের-পর-দিন। তারা বলতো, এই সমস্ত বিপ্লবীদের দেয়ালের সামনে দাঁড় করিয়ে গুলি ক'রে মারা উচিত। দেশে হিন্দু-মুসলিম বিচ্ছেদের এবং মনোমালিন্য সৃষ্টির আবহাওয়াকে তারাই সাহায্য করেছে, পুষ্টি দিয়েছে। এক কথায়, স্টেট্সম্যান ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের এবং জাতীয়তাবোধের পরিপন্থী কাগজ ছিলো। কাজেই তার সম্পাদককে আঘাত করতে পারলে, সরিয়ে দিতে পারলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষার একটা যন্ত্রে আঘাত লাগবে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে দীনেশ মজুমদার ওয়াটসন্-হত্যার ষড়যন্ত্র করতে

লাগলেন। ওয়াটসন্‌কে দু-বার আঘাত করা হয়, কিন্তু তিনি নিহত হননি। অবশেষে এদেশ থেকে পালিয়ে বিলেত পৌঁছে তবে তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। এমনি ক'রে চ'লে গিয়েছিলেন ভিলিয়ার্স, যেতে হয়েছিলো শেষ অবধি টেগার্টকেও।

ওয়াটসন্-কেসের ঘটনা দুটি ছিলো এইরকম: ড্যালহাউসি স্কোয়ারে টেগার্টকে হত্যা করতে না পারার ব্যর্থতা অতুল সেনকে অস্থির ক'রে তুলেছিলো। কিছু-একটা করবার জন্য তিনি ছটফট ক'রে বেড়াচ্ছিলেন। যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে তাঁর সহপাঠী ছিলেন সুনীল চ্যাটার্জি। সুনীল চ্যাটার্জি তাঁর মনের অবস্থা সবই জানতেন। সুনীলবাবু সে-সময়ে তাঁর সমস্ত কাজই দীনেশ মজুমদারের সঙ্গে আলোচনা পরামর্শ ক'রে সমাধা করতেন।

সেদিন ওয়াটসন্ যখন স্টেট্‌সম্যান আপিসে ঢুকছিলেন এবং প্রধান ফটক পার হ'য়ে গাড়িটার গতি যখন ক'মে আসছিলো সেই সময়ে গাড়িটার ফুটবোর্ডের উপর দাঁড়িয়ে উঠে অতুল সেন গুলি ছুঁড়লেন। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'লো। আর্দালি প্রভৃতিরা ছুটে এলো তাঁকে ধ'রে ফেলতে। ততক্ষণে তিনি পটাসিয়াম সায়নাইড খেয়ে ওপারের রাস্তায়। ধরা আর তাঁকে গেল না। অতুল সেনের মতো এমন মধুর স্বভাব, এমন নীরব সৈনিক শুধু তখনকার দিনের কর্মীরাই হ'তে পারতেন। তিনি ছিলেন সেই ধরনের সৈনিক যিনি নির্দেশের অপেক্ষায় দিন গুনতেন, নির্দেশ আসামাত্র নিজের জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত।

ওয়াটসন্‌কে দ্বিতীয়বার হত্যার চেষ্টা করতে যাঁরা যান তাঁদের মধ্যে ছিলেন অনিল ভাদুড়ি, মণি লাহিড়ি, বীরেন রায় প্রভৃতি। ব্যর্থ হ'য়ে পটাসিয়াম সায়নাইড খেয়ে চ'লে গেলেন অনিল ভাদুড়ি, মণি লাহিড়ি। অনিল ছিলেন বিধবা মায়ের একমাত্র পুত্র। মামা-বাড়িতে প্রতিটি দিন অতি কষ্টে অতিবাহিত হয়। পঞ্চম শ্রেণী

পর্যন্ত পড়ার পর মামারা তাঁকে গাঁজার দোকানে বসিয়ে দেন। সেই ষোলো-সতেরো বছর বয়সের জোয়ান ছেলের স্ফুটনোন্মুখ জীবন সাড়া দিয়ে উঠেছিলো বৃহত্তর জগতের আহ্বানে। গাঁজার দোকানে তাঁর চলবে কেন? মণি লাহিড়ি ছিলেন অবস্থাপন্ন পিতা-মাতার আদরের সন্তান, পনেরো-ষোলো বছর বয়স, নবম শ্রেণীর ছাত্র। যেমনি প্রাণচাঞ্চল্য তেমনি উৎসাহউদ্দীপ্ত এক কিশোর।

এই ষড়যন্ত্রের মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সুনীল চ্যাটার্জি, প্রমোদ বোস, বীরেন রায়, চারু মুখার্জি প্রভৃতি। সুনীল চ্যাটার্জির সাজা হ'লো যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, প্রমোদ বোসের দশ বছর।

তার পরে দীনেশ চ'লে গেলেন চন্দননগরে। সেখানেও গোয়েন্দা রেহাই দিলো না। এক রাত্রে পুলিস গিয়ে সেই আশ্রয়স্থানটি ঘেরাও করলো। তাঁর দুইজন সঙ্গী বীরেন রায় ও নলিনী দাসকে সঙ্গে নিয়ে রিভলভার হাতে বেরিয়ে পড়লেন দীনেশ। সামনেই ছিলো পুলিসের বড়োকর্তা কুইন্‌স্‌ সাহেব। তার বুকে গুলি বিদ্ধ ক'রে, আরো গুলি ছুঁড়তে-ছুঁড়তে পুলিসের ব্যূহ ভেদ ক'রে বেরিয়ে গেলেন তিনি। কুইন্‌স্‌ সাহেব তৎক্ষণাৎ নিহত হ'লেন।

দীনেশ ফিরে এলেন কলকাতায়। যে-কোনো বিপ্লবী কাজ করতে গেলে প্রথমেই হয় টাকার অভাব। দীনেশ ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন গ্রিণ্ড্‌লে ব্যাঙ্কের টাকা সরানো যায় কিনা। ওই ব্যাঙ্কের কর্মচারী ছিলেন কানাই ব্যানার্জি। দীনেশের সহকর্মী এবং বন্ধু তিনি। ব্যাঙ্কে জন তিনেকের অ্যাকাউণ্ট থেকে টাকাটা তোলা হ'লো নাম জাল ক'রে। চেকগুলোতে জাল সই করেছিলেন দীনেশ মজুমদার নিজের হাতে। এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন কানাই ব্যানার্জি, জগদানন্দ মুখার্জি, ফণী দাশগুপ্ত ও দীনেশ মজুমদার নিজে। সাতাশ হাজার টাকা সংগ্রহ হ'লো। একমাত্র কানাই ব্যানার্জি এই সম্পর্কে গ্রেপ্তার হ'য়ে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

সেই সময়ে কলকাতায় টেগার্ট-সাহেব নিজের আততায়ী দীনেশ মজুমদারকে গ্রেপ্তার করবার জন্য সবরকম কৌশলের ফাঁদ পেতে ব'সে আছে। নারায়ণ ব্যানার্জি নামক পুলিসের অজ্ঞাত একজন কর্মীর নামে তখন কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে একটি বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়। তিনি সেখানে সপরিবারে বাস করতে থাকেন। দীনেশ মজুমদার সেই বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। সেখানে সঙ্গে ছিলেন প্রধানতঃ জগদানন্দ মুখার্জি ও নলিনী দাস। প্রায় মাসখানেক এমনি ক'রে কেটে গেল। অবশেষে পুলিস খবর পেয়ে একদিন ঘিরে ফেললো সেই বাড়িটা। গুলি চললো উভয় পক্ষে। জগদানন্দ ও নলিনী দাসকে নিয়ে যুদ্ধ করতে-করতে হাতের গুলি যখন নিঃশেষ হ'য়ে গেল তখন দীনেশ গ্রেপ্তার হ'তে বাধ্য হ'লেন, এবং বাকি ক'জনও।

স্পেশাল ট্রাইবুনালের বিচার বসলো। নারায়ণ ব্যানার্জি মুক্তি পেলেন। নলিনী দাস ও জগদানন্দ মুখার্জির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হ'য়ে গেল। দীনেশ মজুমদারের বিরুদ্ধে অনেকগুলো মামলা আগে থেকেই তৈরি ছিলো। জেল পালানো, নরহত্যা, হত্যার ষড়যন্ত্র, ব্যাঙ্কের টাকা সরানোর ষড়যন্ত্র, কোনোটাই তাঁর বেঁচে থাকবার যোগ্য অপরাধ নয়। কাজেই ইংরেজের আদালতে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যরক্ষার স্বার্থে দীনেশের ফাঁসির হুকুম হ'য়ে গেল। অগ্নিযুগের আর-এক অধ্যায়ে এসে ফাঁসির রজ্জুতে দীনেশের কয়েক ফোঁটা তপ্ত রক্ত তাঁর বিপ্লবী দুরন্ত জীবনকে সার্থক ক'রে গেল। সমস্ত দেশ আর-একবার চাবুক খেয়ে চমকে উঠলো। মুক্তির ইতিহাস কলরোল ক'রে দ্বিগুণ বেগে ধেয়ে চললো। সেটা ছিলো ১৯৩৪ সালের ৯ জুন, বাংলা ২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১ সাল।

॥ বারো ॥

১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত বিপ্লবী আন্দোলনের যে রূপ ছিলো সেটা সংক্ষেপে বলি। তার পশ্চাতের পটভূমিকাও একটু স্পর্শ ক'রে যাই, তা হ'লে এই আন্দোলনের ধারাটি সহজেই বুঝতে পারা যাবে।

১৯০৮ সালে বারীন ঘোষ প্রভৃতির বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ এবং আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলার পর ১৯১৫ সালে বিপ্লবী বীর যতীন মুখার্জির নেতৃত্বে বাংলার যুবকেরা অগ্নিযুগের নতুন এক অধ্যায় শুরু করেছিলেন। তার নাম ছিলো ইন্দো-জার্মান ষড়যন্ত্র। তখন ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত জার্মানদের নিকট থেকে অস্ত্রশস্ত্র এনে ভারতের বিপ্লবীরা ইংরেজকে ভারতে আঘাত হেনে স্বাধীনতার একটা রাস্তা খুঁজে নিতে চেয়েছিলেন। এই বিপ্লবের কাজে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি ছিলেন সর্বাধিনায়ক।

আমেরিকা থেকে ভারতবর্ষে অস্ত্রশস্ত্র পাঠাবার বেশি সুযোগ হবে এই আশা তাঁরা করেছিলেন। যুদ্ধ বেধে গেলে ক্যালিফোর্নিয়ার গদর দলের নেতা রামচন্দ্র দলে-দলে পাঞ্জাবীদের ভারতে পাঠাতে লাগলেন, দেশে তাঁরা বিপ্লব ঘটাবেন এই আশায়। ওদিকে বার্লিনে বীরেন চট্টোপাধ্যায় সংবাদপত্রে লিখলেন যে, জাপান এশিয়ার শত্রু। কারণ, যে-সব সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এশিয়ার দেশগুলিকে পদানত ক'রে রেখেছে তাদের পক্ষ হ'য়ে জাপান তখন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলো। এরই ফলে জার্মান পররাষ্ট্রবিভাগে চট্টোপাধ্যায়ের ডাক পড়ে এবং তাঁর সঙ্গে আলোচনার পর জার্মানী ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টায় অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে স্বীকৃত হয়। Indian Independence Committee নামে বার্লিনে একটি সমিতি গঠিত হ'লো। ধীরেন সরকার ও মারাঠে ওয়াশিংটনে প্রেরিত হ'লেন।

জার্মানীর সঙ্গে যে-চুক্তি হ'লো তার শর্ত ছিলো যে, বিপ্লবীরা

জাতীয় ঋণ হিসাবে জার্মানীর কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করবেন এবং বিপ্লব সফল হ'লে স্বাধীন ভারত গভর্নমেণ্ট সে-অর্থ পরিশোধ করবেন। জার্মানী অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করবে এবং তাঁদের বিদেশীয় রাষ্ট্রদূতগণ বিপ্লবীদের সঙ্গে সর্বপ্রকারে সহযোগিতা করবেন। জার্মান সামরিক অফিসারগণ শ্যাম দেশে এসে ভারতীয় বিপ্লবী সেনাবাহিনীকে শিক্ষাপ্রদান করবেন। শিক্ষা সমাপ্ত হ'লে তাঁরা বর্মার ভিতর দিয়ে ভারতে অভিযান করবেন কিন্তু কোনো জার্মান সৈন্য ভারতভূমিতে পদার্পণ করবেন না। বিদেশের সঙ্গে এই সমস্ত ব্যবস্থা এবং আয়োজনের ভার ছিলো যাদুগোপাল মুখার্জির উপর।

সান্‌ফ্রান্সিসকোর: একজন জার্মান ব্যবসায়ী 'মাভেরিক' নামে একটি জাহাজ কিনে নিলেন। কথা ছিলো, এই জাহাজখানা মেক্সিকোর ছয়শত মাইল পশ্চিমে সক্‌ড়ো দ্বীপে যাবে। 'অ্যানি লার্সেন' নামে আর-একখানা জাহাজ ত্রিশ হাজার রাইফেল, প্রত্যেকটার জন্য চারশো ক'রে গুলি এবং দুই লক্ষ টাকা নিয়ে সক্‌ড়ো দ্বীপে এসে 'মাভেরিক' জাহাজে সেগুলি তুলে দেবে। 'মাভেরিক' তখন জাভা হ'য়ে ব্যাটাভিয়াতে যাবে। সেখান থেকে অস্ত্রগুলি ভারতবর্ষে আসবে।

এদিকে রাসবিহারী বোসের নেতৃত্বে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পর্যন্ত সমগ্র উত্তর-ভারতে একসঙ্গে সৈনিকবিদ্রোহ এবং বিপ্লবের আয়োজন চলতে লাগলো। বাংলাদেশের প্রচেষ্টার পরিকল্পনা ছিলো এইরকম : বাংলার বাইরে থেকে যা'তে ইংরেজ দ্রুত সৈন্য আমদানী করতে না পারে সেজন্য যতীন্দ্রনাথ মুখার্জির নেতৃত্বে একদল বালেশ্বরে মাদ্রাজ লাইন এবং ভোলানাথ চ্যাটার্জির নেতৃত্বে আর-একদল বোম্বে লাইন উড়িয়ে দেবেন। সতীশ চক্রবর্তী দলবলসহ অজয় নদের রেলওয়ে পোল উড়িয়ে দেবেন। বরিশালের

বিপ্লবীরা পূর্ববঙ্গ অধিকার করবেন। তারপর কতক অংশ কলকাতার দিকে রওনা হবেন। কলকাতার দিকে যত অস্ত্রাগার আছে সেগুলি দখল ক'রে নরেন ভট্টাচার্য (M. N. Roy) এবং বিপিন গাঙ্গুলি সদলবলে ফোর্ট উইলিয়াম দখল করবেন। ফোর্ট উইলিয়ামের ভারতীয় সৈন্যগণ তখন বিপ্লববাহিনীর সঙ্গে যোগ দেবেন কথা দিয়েছিলেন।

'মাভেরিক'-এর অস্ত্রশস্ত্র কিন্তু আর পৌঁছালো না। জার্মানরা নিউইয়র্ক থেকে অস্ত্র সংগ্রহ ক'রে 'অ্যানি লার্সেন' জাহাজে তুলে দেয়। আমেরিকা-সরকারের কড়া দৃষ্টি এড়াতে গিয়ে অস্ত্র সংগ্রহ করতে দেরি হ'য়ে যায়। তাই অস্ত্রপূর্ণ 'অ্যানি লার্সেন' যখন সক্‌ড়ো দ্বীপে পৌঁছালো তার আগেই 'মাভেরিক' অপেক্ষা ক'রে-ক'রে অবশেষে জাভায় চ'লে গেছে। ওদিকে 'অ্যানি লার্সেন' ওয়াশিংটনের হকুইয়ামে যেই পৌঁছালো অমনি আমেরিকা-সরকার সমস্ত অস্ত্র বাজেয়াপ্ত ক'রে নিলো।

এর পিছনে ছিলো বিদেশীদের বিশ্বাসঘাতকতা। আমেরিকাতে তখন দুনিয়ার সমস্ত বিপ্লবী আপন-আপন দেশ স্বাধীন করবার চেষ্টায় গেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে আমাদের ভারতবর্ষের বিপ্লবীরা সেখানে যেমন জার্মানীর সাহায্যে ইংরেজের বিরুদ্ধে নিজের দেশে বিপ্লব এনে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করছিলেন, ঠিক তেমনি চেকোশ্লোভাকরা ইংরেজ ও ফরাসীর সাহায্যে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে বিপ্লবের আয়োজন করছিলেন। সেখানে একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ ভারতীয়রা এবং চেকোশ্লোভাকরা পরস্পরকে পরম বন্ধুর মতো দেখতেন এবং একে অন্যের কার্যাবলী জানতেন। চেকো-শ্লোভাকরা নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির আশায় ফরাসী ও ইংরেজকে খুশি করতে চাইলেন। তাঁরা ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্র সম্পর্কে খবর ফরাসীকে জানিয়ে দিলেন। কাজেই ইংরেজ সমস্ত খবর পেয়ে গেল।

ইংরেজ খবর পেয়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গেই একদিকে যেমন অস্ত্রশস্ত্র আনা সম্ভব হ'লো না, অন্যদিকে ভারতে বিপ্লবীদের ঘাঁটিগুলো তারা ধ্বংস করতে শুরু করলো। বীরশ্রেষ্ঠ যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি বালেশ্বরের খণ্ডযুদ্ধে নিহত হন এবং ব্যাপক গ্রেপ্তার চলতে থাকে। বিপ্লবী নেতা ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত তাঁর লেখায় যতীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলেছেন, 'বাংলার আকাশ থেকে সেদিন কতো বড়ো গ্রহপাত হ'য়ে গেল বাঙালী জাত তা জানতেও পেলো না।' যতীন্দ্রনাথের লেখা একখানা খাতা তখন পুলিসের হাতে পড়েছিলো। ওই খণ্ডযুদ্ধের মামলার সময় এই খাতার বিষয় বলতে গিয়ে তখনকার বিহার-উড়িষ্যার পুলিসের ডি. আই. জি রাইল্যাণ্ড বলেছিলেন, 'এই মানুষটি বেঁচে থাকলে সমস্ত পৃথিবীর শিক্ষক ও নেতৃস্থানীয় হ'তে পারতেন।'

যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরও যাদুগোপাল মুখার্জির নেতৃত্বে দেশে বিপ্লব আনবার একটা বিপুল প্রচেষ্টা চলেছিলো। সেই যুগের সেই নিদারুণ প্রয়াস আপাতঃ ব্যর্থ হ'লেও মহাগৌরবময় সেই ব্যর্থতা। সেই সময়ে কতো যে ষড়যন্ত্রের মামলা, কতো যে বীরের ফাঁসি, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, বিনাবিচারে বন্দী, সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে কতো যে তিলে-তিলে ক্ষ'য়ে-ক্ষ'য়ে বেঁচে থাকা বা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা, তার সীমা সংখ্যা নেই। প্রভাব ছিলো তার গভীর ও বহুদূরপ্রসারী। বিপ্লবী বীর যতীন মুখার্জি বলতেন, 'আমরা মরবো, জাতি জাগবে।' তারই সাধনা চলেছিলো সেদিন। দেশ শ্রদ্ধানত চিত্তে অগ্নিযুগের এই বিপ্লবীদের কর্মধারাকে নীরব সমর্থন জানিয়েছিলো।

এই ধরনের বিরাট আয়োজনের সম্ভাবনাকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন এবং ধূলিসাৎ করবার জন্য ইংরেজ জারি করলো রাউলাট আইন। ১৯১৯ সালে এই রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ-সভা চলেছিলো অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে। সেই প্রতিবাদের গলা টিপে ধরতে গেল ইংরেজ। মাইকেল ওডায়ার বালক, বৃদ্ধ, যুবক,

যুবতীর সেই বিরাট জনসভার উপর চালিয়ে দিলো মেশিনগান। অসহায় নিরস্ত্র জনতার নিষ্পাপ রক্তে ভারতভূমি রঞ্জিত হ'য়ে উঠলো। জেগে উঠলো ভারতবর্ষে একটা তীব্র বিক্ষোভ ও চঞ্চলতা।

গান্ধীজী তখন ক্ষুব্ধ মূক জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রূপ দিতে চাইলেন। তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, কংগ্রেসকে নিয়ে তিনি অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করবেন। ১৯২০ সালে গান্ধীজী বললেন, দেশ তাঁর প্রোগ্রাম গ্রহণ করলে এক বছরে তিনি স্বরাজ আনবেন। বিপ্লবীরা দেখলেন যে, এই অহিংস অসহযোগ-আন্দোলনের ভিতর দিয়ে দেশের জনসাধারণের মধ্যে একটা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে একটা বিতৃষ্ণা ও প্রতিরোধশক্তি জাগবার সম্ভাবনা আছে।

১৯২০-২১ সালে প্রায় সব বিপ্লবী রাজবন্দীরাই মুক্তি পেলেন। ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে নাগপুর কংগ্রেসের সময় যুগান্তর দলের পক্ষ থেকে ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত প্রভৃতি গান্ধীজীর সঙ্গে এ-বিষয়ে আলোচনা করতে যান।

ভূপেন দত্ত বলেন, 'আপনার এক বছরে স্বরাজ কথার অর্থ কি? কংগ্রেসকে স্বাধীন ভারতের পার্লামেণ্ট ব'লে ঘোষণা করবেন কি?'

গান্ধীজী উত্তর দেন, 'ঠিক তাই (That is exactly my idea)।'

ভূপেন দত্ত বলেন, 'তা হ'লে তখনই বিপ্লব শুরু হবে, শেষ হবে না।' তিনি কথা দিলেন যে, বিপ্লবী আন্দোলনকে এই এক বছরের জন্য তাঁরা স্থগিত রাখবেন এবং সর্বান্তঃকরণে তাঁর কংগ্রেসের আন্দোলনে যোগদান করবেন।

যুগান্তর দল আন্দোলনে যোগদান করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। ওদিকে গ্রামে-গ্রামে তাঁরা কর্মীদের কেন্দ্রও গঠন ক'রে

চললেন। কারণ, গণ-আন্দোলন শেষ হ'য়ে গেলে এই কেন্দ্রগুলি গণসংযোগের জন্য কাজ ক'রে যাবে। বিপ্লবী ভাবধারা ভিতরে-ভিতরে র'য়েই গেল। কিন্তু যতদিন অসহযোগ-আন্দোলন চলেছিলো ততদিন এঁরা অস্ত্রসংগ্রহ অথবা বিপ্লবী কাজ কিছু করলেন না।

১৯২১ সালে যুগান্তর প্রভৃতি সকল বিপ্লবী দলই কংগ্রেসে যোগদান করে, শুধু একটি দল ছাড়া।

১৯২২ সালে চৌরিচৌরার ব্যাপারে গান্ধীজী কংগ্রেস আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। তারপর গান্ধীজী নিজে গ্রেপ্তার হ'য়ে গেলেন। আন্দোলন বন্ধ হ'য়ে যাওয়াতে পরিণতি এমন হ'লো না যে পাশাপাশি স্বাধীন গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। গান্ধীজীর কাছে কথা দেওয়া সেই এক বছরও কেটে গেছে। তখন আবার বিপ্লবীদের নিজেদের চিন্তাধারা অনুযায়ী ভাববার সময় এলো।

১৯২২ সালে চট্টগ্রামে যুগান্তর দলের এক গোপন কন্‌ফারেন্স বসে। সেখানে দলের নেতারা আলোচনা ক'রে স্থির করেন যে, বিপ্লবীদল পুনর্গঠন করা হবে এবং অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ চলতে থাকবে। বাংলার বিভিন্ন জেলায় এবং পাঞ্জাবেও বিপ্লবী সংগঠন চলতে লাগলো।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তখন সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করছেন এই বিপ্লবীদের উপর সমস্ত জেলায়। তা ছাড়া, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিও তখন এঁদেরই হাতে। ভূপতি মজুমদার তখন বাংলা কংগ্রেসের সেক্রেটারি। এইভাবে দেশের সমস্ত রাজনৈতিক কার্য-কলাপ এবং গুপ্ত সংগঠন এই দলের হাতে চ'লে আসছিলো। সেটা পুলিস পছন্দ করতে পারেনি। প্রধান বিপ্লবীশক্তি এঁদের হাতে এ-ভাবে থাকাতে পুলিস এই দলকে ভেঙে দেবার নানা চেষ্টা করতে লাগলো।

১৯২৩-২৪ সালে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট বিপ্লবী নেতা ডাক্তার যাদু-

গোপাল মুখার্জি থেকে আরম্ভ ক'রে ছোটো বড়ো বহু বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করতে লাগলো।

গোপীনাথ সাহা তখন অত্যাচারী পুলিস কমিশনার টেগার্ট-সাহেবকে হত্যা করার জন্য অধৈর্য হ'য়ে ওঠেন। পুলিস সেই খবর পেয়েছিলো। একজন এজেন্ট প্রভোকেটার ইচ্ছে ক'রে টেগার্ট-সাহেবের পরিবর্তে আর্নেস্ট ডে সাহেবকে দেখিয়ে দেয় গোপীনাথকে। গোপীনাথ এই এজেন্ট প্রভোকেটারকে দলের লোক ব'লেই বিশ্বাস করতেন। পুলিস এইভাবেই দলের ভিতরে-ভিতরে নিজেদের এজেন্ট প্রভোকেটার রাখতো। সেই ফাঁদে পা দিয়ে গোপীনাথ ভুল ক'রে টেগার্ট-সাহেবের বদলে আর্নেস্ট ডে সাহেবকে হত্যা করেন। এটা ১৯২৪ সালের জানুয়ারি মাসের ঘটনা। ফাঁসি হ'য়ে গেল গোপীনাথের।

জেলের ভিতরে পুলিস বিপ্লবীদল নষ্ট ক'রে দেবার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করে। পুলিসের ডেপুটি সুপারিনটেণ্ডেন্ট ভূপেন চ্যাটার্জি জেলের ভিতরে গিয়ে ছেলেদের সঙ্গে দিনের-পর-দিন মিশে, গল্প ক'রে এবং কাউকে-কাউকে পুলিসের ক্ষমতায় কিছু-কিছু সুবিধা দিয়ে ছেলেদের নৈতিক বল নষ্ট ক'রে দিতে লাগলো এবং নানা প্ররোচনা চালাতে লাগলো। প্রচার চালালো, দাদারা অর্থাৎ নেতারা কিছুই করবেন না। এই প্রচারের আকর্ষণে অনেক ক্ষতি এবং দলের ভিতর ভাঙন সত্যিই আরম্ভ হয়েছিলো।

এই সমস্ত প্ররোচনা এবং ছেলেদের অধঃপতন লক্ষ্য ক'রে অনেক কর্মীই আর সহ্য করতে পারেননি। জেলের মধ্যেই তাঁরা ভূপেন চ্যাটার্জিকে হত্যা করেন। ফাঁসি হ'য়ে গেল অনন্তহরি মিত্র এবং প্রমোদ চৌধুরীর। তাঁরা তখন দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার আসামী হিসাবে জেলে ছিলেন।

১৯২৮ সালে সকল রাজবন্দীই মুক্তি পেলেন। এই বছরেই

কলকাতায় কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন বসে। বিপ্লবী নেতারা স্থির করলেন যে, এই সুযোগে একটা স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীকে আন্দোলন হিসাবে গ'ড়ে তুলতে হবে। তার সর্বাধিনায়কত্বের ভার পড়লো সুভাষচন্দ্র বোসের উপর। স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে বিপ্লবী ভাবধারা সঞ্চারিত ক'রে চললেন বিপ্লবী নেতাগণ। বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে আগত তরুণচিত্তে চমক লাগলো।

বিপ্লবীদের মিলিটারি বিভাগ সম্বন্ধে ভূপেন দত্ত প্রভৃতি নেতাগণ পরিকল্পনা খাড়া করেছিলেন আগেই। তখনকার দিনের স্বেচ্ছাসেবক-আন্দোলন তারই অঙ্গ। প্রতি জেলায় গ'ড়ে উঠলো স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী। তার নেতৃত্ব রইলো বিপ্লবীদেরই হাতে।

এই ১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসের সময় সর্বদলীয় সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গান্ধীজী প্রস্তাব আনেন যে, ঔপনি-বেশিক স্বায়ত্তশাসন বা ডোমিনিয়ান স্টেটাস্ হবে কংগ্রেসের লক্ষ্য। কিন্তু বাংলার বিপ্লবীরা এতে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হন। তাঁদের তরফ থেকে বিশিষ্ট নেতৃবর্গ বিভিন্ন প্রতিনিধিদের ক্যাম্প ঘুরে-ঘুরে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত গঠন করেন। বিষয়-নির্বাচনী সমিতিতে বাংলার তরফ থেকে প্রবল বিরোধিতা করা হয় এবং কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনেও বিরোধিতা করার সিদ্ধান্তে অন্যান্য প্রদেশের প্রতিনিধিদের প্রচুর সমর্থন লাভের সম্ভাবনা দেখা দেয়। ফলে গান্ধীজী মধ্যপন্থা অবলম্বন করলেন। তিনি বললেন, আপাতত ডোমিনিয়ান স্টেটাস্ রইলো আদর্শ। কিন্তু যদি এক বছরে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ডোমিনিয়ান স্টেটাস্ না দেয়, তবে এক বছর পরে পূর্ণ-স্বরাজ হবে কংগ্রেসের আদর্শ এবং সেই পূর্ণ স্বাধীনতা আনবার জন্য আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করা হবে।

সেই অনুসারে ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এবং পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছুবার উদ্দেশ্যে

আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করবার সমস্ত কর্তৃত্ব অর্পিত হ'লো গান্ধীজীর উপর।

এখান থেকে আবার বিপ্লবী প্রোগ্রাম দেখা দিলো। ১৯২৮-২৯ সালে বিপ্লবীদের চিন্তাধারা এইভাবে চলছিলো যে, এক বছর পরে পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব পাস হ'লেও সেটা বাস্তবে পরিণত করতে গেলে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজন হবে। অতএব আগে থেকেই সেই অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানকে গ'ড়ে তোলা প্রয়োজন। এই পরিকল্পনা অনুসারে বিপ্লবীদের একটা অংশ কংগ্রেসকে শক্তিশালী করবার জন্য গণ-আন্দোলনে যোগ দিলেন। তাঁরা জাতীয় জাগরণ আনবার জন্য আত্মনিয়োগ করলেন। আর-একটা অংশ সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রস্তুতির জন্য বিপ্লবী সংগঠন গ'ড়ে তুলবার কাজে সচেষ্ট রইলেন।

১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বরাজ প্রস্তাব গ্রহণ করার পর ১৯৩০ সালে শুরু হ'য়ে গেল কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন। গান্ধীজী স্বয়ং ডাণ্ডি অভিযান করলেন। বিপ্লবীরা লক্ষ্য ক'রে চললেন। তাঁরা দেখলেন যে, গান্ধীজীর আহ্বানে জনগণ ১৯২১ সালের অপেক্ষাও বিপুল শক্তি নিয়ে বহু বেশি সংখ্যায় সাড়া দিচ্ছে এবং আরো দেবে। গভর্নমেণ্টও ১৯২১ সালের অপেক্ষা অনেক বেশি অত্যাচার চালাবে আন্দোলনকে পিষে দমন করবার জন্য। সমস্ত হিংস্র শক্তি দিয়ে তারা অহিংস জনতার গলা টিপে ধরবে। সেই অত্যাচারের মুখে একতরফা মার খেতে-খেতে জাতির নৈতিক বল হয়তো ভেঙে যাবে। হয়তো সেই হিংসার পীড়নকে রোধ করবার শক্তি তারা হারিয়ে ফেলবে। সেই সময়ে যদি বিপ্লবীদের তরফ থেকে একটা প্রত্যাঘাত করার চেষ্টা হয় তবে আইন অমান্য আন্দোলন ব্যর্থ হ'লেও জাতির নৈতিক বল বাড়বে।

একদিকে ইংরেজ জানবে যে, তাদের শাসনযন্ত্রগুলির ভিত্তিমূলে সশস্ত্র আঘাত হানবার ক্ষমতা এবং স্পর্ধা রাখে দেশের একটা অংশ।

তারা দাঁড়িয়ে মরবে না, আঘাত হেনে ইংরেজশক্তিকে ভূমিকম্পে ফাটিয়ে দিয়ে তবে মরবে। অনমনীয় তারা। অন্যদিকে বিপ্লবীরা নিঃশেষে নিজেকে শেষ ক'রে দিয়ে দেশকে শেখাবে, অন্যায়কে আঘাত ক'রে নিজের প্রাণ বলি দিতে। জাতির মনে জেগে উঠবে আত্মবিশ্বাস। এই উদ্দেশ্য নিয়েই ১৯২৮ সাল থেকে বিপ্লবী আন্দোলনের যে প্রস্তুতি চলছিলো সেটাকে আরো ত্বরান্বিত করা হ'লো। আরম্ভ হ'য়ে গেল অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ এবং বোমাবারুদ তৈরির কাজ।

যুগান্তর দল এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছোটো-ছোটো কয়েকটি দল এই উদ্দেশ্য সফল করার কাজে মন দিলো। যুবকদের মনে বৈপ্লবিক চেতনা জাগিয়ে তুলবার জন্য 'স্বাধীনতা' নামে যুগান্তর দলের একখানা সাপ্তাহিক মুখপত্র প্রকাশিত হ'তে লাগলো। ওদিকে গোপনে চলতে লাগলো অস্ত্র যোগাড় ও বোমা তৈরির ব্যবস্থা।

১৯২৯ সালে চট্টগ্রামে সূর্য সেনের সঙ্গে ভূপেন দত্ত প্রভৃতির কথা ঠিক হ'য়ে যায় যে, বাংলাদেশে সমস্ত জেলাতেই একসঙ্গে বিপ্লবী সংগ্রাম শুরু হওয়া প্রয়োজন এবং তাই করা হবে।

এই সময়ে একজন বোমা তৈরিতে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে পাওয়া গেল। ইনি যুগান্তর দলেরই পুরোনো কর্মী, যতীন মুখার্জির সহচর এবং Ex-State prisoner, নাম যোগেন দে সরকার। তিনি বললেন যে, মিলিটারিতে ব্যবহৃত হয় যে টি. এন. টি বোমা তা তৈরি করা যেতে পারে। তখন পুলিসের কোপদৃষ্টিতে না-পড়া একদল কর্মী ছিলেন—রসিকলাল দাস প্রভৃতি। তাঁদের উপর এই বোমার ব্যবস্থার ভার দেওয়া হ'লো। ডাক্তার নারায়ণ রায় এই কর্মীবৃন্দেরই একজন। বোমা বিশেষজ্ঞকে এঁদের সঙ্গে যুক্ত ক'রে দেওয়া হ'লো। চলতে লাগলো বোমা তৈরির কাজ। অস্ত্র যোগাড়ও কিছু-কিছু চলছে।

প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হ'লে বাংলাদেশের সর্বত্র এবং তার বাইরেও

বিপ্লবী সংগ্রাম ছড়িয়ে দেওয়া হবে, এই ছিলো পরিকল্পনা। সেটা ছিলো ১৯৩০ সাল।

সমস্ত জেলার প্রস্তুতি সমান ছিলো না। চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা কিছু অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করতে পেরেছিলেন। তখনকার উপযোগী একটা কর্মসূচীও স্থির ক'রে ফেলেছিলেন। চট্টগ্রামের কোনো-কোনো কর্মী অধৈর্য হ'য়ে উঠেছিলেন এই ভেবে যে, এখনি কিছু করা দরকার। নইলে প্রস্তুত করতে-করতেই গ্রেপ্তার হ'য়ে যেতে হবে, শেষে আর-কিছু করা যাবে না। ১৮ এপ্রিল ইস্টার রাইজিং ডে। সেদিনই বিদ্রোহ শুরু হোক্, তাঁরা বলতে লাগলেন। ওদিকে শোনা গেল চট্টগ্রামে চল্লিশজনকে গ্রেপ্তারের আদেশ হ'য়ে গেছে। এর মূলে ছিলো একজন এজেণ্ট প্রভোকেটার। আই. বি. খুব কর্মতৎপর হ'য়ে উঠলো। এই গ্রেপ্তারের আদেশের খবর চট্টগ্রামে সূর্য সেন পেয়ে গেলেন। সূর্যবাবু তখন আর দেরি করা বা অন্যান্য জেলায় প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করা সংগত মনে করলেন না। তিনি চট্টগ্রামে ১৮ এপ্রিল বিপ্লবী সংগ্রাম শুরু করার দিন স্থির করলেন।

১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল সূর্য সেনের (মাস্টারদা) নেতৃত্বে চট্টগ্রামের পুলিস ও রেলওয়ে অস্ত্রাগার আক্রমণ ও লুণ্ঠন হ'য়ে গেল। চট্টগ্রামের বাইরের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন করবার জন্য তাঁরা রেললাইন, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন সমস্ত ধ্বংস ক'রে ফেলেন।

পুলিস-আর্মারী আক্রমণকারীদের নেতৃত্বে ছিলেন অনন্ত সিং ও গণেশ ঘোষ। রেলওয়ে-আর্মারী আক্রমণের ভার নিলেন নির্মল সেন ও লোকনাথ বল। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন ধ্বংসকারীদের নেতা ছিলেন অম্বিকা চক্রবর্তী। ধূম স্টেশনের কাছে রেললাইন উপড়ে ফেলতে গেল যে-দল তার ভার ছিলো উপেন ভট্টাচার্যের উপর। এই ছয়জনই ছিলেন সূর্য সেনের দক্ষিণ হস্ত। সূর্য সেন ছিলেন অধিনায়ক। মাত্র ষাট-সত্তর জন তরুণ বিপ্লবী নিয়ে সূর্য সেন

অদ্ভুত কর্মদক্ষতা, দুঃসাহসিকতা এবং কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়ে গেছেন। শুধু বীর শহীদ নন, এক শ্রেষ্ঠ সেনাপতির আসন পাতা আছে তাঁর জন্য।

২২ এপ্রিল ইংরেজ সৈন্য এসে বিপ্লবীদের জালালাবাদ পাহাড় ঘিরে ফেললো বিকেলের দিকে। শুরু হ'লো সম্মুখসংগ্রাম। প্রচণ্ড যুদ্ধ চলেছিলো দুই ঘণ্টাব্যাপী। পরাক্রান্ত ইংরেজসৈন্য বিপ্লবীদের গুলির মুখে টিঁকতে না পেরে পশ্চাৎ অপসরণ করতে বাধ্য হ'লো। ভারতের বিপ্লবের ইতিহাসে অমর সে-কাহিনী। বারো জন বিপ্লবী বীর সেখানে মৃত্যুশয্যা গ্রহণ করলেন। ইংরেজসৈন্যের হতাহতের সংখ্যা জানা যায়নি। নিহত বিপ্লবী শহীদদের নাম ছিলো: নরেশ রায়, ত্রিপুরা সেন, বিধু ভট্টাচার্য, হরিগোপাল বল (টেগ্‌রা), মতি কানুনগো, প্রভাস বল, শশাঙ্ক দত্ত, নির্মল লালা, জিতেন দাশগুপ্ত, মধুসূদন দত্ত, পুলিন ঘোষ, অর্ধেন্দু দস্তিদার। এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন ছাত্র।

৫ মে রাত্রে কালারপোলে ছয়জন পলাতক কিশোর ছুটে চ'লে যাচ্ছে। গ্রামবাসী ও পুলিসবাহিনী তাড়া করেছে তাদের। গুলি চললো উভয় পক্ষে। দু-জন আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার হ'য়ে গেল। বাকি চারজন একটা শন বনে অদৃশ্য হ'লো। ভোরে পুলিস তাদের ঘিরে ফেললো। আবার সংঘর্ষ। আহত কিশোর ছেলেরা রক্তমাখা মাটিতে বুক পেতে শুয়ে গুলি ছুঁড়ে চলেছে। যতক্ষণ প্রাণ ছিলো, গর্বিত সেই বীরেরা বুকের শেষ বিন্দু রক্ত দিয়ে লিখে রেখে গেল ভারতের সংগ্রামকাহিনী। নাম তাদের রজত সেন, দেবীপ্রসাদ গুপ্ত, মনোরঞ্জন সেন ও স্বদেশ রায়।

চট্টগ্রামের বিদ্রোহবহ্নি ভারতের তরুণ চিত্তে এনে দিলো একটা আত্মবিশ্বাস, একটা প্রবল আত্মচেতনা। জাতটাই যেন সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে উঠছে।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর বাংলাদেশ জুড়ে চললো একটার-পর-একটা উপর্যুপরি আঘাত ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূলে। ১৯৩০ সালের ২৫ অগস্ট তারিখে হ'লো ড্যালহাউসি স্কোয়ারে পুলিস কমিশনার টেগার্টের উপর আক্রমণ। দীনেশ মজুমদার ও অনুজা সেন ছিলেন তার অনুষ্ঠাতা। একটা বোমা ফেটে অনুজা সেন সেখানেই প্রাণত্যাগ করেন। দীনেশ মজুমদার ধরা পড়েন।

তারপর ২৯ অগস্ট ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের কাছে পুলিসের ইনস্‌পেক্টার জেনারেল মিস্টার লোম্যান ও ঢাকার পুলিস সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মিস্টার হডসন্‌কে গুলি করলেন বিনয় বোস। লোম্যান তৎক্ষণাৎ নিহত হন এবং হডসন্ গুরুতর আহত। বিনয় বোস আশ্চর্যভাবে পালিয়ে গেলেন। পরে ৮ ডিসেম্বর তারিখে দেখা গেল তাঁরই নেতৃত্বে কলকাতা রাইটার্স বিল্ডিং-এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার। আরো দু-জন বন্ধুকে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কারাগারের ইনস্‌পেক্টার জেনারেল কর্নেল সিম্পসন্‌কে গুলির আঘাতে শেষ ক'রে দিলেন তাঁরা। তারপর শ্বেতাঙ্গদের উপর গুলি চললো যতক্ষণ গুলি ছিলো। গুলি নিঃশেষ হ'য়ে গেলে পটাসিয়াম সায়নাইড খেয়ে সুধীর গুপ্ত (বাদল) নিজেকে সেখানেই লোপ ক'রে দিলেন। পাঁচ দিন পরে দলপতি বিনয় বোস হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। এই পাঁচ দিনে আহত বিনয় বোসের মাথার ক্ষত বেয়ে ঘিলু বেরিয়ে আসছিলো, পুলিসও এই কয়দিন চব্বিশ ঘণ্টা তাঁর মাথার কাছে ব'সে কথা আদায়ের জন্য মানসিক পীড়নের চূড়ান্ত করছিলো। তবুও স্বীকারোক্তির একটি কথাও পুলিস তাঁর মুখ থেকে আদায় করতে পারেনি। দীনেশ গুপ্ত হাসপাতাল থেকে আরোগ্যলাভ ক'রে ফাঁসির জন্য দিন গুনতে লাগলেন।

১ ডিসেম্বর। চট্টগ্রামের দুই বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালিপদ চক্রবর্তী চলেছেন চাঁদপুরে পুলিস ইনস্‌পেক্টার জেনারেল মিস্টার

ক্রেককে অনুসরণ ক'রে। ভোর হ'য়ে আসছে। ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরার আধো-আলোতে তাঁরা ভুল ক'রে ক্রেক সাহেবকে না-মেরে পুলিস ইনস্পেক্টার তারিণী মুখার্জিকে নিহত করলেন। ফাঁসি হ'য়ে গেল রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের। কালিপদ চক্রবর্তীর ফাঁসির যোগ্য বয়স ছিলো না। তাই তাঁর হ'লো যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

১৯৩০ সালের ডিসেম্বরে গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হয়। সেই সময়ে কারারুদ্ধ বিপ্লবী নেতারা এই চুক্তি মেনে নেবার সিদ্ধান্ত করলেন এবং সহিংস আন্দোলন বন্ধ রাখতে নির্দেশ দিলেন। ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, ভূপতি মজুমদার এবং অরুণ-চন্দ্র গুহ এই চারজন বন্দী নেতা বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে চিঠি লিখলেন গান্ধীজী, জওহরলাল এবং তেজবাহাদুর সপ্রুকে। তাতে তাঁরা লিখলেন যে, চুক্তির শর্তের মধ্যে যেন বিপ্লবীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পাঞ্জাবের ভগৎ সিং, রাজগুরু, শুকদেব এবং চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের অর্থাৎ অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ প্রভৃতি কাউকে যেন ফাঁসি দেওয়া না হয়। দিলে দেশে শান্তি আসবে না। বরং উল্টো ফল হবে। তেজবাহাদুর সপ্রু এই চিঠি নিয়ে ভাইস্‌রয়ের সঙ্গে দেখা করেন। ভাইস্‌রয় বললেন, 'ভেবে দেখছি।' গান্ধীজী এই ইচ্ছা ও আশা ঘোষণা করলেন যে, দেশবাসী যদি চুক্তি মেনে নেয় তবে তাঁদের ফাঁসি হবে না এবং বিপ্লবীরাও মুক্তি পাবেন। সহিংস আন্দোলন বন্ধ রইলো কিন্তু গান্ধীজীর ইচ্ছা পূর্ণ হ'লো না। ১৯৩১ সালের করাচী কংগ্রেসের পূর্বেই মার্চ মাসের শেষভাগে ভগৎ সিং, শুকদেব এবং রাজগুরুর ফাঁসি হ'য়ে গেল। যুগান্তর এবং নওজোয়ান দল আবার আঘাত হানবার সংকল্প করলো। নতুন অধ্যায় শুরু হ'য়ে গেল।

১৯৩১ সালের এপ্রিল মাসে মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পেডি সাহেবকে নিহত করলেন বিমল দাশগুপ্ত। পেডি, ডগলাস, বার্জ, পর-পর তিনজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে মেদিনীপুরে নিহত করা

হয়। ডগলাসের হত্যার জন্য ফাঁসির আদেশ হয় প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের। বার্জ-হত্যার ষড়যন্ত্রের মামলায় ফাঁসি হয় নির্মলজীবন ঘোষ, রামকৃষ্ণ রায় এবং ব্রজকিশোর চক্রবর্তীর। খেলার মাঠে বার্জকে গুলি করার সময় মৃগাঙ্ক দত্ত ও অনাথবন্ধু পাঁজা দেহরক্ষীর গুলিতে নিহত হন। এ ছাড়া বহুলোকের দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড হয়।

১৯৩১ সালের ২৭ জুলাই তারিখে বিচারক গার্লিক-সাহেব বিচারকক্ষে ব'সে বিচার করছেন। বহু বিপ্লবীর দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড ও ফাঁসির হুকুম উচ্চারিত হয়েছে এই বিচারকের মুখ থেকেই। সেদিন এক যুবক হঠাৎ এসে বিচারে আসীন গার্লিক-সাহেবকে সর্বসমক্ষে গুলি ক'রে তাঁর বিচার করা চিরদিনের মতো বন্ধ ক'রে দিলেন। নিজেও তৎক্ষণাৎ পটাসিয়াম সায়নাইড খেয়ে ইহজগত থেকে বিলুপ্ত হ'য়ে গেলেন। পুলিস শত চেষ্টা ক'রেও তিন বছরের ভিতর জানতে পারেনি, এই দুর্ধর্ষ অদ্ভুত ছেলেটি কে? নাম ছিলো তাঁর কানাই ভট্টাচার্য। চব্বিশ পরগণা জেলার জয়নগর-মজিলপুর গ্রামে তাঁর বাড়ি। অবাধ্য, বাড়ির অবহেলিত এই ছেলেটির কেউ খোঁজও রাখতেন না। তাতেই হ'য়ে গেল শাপে বর। তাঁর মৃত্যুর পরেও বহুদিন পর্যন্ত সে-খবর তাঁর বাড়ির লোকেরা জানতে পারেননি, কাজেই তাঁরা ব্যস্তও হননি। তাই পুলিসেরও অসম্ভব হয়েছিলো এই রহস্যময় বিপ্লবীকে খুঁজে বের করা।

সেপ্টেম্বর মাসে হিজলী বন্দীশালার সিপাইসান্ত্রীরা নিরস্ত্র রাজবন্দীদের উপর হঠাৎ গুলি চালালো। সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেন নিহত হ'লেন। অনেক বন্দীও আহত হ'লেন সেই সঙ্গে।

১৯৩১ সালের ২৪ ডিসেম্বর। কুমিল্লার অত্যাচারী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্স-সাহেবের বাংলোতে স্কুলের দু'টি ছাত্রী একখানা দরখাস্ত নিয়ে এসে উপস্থিত। ম্যাজিস্ট্রেট যখন দরখাস্ত পাঠ করছেন

তখন ছাত্রী দু'টি, শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী সেই ম্যাজিস্ট্রেটের অত্যাচারের প্রতিবাদের মূর্তি ধ'রে তাঁকে লক্ষ্য ক'রে গুলি চালালেন। স্টিভেন্স নিহত হ'লেন। শান্তি সুনীতির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হ'য়ে গেল। সমগ্র দেশ বিস্মিত নেত্রে এই ছোটো দুটো অগ্নিপিণ্ডের দিকে তাকিয়ে রইলো, এ-ও সম্ভব!

১৯৩২ সালের ৬ ডিসেম্বর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন-সভা চলেছে। গভর্নর জ্যাকসন্ অভিভাষণ পাঠ করছেন। বীণা দাস পিস্তল হাতে এগিয়ে গেলেন উদ্ধত রাজশক্তির পায়ের তলার মাটিতে ফাটল ধরাতে। দেশবাসী চমকে উঠলো, ইংরেজ ভ্রূকুঞ্চিত নেত্রে হুঁশিয়ার হ'য়ে উঠলো।

একের-পর-এক আঘাত পড়তে লাগলো। ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডুর্নোকে আহত করলেন সরোজ গুহ ও রমেন ভৌমিক। পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট গ্রাস্‌বিকে আঘাত করেন বিনয় বোস (দু-নম্বর) ও বঙ্গেশ্বর রায়। কুমিল্লার সহকারী পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এলিসন্‌কে হত্যা করেছিলেন শৈলেশ রায়। কলকাতায় ইউরোপীয়ান অ্যাসোসিয়েশানের সভাপতি ভিলিয়ার্সকে আক্রমণ করেন লোম্যান-হত্যাকারী বিনয় বোস। আঘাত পড়েছিলো ময়মনসিংহের ডিভিশনাল কমিশনার ক্যাসেল-সাহেবের উপরও।

স্টেট্‌সম্যান-সম্পাদক ওয়াটসনের উপর দু-বার আক্রমণ চলে। প্রথমবার অকৃতকার্য হ'য়ে অতুল সেন পটাসিয়াম সায়নাইড খেয়ে মৃত্যুবরণ করেন। দ্বিতীয়বার ওই একই কারণে অনিল ভাদুড়ি এবং মণি লাহিড়িও পটাসিয়াম খেয়ে শেষ হ'য়ে যান।

১৯৩৪ সালে বিপ্লবী কর্মধারা শেষপ্রান্তে আসে। শেষ আঘাত হানা হ'লো গভর্নর অ্যাণ্ডারসনের উপর। দার্জিলিং-এ লেবং পাহাড়ে ঘোড়দৌড়ের মাঠে ছিলেন গভর্নর অ্যাণ্ডারসন। এই সম্পর্কে ধরা পড়েন ভবানী ভট্টাচার্য, উজ্জ্বলা মজুমদার, রবীন ব্যানার্জি প্রভৃতি

ছয়জন। ভবানী ভট্টাচার্যের ফাঁসি হ'য়ে গেল। অন্যদের দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড।

বাংলার নানা কেন্দ্রে যখন বিপ্লবী তরঙ্গ একটার-পর-একটা ফেনিয়ে উঠে এগিয়ে আসছে তখন চট্টগ্রামের পলাতক বিপ্লবীরা সূর্য সেনের নেতৃত্বে আরো দুর্দম হ'য়ে উঠলেন।

১৯৩১ সালের জুন মাসের শেষে চট্টগ্রাম জেলের প্রাঙ্গন খুঁড়তে হঠাৎ বেরিয়ে পড়লো আগ্নেয়াস্ত্র, ছোরা, তলোয়ার, প্রচুর বিস্ফোরক দ্রব্য, বৈদ্যুতিক তার এবং প্রায় আধমণ মারাত্মক বারুদ। পুলিস, মিলিটারি, গোয়েন্দা প্রভৃতি সমস্ত সতর্ক পাহারার চোখে ধূলি দিয়ে কেমন ক'রে যে এই বিরাট আয়োজন সম্ভব হয়েছিলো তা জানেন সেই তীক্ষ্ণধী, কর্মকুশল মাস্টারদা এবং ওই অদ্ভুত কর্মীদল।

আসানুল্লা ছিলো চট্টগ্রামের গোয়েন্দা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত। নির্যাতন করার জন্য অত্যন্ত দুর্নাম ছিলো তার। ১৯৩১ সালের ৩০ অক্টোবর চোদ্দ-পনেরো বছরের কিশোর বালক হরিপদ ভট্টাচার্য খেলার মাঠে তাকে রিভলভার দিয়ে গুলি ক'রে বসলো। চির-কালের মতো তার স্বদেশীদের উপর নিপীড়ন করা বন্ধ হ'য়ে গেল। তারপর গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে চললো হরিপদকে। বালকের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালালো, সূর্য সেন, নির্মল সেনের ঠিকানা পাবার জন্য। গ্রামকে শিক্ষা দেবার জন্য চার শত পুলিস ও মিলিটারি এই নির্ভীক বালককে পুরোভাগে রেখে গ্রামে-গ্রামান্তরে টহল দিয়ে ফিরতে লাগলো। তারা জনতার সামনে হরিপদকে বেদম প্রহার করতে থাকে এবং আদেশ করে, 'বল, ইংরেজের জয় হোক, সূর্য সেনের দলের ক্ষয় হোক।' হরিপদ কিশোর কণ্ঠে হেঁকে ওঠে, 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস হোক, মাস্টারদার জয় হোক।' সঙ্গে-সঙ্গে প্রহার ও সঙ্গীনের খোঁচায় বালকের চোখের কোণ বেয়ে রক্তধারা ব'য়ে যায়। শত আঘাতে জর্জরিত হ'য়ে মুখচোখ ফুলে উঠেছে তার।

গ্রামবাসী এই দৃশ্য দেখে শিউরে ওঠে, ভয় পায়। তবু মাস্টারদার কর্মপ্রেরণা চট্টগ্রামের শিরায়-শিরায় ব'য়ে চলে।

ধলঘাটে চারজন পলাতক বিপ্লবী আছেন এক বাড়িতে। সূর্য সেন, নির্মল সেন, অপূর্ব সেন ও প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দার। ১৯৩২ সালের ১৩ জুন পুলিস ঘেরাও করলো সেই বাড়িটি। ক্যাপ্টেন ক্যামেরন মই বেয়ে উপরে উঠছিলো। নির্মল সেনের গুলিতে তার ইহলীলা সাঙ্গ হ'য়ে গেল। চললো দুই পক্ষে গুলি বিনিময়। বীর সৈনিক নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন সংগ্রামে আত্মাহুতি দিয়ে গেলেন। সূর্য সেন প্রীতিলতাকে নিয়ে পুলিসের ব্যূহ ভেদ ক'রে পালিয়ে গেলেন।

১৯৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর রাত্রি প্রায় দশটায় প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দারের নেত্রীত্বে পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রান্ত হ'লো। ক্লাবঘরখানা তখন প্রায় চল্লিশ জন শ্বেতাঙ্গ নরনারীর নৃত্য-গীতে মুখর। Whist drive খেলা চলছে। প্রীতিলতা সঙ্গীদের নিয়ে অলক্ষ্যে ঢুকে পড়েছেন সেই ঘরে। তাঁর আদেশে বোমা ও রিভলভার ছুটলো অজস্র। ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার হ'য়ে গেল। ভীত সন্ত্রস্ত শ্বেতাঙ্গ নরনারী ইতস্তত ছুটোছুটি করতে লাগলো। ক্লাবঘরের দুই দিক থেকে প্রায় আধঘণ্টা যাবত আক্রমণ চললো। সফলকাম প্রীতিলতা বন্ধুদের স্থানত্যাগ করতে নির্দেশ দিয়ে নিজে পটাসিয়াম সায়নাইড খেয়ে প্রাণ দিলেন। মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ নারী তিনি।

নেতা সূর্য সেন তখন গৈরালাতে পলাতক। সঙ্গে আছেন তারকেশ্বর দস্তিদার, কল্পনা দত্ত ও অন্যরা। একদিন রাত্রে পুলিস ঘিরে ফেললো সেই বাড়ি। টের পেয়ে অন্ধকারে বাড়ি ছেড়ে সবাই বেরিয়ে এলেন। বালক ব্রজেন সেন এখানে এঁদের দেখাশোনা করতো। ব্রজেন আগে-আগে চলেছে। সে ইশারা করাতে সঙ্গে-সঙ্গেই তারকেশ্বর বুঝতে পারেন যে, সামনেই রয়েছে পুলিস। তারকেশ্বর ও কল্পনা তখন বাঁ-দিকে পুকুরের মধ্যে নেমে পড়েন। পুলিস টের

পেলো না, ওঁরা পালিয়ে গেলেন। ওদিকে শিকারের সন্ধানে পুলিস তখন একটা লাইট বম্ব্ ছুঁড়ে চারিদিক হঠাৎ আলো ক'রে দিলো। সূর্য সেন তখন একটা আমগাছের নিচে বেতকাঁটার ঝোপে আটকে গেছেন এবং ছাড়াতে চেষ্টা করছেন। পুলিস সেই অবস্থায় তাঁকে দেখে ফেললো। তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার হ'য়ে গেলেন তিনি।

তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্ত গ্রেপ্তার হন তার আড়াই মাস পরে গহিরায়। শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী আঘাত হানতে-হানতে সূর্য সেন গ্রেপ্তার হ'লেন। তারপর ১২ জানুয়ারি (১৯৩৩ সাল) ইংরেজের ফাঁসির রজ্জুতে সর্বাধিনায়ক মাস্টারদার মহাজীবন অমর হ'য়ে রইলো। সেদিন তাঁর ফাঁসির সঙ্গী ছিলেন তাঁরই অনুগত কর্মী তারকেশ্বর দস্তিদার।

তখনও মাস্টারদার ফাঁসি হ'তে কয়েকদিন বাকি আছে। এই ফাঁসির প্রতিবাদ জানাতে এগিয়ে গেল চারজন কিশোর শ্বেতাঙ্গদের ক্রিকেট খেলার পল্টন মাঠে। তারিখটা ছিলো ৭ জানুয়ারি, ১৯৩৩। কিশোরদের হাতের অগ্নিগর্ভ অস্ত্র গর্জন ক'রে উঠলো, শুরু হ'লো সংঘর্ষ। সেইখানেই প্রাণ দিলো নিত্যগোপাল ভট্টাচার্য এবং হিমাংশু ভট্টাচার্য। ফাঁসির হুকুম হ'য়ে গেল কৃষ্ণ চৌধুরী ও হরেন চক্রবর্তীর।

১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত চার বৎসর ব্যাপী বিপ্লবীদের যে-সংগ্রাম চলেছিলো, অন্য কোনো দেশে তার তুলনা নেই। জেগেছিলো সমস্ত দেশে নতুন প্রেরণা এবং নতুন প্রতিবাদের ভাষা। এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছুটে মরছিলো আকাশে বাতাসে। উদ্বুদ্ধ দেশ, জাগ্রত তার চেতনা। সার্থক হয়েছিলো সেদিন বিপ্লবীদের আত্মবলির সাধনা। তাঁরা নিজেরা নিঃশেষে অবলুপ্ত হ'য়ে দেশকে দিয়ে গেলেন মৃত্যুর সম্পদ। মুষ্টিমেয় বীরের চরম আত্মত্যাগ দেশকে যতখানি জাগ্রত করতে পারে সে-সফলতা এনে দিয়েছিলেন বিপ্লবীরা।

॥ তেরো ॥

এবার ফিরে যাই সেই জেল-জীবনে। ১৯৩২ সালের ১ মার্চ তারিখে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গেল আমাকে প্রেসিডেন্সি জেলে। প্রথম কিছুদিন বেশ কাটলো। রোজই আসে কংগ্রেসের আইন-অমান্য-কারী বন্দী মেয়েরা। উন্মাদনাময় তাদের ব্রিটিশবিরোধী কর্মকাণ্ড, ততোধিক উৎসাহদীপ্ত তাদের গ্রেপ্তারকাহিনীর বর্ণনা। তাদের মুখে শুনি বাইরের জগতের কোলাহলমুখরিত বিপুল ধ্বনি। ডেটিনিউ মেয়ে আমরা মাত্র দু-তিন জন, বাকি প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন আইন-অমান্যকারী বন্দী। ছোট্টো ফিমেল-ইয়ার্ড, অত লোক রাখবার জায়গা কোথায়? আমরা ডেটিনিউ মেয়েরা একটা সেলে সন্ধ্যায় লক-আপ হ'তাম। আইন-অমান্যকারী মেয়েরা সেলে, ওয়ার্ডে, বারান্দায় সর্বত্র ঠাসাঠাসি হ'য়ে রাত কাটাতো।

ওদেরই মধ্যে ছিলো একটি মুসলমান মেয়ে। বয়স ষোলো-সতেরো বছর মাত্র। খুব ভাব হ'য়ে গেল তার সঙ্গে। আমি আশ্চর্য হ'য়ে যাই তাকে দেখে। সে আমার সঙ্গে 'মেঘনাদ বধ কাব্য' পড়ে। মাইকেলের অমর লেখনী যেন এই মুসলমান মেয়েটির জন্যই শুধু দুঃখ ঝরিয়েছিলো, অমৃত ক্ষরিয়েছিলো। বঙ্কিম-সাহিত্য কিন্তু তাকে আঘাত দিতো। বঙ্কিমচন্দ্র নাকি অযথা মুসলমানদের ছোটো ক'রে মুসলিম-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করেছেন। বিশ্লেষণ করে সে আনন্দমঠ, দুর্গেশনন্দিনী। ব'লে যায় স্পেনের ইতিহাস। মুসলমানদের নিঃশেষে সেখান থেকে একদিন তাড়ানো হয়েছিলো, তাই অনেক মুসলমান মনে করে, তেমনি আশঙ্কা নাকি আছে ভারতবর্ষেও। কংগ্রেসকে সে ভালোবাসে প্রাণ ঢেলে। বিদেশী শাসনের জ্বালা সে অনুভব করে মর্মে-মর্মে। তার আকাঙ্ক্ষা জাতীয় স্বাধীনতা আনতে গিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে মিলিয়ে দেবে নিজের কর্মক্ষমতাটুকু, কোথাও কার্পণ্য নেই, দ্বিধা নেই, সংকীর্ণতা নেই,

সাম্প্রদায়কতার লেশমাত্র নেই। হিন্দু বা মুসলমান এই পার্থক্য জাতীয় জীবনে, সংগ্রামের জীবনে, কোথাও তো তার মনে রেখাপাত করেনি। নিজের জীবনকথা বলতে গিয়ে বলে, রোজ রাত্রে শোবার আগে খোদার কাছে বাংলাভাষায় নিজের মনের প্রার্থনা জানায়, খোদা নিশ্চয় তার কথা শুনতে পান।

একদিন হুকুম আসে ওরা বহরমপুরে চালান যাবে। সকাল থেকেই সেদিন সে আমার সেল সাজিয়ে দিচ্ছে, টেবিল গুছিয়ে রাখছে, চুল বেঁধে দিচ্ছে, খাইয়ে দিচ্ছে, কিছুতেই আজ যেন তার কাজ শেষ হয় না। ভুলতে পারি না তাকে আজও।

চ'লে গেল আইন-অমান্যকারী বন্দীরা দলে-দলে। কেউ-কেউ ওরা দারুণ হাসতো আর হাসাতো। কেউ সারাদিন অজস্র গান গেয়ে জেলখানা মাতিয়ে রাখতো, কেউ চিৎকার ক'রে ফাটিয়ে দিতো। কার কতো গায়ের জোর আর পায়ের জোর, তার পরীক্ষা করতো কসরত চালিয়ে ওদেরই মধ্যে কয়েকজন। চ'লে গেছেন লাবণ্য মাসীমাও (লাবণ্যপ্রভা দত্ত), পরিপূর্ণ মাতৃমূর্তি ছিলেন তিনি। আমাদের উপর ছিলো তাঁর অগাধ স্নেহ। হয়তো মেয়ে শোভার (শোভারানী দত্ত) কথা মনে পড়তো তাঁর আমাদের দেখে। আমার কতো কঠিন আবদার যে তিনি নিজেকে বিপন্ন ক'রেও রক্ষা করেছেন, সে শুধু অগাধ মাতৃস্নেহই সম্ভব করতে পারে। হৈ-হৈ ক'রে কেটে গেছে দু'টো মাস। আজ সব শান্ত। উদাস মনে দুই ডেটিনিউ প'ড়ে আছি দুই কোণে। অবশেষে আদেশ এলো আমাদেরো হিজলীতে চালান যাবার। মালপত্র বেঁধে গুছিয়ে তৈরি হবার মধ্যে একটা উন্মাদনা আছে। আইন-অমান্যকারী বন্দীরা আমাদের ফেলে রেখে গেছেন। আমরাও ফেলে রেখে যাচ্ছি সাধারণ কয়েদীদের। বিদায় নেবার সময় তারা সারি-সারি কাছে এসে দাঁড়ায় সজল চোখে। বলে, 'আবার এসো দিদিমণি।'

কী করুণ, কী গভীর দুঃখের সেই চাহনি! কখন যে এরা এত ভালোবেসেছে, কখন যে আপন হ'য়ে গেছি কে জানে! আমরা যেন তাদের দুঃখহরণ, ঠিক এমনি দৃষ্টিতে আমাদের বিদায় দেয়।

॥ চোদ্দ ॥

হিজলী জেল। মস্ত বড়ো তার প্রাঙ্গণ, প্রকাণ্ড তার ওয়ার্ড। এতখানি জায়গা, এতটা আলোবাতাসের উদারতা হিজলীতে অপেক্ষা করছে। মনটা যেন নেচে উঠছিলো। বিরাট উঁচু দেয়ালটার ও-পিঠ থেকে কি একটা গাছ একটু মাথা বাড়িয়ে উঁকি মেরে যেন লুকোচুরি খেলছে। অদূরে ক্যাম্পে আছেন ডেটিনিউ ছেলেরা। ওই ক্যাম্পের চূড়াটুকু দেখা যাচ্ছে। সন্ধ্যাবেলায় ওই চূড়ার পিছনে যখন সূর্য অস্ত যায়, হিজলীর বিরাট পশ্চিম আকাশ যেন সহস্র রঙে স্নান করতে থাকে, কেড়ে নেয় বন্দীদের হৃদয়, হারিয়ে যায় শত দুঃখ-লাঞ্ছনা। সেই আকাশ কতো যে লোভনীয়, কী যে মনভোলানো তা বর্ণনার ভাষা নেই। এই একটি প্রিয়বস্তুর আকর্ষণ জেল-জীবনে মস্ত অবলম্বন। হিজলীর আকাশের সঙ্গে যেন ব'সে-ব'সে মনের কথা কওয়া যায়, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যায়। বন্দী-জীবনের সমস্যাও যেন লেখা আছে আকাশের গায়ে, ফুটে আছে তার সমাধানও, শুধু প'ড়ে নিতে হয় আপন-মনে। সে-আকাশ পরম বন্ধুর মতো ভালোবাসে, মায়ের মতো সজল নয়নে স্নেহভরে তাকিয়ে থাকে, পিতার মতো সমস্ত দুশ্চিন্তা আপনি হেসে বহন করে। সন্ধ্যার সেই আকাশ বন্দীদের ডেকে ফিরতো জেলের ওপারে তার সঙ্গে অমনি ক'রে সহস্র মাতনের খেলায় নেমে পড়তে। অমনিতরো 'সোনালী, রুপালী, সবুজে, সুনীলে' গ'লে গিয়ে আজও কি হিজলীর সন্ধ্যা সেই পুরানো বন্দীদের ডাকে? হয়তো ডাকে না। হয়তো শুধু বলে, 'কূল মিলেছে, আমি তো আর নাই।'

হিজলীতে এসে শুরু হ'য়ে গেল সত্যকার বন্দীজীবন। অল্প মেয়ে, সবাই ডেটিনিউ। অদ্ভুত এই ডেটিনিউ-জীবন! জিনিসপত্রের অভাব নেই, খাবার কষ্ট নেই, তবুও কেমন যেন বদ্ধ জল, রুদ্ধ বাতাস। স্রোতহীন, আবর্তহীন জগত— একেবারে অপরিচিত

একঘেয়ে। এমন কর্মহীন জীবন যে শাস্তি দেবার জন্য কোথাও সংসারে কেউ সাজিয়ে রাখতে পারে সে-কথা কে জানতো! জীবন থেকে বছরগুলি যেন কেটে বাদ দেওয়া র'য়ে গেছে। নিষ্কর্ম জীবনের দুর্বহ মুহূর্তগুলি মনের উপর, স্নায়ুর উপর ক্রমাগত পীড়া দিতে থাকে। বাইরে কর্মক্লান্ত জীবনে একটু বিরতি, একটু বিশ্রাম যেন পরম সুখের। কিন্তু জেলে একঘেয়ে কর্মহীন জীবন যেন অবিরাম শুয়ে ঘুমিয়ে থেকেও ক্লান্ত। যদি কখনো একটু চঞ্চলতা, একটু পরিবর্তন বা চমকপ্রদ খবর আসে তবে সেই দিনটা যেন ঝলমলিয়ে হেসে ওঠে। যেন গ্রহনক্ষত্র থেকে কোনো সংবাদ আসছে, আমরা পাচ্ছি তারই আভাস। এমন কি যদি কেউ অন্য জেলে চালানও যায় তখন সেই পরিবর্তনটুকুরও আনন্দে তারা আত্মহারা হ'য়ে ওঠে। ট্রেনে ওঠা, চলন্ত জগতকে চোখের সামনে কিছুক্ষণের জন্য দেখা, জীবন্ত মানুষের হাসিরাশি নিজের প্রাণে অনুভব করা, এ যেন বন্দীর চন্দ্রতারালুপ্ত জীবনে ঘনতমিস্রার মধ্যে বিদ্যুৎঝলক। এই হাসিটুকু, এই প্রাণের স্পর্শটুকু বন্দী সর্বদেহমন দিয়ে গ্রহণ করে। অবশ্য যারা জেলে বছরের-পর-বছর কাটায় তাদেরই কথা বলছি।

খবরের কাগজ আসতো স্টেট্‌সম্যান এবং সাপ্তাহিক সঞ্জীবনী। তাও আবার রাজনৈতিক খবরগুলি থাকতো কালি দিয়ে লেপা। অন্য খবরও অতদূরে পৌঁছানো শক্ত ছিলো। সেখানে সঙ্গী শুধু বই আর মানুষ। বই-ই একমাত্র অনাবিল আনন্দ আনে, সময় কিছুটা কাটে। তাও সেন্সারের কড়াকড়ি। তবুও মনে হয়, যা-কিছু বই পড়েছি তা ওই জেলখানায়। সবটা সময় কিন্তু তাতে কাটতে চায় না।

যাঁরা সেখানে তখন ছিলেন তাঁরা অধিকাংশই আমার জানা, যদিও চাক্ষুষ পরিচয় ছিলো না সবার সঙ্গে। বাইরে থাকতে বিপ্লবীদের যা দেখেছি, যা জেনেছি তাতে তাঁদের মহত্ত্ব, মনুষ্যত্ব,

আত্মত্যাগ আমাকে মুগ্ধ করতো। মানুষের সম্বন্ধে সেই মুগ্ধ হওয়া মন নিয়ে জেলে ঢুকেছিলাম। কিন্তু হিজলী জেল সেই মনকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে দিয়েছে। মানুষ যে কতো মহৎ হ'তে পারে তা যেমন বাইরের জীবনে জেনেছি, তেমনি মানুষ যে কতো নিচে নেমে যেতে পারে, কতো মলিন হ'তে পারে তাও জেলে গিয়েই দেখেছি। অথচ হয়তো একই মানুষের এই দু'টো রূপই সত্য। তারই মধ্যে দিন কাটে।

একদিন এলো শান্তিনিকেতনের আর্টিস্ট-মেয়ে ইন্দুসুধা ঘোষ। সে-মেয়ে নেচে চলে না, গান গেয়ে কথা কয় না, সেজেগুজে দুলে-দুলে যায় না, একেবারে আমাদেরই মতো সাধারণ সাদাসিধে মেয়ে। ছবি আঁকার আমি কি বুঝি? তবু ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা ইন্দু ব'সে ছবি আঁকছে, আর তন্ময় হ'য়ে আমার মতো হাবা রসজ্ঞ তাই দেখছে। হিজলীর আকাশ, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির বই এবং ইন্দুর ছবি ভাগ্যে ছিলো জেলখানায়, নইলে সেই পাহাড়ের মতো ভারী দিন-গুলো কাটতো কি ক'রে? শুধু ছবি-আঁকার শিল্পী সে নয়, রসসৃষ্টি করাই ছিলো তার কাজ। ফুলের বাগান সে-ই করলে। রজনীগন্ধার একটি ফুল যদি ফুটতো, আমরা তাই নিয়েই আত্মহারা। বেলফুল, মধুমালতী, আরো কতো ফুল ফোটে তার বাগানে, আমরা তারই চারধারে মধুমক্ষিকার মতো ঘুরে বেড়াতাম, একটু মিষ্টি গন্ধের লোভে।

ইন্দুর ময়দা আর রং দিয়ে সাপ বানিয়ে বন্দীদের এপ্রিল ফূল করবার কাহিনী অনেকেই লিখেছেন। তার এপ্রিল ফূল করবার আর-একটা গল্প বলি :

ন্যাকড়া ছোটো-ছোটো টুকরো ক'রে সে কেটেছে, তারপর ময়দা ঘন ক'রে গুলে তাতে ন্যাকড়াগুলো ডুবিয়ে রেখেছে। দেখতে ঠিক রাবড়ির মতো। একটা প্লেটে চমৎকার ক'রে রাবড়ি সাজিয়ে এনে

আমার মুখের কাছে ধরেছে। নিজেই চামচ দিয়ে আদর ক'রে খাইয়ে দিচ্ছে। আদরটুকু মুখে নিয়েই বুঝি এপ্রিল ফ্ল। নিজে ফ্ল হ'য়ে অন্যকে কি জানানো যায়? মুখ আপনি বন্ধ হ'য়ে গেছে। একের-পর-এক বন্ধুকে ইন্দু রাবড়ি খাওয়ায় আর 'ওয়াক্ থুঃ, ওয়াক্ থুঃ!' এবারে আমি খুব হাসি।

একদিন খবর আসে মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেল থেকে আমাদের হিজলী জেলে আসবে বীণা দাস, শান্তি ঘোষ। আমাদের মনের রং গেল বদ্‌লে।

সেটা ছিলো ১৯৩৩ সালের মে মাস বোধ হয়। হঠাৎ গেটে পড়লো ধাক্কা, ছুটলো জমাদারনী। গেট খুলে ধরতেই ভিতরে এলো দুই বন্দিনী। রূপে, গুণে শতদল বিকশিত তারা, দুর্লভ মণি জেল-খানায়। ওদের রাখলো আর-একটা ওয়ার্ডে। দিনের বেলায় মিশতে বাধা নেই। শুধু সন্ধ্যায় ওদের আলাদা লক-আপ করে। তখন মেশা নিষেধ। বীণার ছিলো কবি-মন, শান্তি চমৎকার গান গাইতো। লক-আপের পর দূর থেকে শুনতাম শান্তি একটার-পর-একটা কতো গানই গাইছে। কখনো সাধতে হ'তো না।

শান্তির মধ্যে ছিলো অফুরন্ত প্রাণ। একদিন গেটের কাছে গিয়ে একটা 'সঞ্জীবনী' হাতে শান্তি প্রাণপণে চিৎকার করছে, 'মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট নিহত হয়েছে।' মেয়েরা ছুটে গিয়ে 'সঞ্জীবনী' কেড়ে নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁজতে লাগলো সেই খবর। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট-হত্যার বিবরণ অলি-গলি, বিজ্ঞাপন খুঁজেও পাওয়া গেল না। যখন সবাই তাকে জিগ্যেস করছে, কোথায় হত্যার খবর? মিথ্যাবাদী রাখাল তখন দূরে দাঁড়িয়ে খিলখিল ক'রে হাসছে।

আর-একদিন ভাত খেতে ব'সে শান্তি বললে, 'কমলাদি, কাল রাতে কেমন ঘুমিয়েছো?'

'কেন? ভালোই তো।'

'ভালো? তোমার বালিশের মধ্যে তেলাপোকা ফড়্ফড় করেনি?'

'ও বাবা! কী সর্বনাশ! সে কি কথা?'

'দেখে এসো তোমার বালিশ।'

উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম নিজের ওয়ার্ডে। শান্তির অসাধ্য কাজ নেই। কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেটকে যে-মেয়ে গুলি ক'রে নিহত করেছে, আমার মতো প্রাণীকে তেলাপোকার সাহায্যে হত্যা করা তার পক্ষে আশ্চর্য নয়। বালিশের ওয়াড় খুলে দেখি, উঃ, তেলাপোকাটা ম'রে চ্যাপ্টা হ'য়ে আছে! আর আমারই মাথাটা তেলাপোকাটাকে সারারাত ধ'রে চ্যাপ্টা ক'রে পিষে মেরেছে! দেখে আমার শরীরটা শিরশির করতে লাগলো। ফিরে গিয়ে শান্তিকে বলি, 'এ করেছো কী?' শান্তি তার মুখ চেপে ঠোঁট কাঁপিয়ে-কাঁপিয়ে হাসছে। বললে, 'আর ভয় পাবে তেলাপোকা?'

বীণা ও শান্তির কাছ থেকে আসে নতুন হাওয়া। তা ছাড়া, বীণা ছিলো কবি এবং সাহিত্যিক। যখন মনটা ভারি হ'য়ে আসে ওর কাছে গেলে কতো রকমের আলোচনা করে। মনটা যেন নতুন ছোঁওয়া পায়। ভারি মনটা কথায়-কথায় কখন ক্ষ'য়ে হালকা হ'য়ে গেছে। জেলখানাটা ছিলো মরুভূমি, তার মধ্যে বীণা আর শান্তি ছিলো ওয়েসিস্। ওইখানে যেন একটা ইন্টেলেক্চুয়াল হাওয়া বইতো, তার ছিলো চুম্বকের মতো আকর্ষণ। ওদের সঙ্গে গল্প করতে, তাস খেলতে, খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে বই নিয়ে আলোচনা করতে এত ভালো লাগতো যে, ওরা না থাকলে হিজলী জেল সাহারা মরুভূমি হ'য়ে যেতো, অন্তত আমার কাছে।

তবুও বীণাকে দেখি কেমন মলিন বিষণ্ণ মুখ। কথায়-কথায় একদিন বীণা বললে, 'কমলাদি, তোমার কাছে মুখ দেখাতে আমার সব চেয়ে লজ্জা। কিন্তু ওরা তোমার কাছেই আমায় নিয়ে এলো।'

'এমন কথা কেন বলো, ভাই ?'

'তুমি তো আমাকে বিশ্বাস ক'রেই দিয়েছিলে, আমি তো তোমার বিশ্বাস রাখতে পারিনি।'

'কে বললে বিশ্বাস রাখতে পারোনি ? বাইরেটা তো দেখোনি তুমি ? আমরা যে দেখে এসেছি। গভর্নরের মৃত্যুটাই তো বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা হচ্ছে, গভর্নমেণ্টের ভিত্তি কতোখানি কেঁপে উঠেছে, বড়ো কথা হচ্ছে আমাদের অ্যাকশানের এফেক্ট। তাঁর মৃত্যুতে এর চেয়ে এমন কী বেশি হ'তো ? এমন ক'রে কেন ভাবো, মন্নু ?'

'আমাকে স্তোকবাক্য বোলো না, ভাই।'

'আমি স্তোকবাক্য সত্যিই বলছি না তোমায়। সত্যি-সত্যি যা ঘটেছে তাই বলছি। তুমি আমাকে বিশ্বাস করো।'

'যদি এর কিছু ভালো হ'য়ে থাকে তা সব তোমার, আর এর যা-কিছু মন্দ সব আমার।'

এই কথাগুলো বলতে-বলতে বীণা কতো যে ম্রিয়মাণ হ'য়ে পড়তো, কতো যে গভীর দুঃখ বহন করতো তা আমি সারা মনে-প্রাণে অনুভব করেছি। তবু তার দুঃখ আমি ঘোচাতে পারিনি।

কল্যাণী আমাদের সঙ্গে আগে বিপ্লবীদলে যোগ না দিলেও পরে যখন আইন-অমান্য-করার জেল-জীবন থেকে মুক্তি পেয়েছিলো তখন বাইরে গিয়ে দীনেশ মজুমদারের সঙ্গে যোগ দিলো। ফলে সে-ও এলো হিজলীতে ডেটিনিউ হ'য়ে।

কল্যাণীর একটা প্রাণপণ চেষ্টা ছিলো বীণাকে এবং জেল-খানাকে আনন্দ দিতে। নাটক করানো, খেলাধুলোয় নামানো, আরো অনেক-কিছুর মধ্য দিয়ে সে আমোদ দিতো। বেশ লাগে প্রথম-প্রথম। তবুও বছরের-পর-বছর একই মুখ, একই সঙ্গ, একই চাঞ্চল্যহীন নিষ্প্রাণ জীবন যেন আর ঠেলে কাটিয়ে ওঠা যায় না।

সবই যেন প'চে উঠেছে। অবিরাম বিশ্রাম নেওয়ার পরিবেশ যেন ক্লান্ত, হয়রান ক'রে তুলতো।

কথা ওঠে জেল-পালানো যায় কিনা। সে এক মজার ষড়যন্ত্র। অপ্রকৃতিস্থ মন ভাবতো, কিছুক্ষণের জন্যও তো বাইরেটা দেখতে পাবো, একটা নতুনত্ব হবে ; ধরা পড়তেই হয়তো হবে, তবু সেটাতে আছে একঘেয়েমির মধ্যেও স্বাদ বদলের আনন্দ। মশারির ডাণ্ডা আর কাপড়, এই সব দিয়ে চলে অবাস্তব পরিকল্পনা। ষড়যন্ত্র অনেকখানি পেকে উঠেছে এমন সময় একটা সেলের দরজায় বাঁধা কাপড় দেখে ওরা সন্দেহ ক'রে ফেলে। চলে তল্লাসী। আবার সব পরিষ্কার। খতম হ'য়ে গেল জেল-পালানো।

আর-একটা কাজ ছিলো নতুনত্ব পাবার। বীণা-শান্তিদের ওয়ার্ডের কাছে যে-প্রাচীরটা দাঁড়িয়ে আছে তার নিচে একটা জায়গায় ছিলো নর্দমা। নর্দমার ওপরে হাতখানেক উঁচু সামান্য একটু জায়গা ছিলো জাল দিয়ে ঘেরা। নর্দমার ওখানে মাথাটা রেখে ওই ফাঁকটুকু দিয়ে বাইরের জগৎ একটুখানি দেখা যেতো। দেখতাম ট্রেন চলছে ; ওটা যেন জীবন্ত, কথা কইতে পারে। বাইরের গাছপালাও দেখা যায়, তারাও আমাদের সঙ্গে কথা কয়। কদাচিৎ এক-আধজন পথিকও ওই পথে চ'লে যেতো। আর, টহল দিতো সঙ্গীনধারী সিপাই। সবটা মিলে একটুখানি ফাঁকের মধ্যে বৃহৎ জগৎ এসে ধরা দিতো। নর্দমাটার আকর্ষণ যত প্রবলই হোক, নর্দমার ওপরে মাথা নিচু ক'রে কতোক্ষণ আর থাকা যায়।

এমনি ক'রে কেটে যায় বছরের-পর-বছর। হিজলীতে ছিলো কতকগুলো ঘোড়াঘর। অর্থাৎ ঘোড়া দাঁড়াবার আস্তাবলের মতো কয়েকটা সেল গায়ে-গায়ে লাগানো। ওই সেলগুলো ছিলো আমাদের এক-একজনের দিন কাটাবার নিজস্ব স্থান। নিজেকে নিয়ে একলা কাটাবার চমৎকার পরিবেশ সেটা। সামনেই জেলের প্রাচীর,

তার ওপরে নীল আকাশ। যতখানি খুশি পড়াশুনা করবার এবং একান্ত ক'রে নিজেকে দেখবার এমন স্থান আর নেই। আমারও একটা ঘোড়াঘর ছিলো।

ওই সেলে বসলে ধীরে-ধীরে অতীত জীবন এসে ধরা দিতো। নিজের অতীত নিজের কাছে এমন মধুর হ'য়ে দেখা দেবে কখনো ভাবিনি। বর্ষাকালের অনুভূতি ছিলো করুণ ও মায়াময়। অঝোরে হিজলীর বর্ষা নেমেছে চোখের সামনে, মনে পড়ে যেন সেই ছোটো-বেলায় আমাদের গ্রামে চ'লে গেছি। গ্রামের নাম ছিলো বিদগাঁও, ঢাকা জেলায় বিক্রমপুরের মধ্যে। আমাদের গ্রামের সেই অনন্ত আকাশ যেন ঘন কালো মেঘে গ্রাম-গ্রামান্তর জুড়ে সেজেছে, ছোটো আমরা উঠোনে খেলছি আর বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করছি। হঠাৎ নেমে এলো বৃষ্টি দিগন্ত কাঁপিয়ে ঝমাঝম শব্দে। সেই অঝোর বৃষ্টির শব্দ কী মিষ্টি, কী মোহময়। জেলের বৃষ্টি ব'য়ে আনে সেই গাঁয়ের বর্ষার স্মৃতি। সেলে শুয়ে-শুয়ে চোখ বুজে দেখতে পাই আমাদের গ্রামের বাড়ির কলাগাছগুলো ঘোমটা দিয়ে মাথা দুলিয়ে-দুলিয়ে ডাকছে। বড়ো-বড়ো আম, কাঁঠাল, নারকেল গাছগুলো ওদের সঙ্গে স্নান করতে বলছে। পুকুরে বড়ো-বড়ো বৃষ্টির ফোঁটা হাজারে-হাজারে নাচছে আর ইশারা করছে ওদের সঙ্গে মেতে উঠতে। নেচে ওঠে বন্দী হৃদয়। আমাদের বাড়ির পাশেই ছিলো একটা খাল। সেই খালের জল বর্ষার প্রথমেই প্রতিদিন বেড়ে-বেড়ে ফুলে উঠতো। দেখতে-দেখতে কয়েকদিনের মধ্যেই আনাচে-কানাচে অতি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জোয়ারের স্রোত ব'য়ে নিয়ে যেতো। সেই স্রোত উঁচুমাত্র হয়তো কোথাও দুই তিন ইঞ্চি, কোথাও হাঁটু পর্যন্ত। এই জলরেখা মাঠ-ঘাট, ছোটোখাটো নিচু জায়গা, সব কুলকুল ক'রে ভাসিয়ে নিয়ে যেতো। আমরা তাতে পা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম। তর্‌তর্‌ ক'রে পায়ের ওপর দিয়ে চ'লে যাওয়া জোয়ারের স্রোতকে নিজের অঙ্গে

সারা তনুমনে অনুভব করতাম, আনন্দে উথ্‌লে উঠতো মন স্রোতের টানে-টানে। যেন ওদের প্রাণ আছে, যেন ওরা আমার সঙ্গে কথা কয়, ওদের সঙ্গে ছুটে যেতে বলে অনন্ত বিশ্বে। কিশোর মন ছুটে চলতো সেই অশান্ত জোয়ারের সঙ্গে আত্মহারা হ'য়ে। আজকের বন্দী হৃদয়ও কল্পনায় ছুটে যেতে চায় ওই গ্রামের অবাধ্য ছোট্টো-ছোট্টো প্রাণবন্ত স্রোতের সঙ্গে বিরাট বিশ্বের দিকে। সেই গ্রামখানি একদিন পদ্মার অতল গভীরে চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে পড়লো।

১৯৩৪ সালের ডিসেম্বরে বাবার গল-ব্লাডার অপারেশনের সময় আমাকে মাস তুয়েকের জন্য নিয়ে গিয়েছিলো প্রেসিডেন্সি জেলে। ষোলো দিন পর্যন্ত প্রতিদিনই আমাকে বিকেলে ঘণ্টা তুইয়ের জন্য বাবাকে দেখাতে নিয়ে যেতো মেডিক্যাল কলেজে। সে-যাত্রা বাবা কোনোরকমে রক্ষা পেয়ে গেলেন।

এই সময়ে প্রেসিডেন্সি জেলে ছিলো জ্যোতিকণা দত্ত। রিভলভার রাখার অপরাধে পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিলো তার। ওখানে ছিলেন সুনীতি দেবী, ডেটিনিউ তিনি। তাঁর মেয়ে মায়া দেবীকে সে-সময় অত্যন্ত রুগ্ন অবস্থায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেখেছিলো জেল কর্তৃপক্ষ। মায়া দেবী ছিলেন আন্তঃপ্রাদেশিক ডিনামাইট কেসে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। মায়া দেবীকে কোনোদিনই আমি স্বচক্ষে দেখিনি। সুনীতি দেবী ও জ্যোতিকণার কাছে কতো গল্পই তাঁর সম্বন্ধে শুনেছি। সেই তেজস্বী মেয়ে নাকি 'ভাঙে তবু মচকায় না'। তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী ক'রে রেখেছিলো তাঁকে। সুনীতি দেবীরা বলতেন, মায়া দেবীকে জমাদারনীরা নাকি অনেক কষ্ট দিয়েছে। তাঁরা আরো বলতেন যে, মায়াকে 'স্লো পয়জন্' (slow poison) করা হয়েছে, তাই অমন অসুস্থ হ'য়ে আছে। রোগমুক্তির কোনো লক্ষণ বা আশা-ভরসা

তখন তাঁরা দেখতে পেতেন না। সুনীতি দেবীকেও রোজ নিয়ে যেতো মেডিক্যাল কলেজে তাঁর মেয়ে মায়াকে দেখাতে। কিন্তু আমি যে কয়দিন গিয়েছি, আমার সঙ্গে তাঁকে একসঙ্গে কখনো নিতো না, তাই মায়া দেবীকে আমি দেখিনি কখনো। শুধু সেই অদৃশ্যে থাকা রুগ্ন মেয়েটির অনমনীয় মাথাটাকে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতাম।

একদিন প্রেসিডেন্সি জেলে এলো শোভারানী দত্ত। ডেটিনিউ সে-ও। দার্জিলিং লেবং কেস-এ সে ধরা পড়েছিলো। পাগল হ'য়ে যাবার পরে গভর্নমেন্ট তাকে রাঁচিতে পাগলাগারদে চিকিৎসার জন্য পাঠায়। সুস্থ হবার পর আবার তাকে ফিরিয়ে এনেছে প্রেসিডেন্সি জেলে। শোভাকে আমি জিগ্যেস করি, 'শোভা, তুমি কি সত্যিই পাগল হ'য়ে গিয়েছিলে, না পাগলের ভান করেছিলে?' শোভা বিষণ্ণ মুখে উত্তর দেয়, 'তুমিও এ-কথা বলো? জমাদারনীরা আমাকে তালা দিয়ে মারতো।' আমি নিজের প্রশ্নে নিজে লজ্জিত হই। রূপে গুণে আগুন মেয়ে ছিলো শোভা। রাজরানীর মতো ম্যাজেস্টিক ভাব তার চলাফেরায়, কথাবার্তায়, মুখের চেহারায়। হৃদয়ের প্রাচুর্য প্রকাশ পায় তার বড়ো-বড়ো চোখ দু'টিতে।

প্রেসিডেন্সি জেলে আগে থেকেই ছিলো জ্যোতিকণা। কী মিষ্টি মেয়ে! ডায়োসেসান কলেজের বি. এ. ক্লাসের ছাত্রী সে, পড়াশুনায় উঁচু স্থান অধিকার করে, মধুক্ষরা স্বভাব। একটু যেন আনাড়ী, অনভিজ্ঞ, কিন্তু আসল জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে আছে। জ্যোতিকণা বলতো যে, ছাত্রজীবন যত সফলই হোক্ না কেন, তার সঙ্গে রাজ-নৈতিক জীবনের কোনো সম্পর্ক নেই। এ-কথার তাৎপর্য এই যে, পড়াশুনায় ভালো মেয়ে ব'লে স্কুল-কলেজে তার যত খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা থাকুক না কেন, রাজনৈতিক জীবনে সে সফল হ'তে পারেনি। রিভলভার ক'টা সে যে বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি সেজন্য নিজেকে সে ক্ষমা করতে পারতো না।

মাস তুই পরে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে এলো হিজলীতে। আবার সেই হিজলী জেল, সেই বদ্ধ জল, সেই পরিচিত আবহাওয়া। ছয় ঋতু কিন্তু তার ছ'টা বর্ণের ডালি নিয়ে অপরূপ সাজে একে-একে এসে নতুন রঙে নিজেদের ছড়িয়ে দিয়ে যেতো। প্রকৃতি কখনো একঘেয়ে হ'তো না। এলো আবার বর্ষা। মাঝে-মাঝে বৃষ্টির আগে কালো মেঘের পটভূমিকায় বন্দী মেয়ে প্রফুল্ল ব্রহ্ম এক মজার কমিক গান করতো। চোদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ে জেলে এসেছিলো, কুমিল্লায় বাড়ি তার। প্রফুল্ল কল্পনা করছে, সামনেই যেন অনেক ধান রোদে দেওয়া হয়েছে, ওদিকে কালি মেখে মেঘ জমেছে আকাশে। এখুনি বুঝি বৃষ্টি নেমে আসছে। প্রফুল্ল তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় উঠিয়ে দিয়েছে, কিন্তু কানের ওপিঠে সরিয়ে রেখেছে কাপড়টা, কোমরে ক'ষে আঁচল জড়িয়েছে। তারপর গাইছে কুমিল্লার গান (অ্যাক্‌শান সঙ্‌)—

'দান্ তোল্ দান্ তোল্ ছেরি,
ম্যাগে ভিজ্যা Zায়লো,
লোডের মইধ্যে দিয়া দান্
গাপ্পুর গুপ্পুর বাইন্ধ্যা আন্।'

পূর্ববঙ্গের গ্রামের ভাষা কী মিষ্টি ওর গলায়! মনে হ'তো যেন সত্যি-সত্যি সে এখুনি বৃষ্টির আগেই ধান ভানতে যাচ্ছে।

জেলখানাটা এমন জায়গা যে, মানুষ সেখানে গিয়ে নিজের মনকে নিয়ে কেবলি হয়রান হয়। অফুরন্ত সময় সেখানে। চিন্তায় ডুবে যাবার, সমস্ত জীবনকে তলিয়ে ভাববার, অনাদি অনন্ত বিশ্বকে কল্পনায় খুঁজে ফিরবার, জগতের আদিঅন্তকে জানতে চাইবার, সত্যকে আবিষ্কার করবার একটা তুর্নিবার আকর্ষণ তাকে অহরহ টানতে থাকে। চিন্তাকে পাশ কাটিয়ে যাবার উপায় নেই। চিন্তা যে কতো নির্মম, কতো নিষ্ঠুর শিকারী হ'তে পারে সে-কথা জেনেছি জেলখানায়।

এমনি ক'রে কেটে গেল সওয়া ছয় বছর। গ্রেপ্তার করেছিলো ১৯৩২ সালের মার্চ মাসে, মুক্তি পেলাম ১৯৩৮-এর জুন-এ। শেষের বছর দেড়েক 'হোম ইন্টার্নড্'— স্বগৃহে অন্তরীন। জেলে ছিলো আমার উৎকট অনিদ্রা-রোগ। আশ্চর্য এই যে, যেদিন বাড়ি ফিরেছি সেই রাত থেকেই অনায়াসে এলো প্রগাঢ় নিদ্রা। শুধু মা'র হাতখানা আমায় ছুঁয়ে থাকতো। মায়ের একটু স্পর্শ যে এতকালের রোগ জাদুমন্ত্রের মতো সারিয়ে দিতে পারে তা কি কেউ বিশ্বাস করবে?

১৯৩৮ সাল। গভর্নমেণ্টের কঠোর নীতি বদলে গেছে। স্বাধীনতা-সংগ্রামের এক অধ্যায় শেষ হ'য়ে গেছে, স্তিমিত হ'য়ে এসেছে উদ্দামতা। আর-একবার দম নেবার জন্য সময় পাওয়া প্রয়োজন। গান্ধীজী আলোচনা চালিয়েছেন গভর্নমেণ্টের সঙ্গে। বেরিয়ে এলেন ১৯৩৮ সালে সমস্ত রাজবন্দী (বিনা বিচারে বন্দী) এবং ১৯৩৯-এ বহু রাজনৈতিক বন্দী (দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দী)। এইবার শেষ আঘাত হানবার জন্য চরম প্রস্তুতি চাই।

'যুগান্তর' দলের বৈঠক বসলো। নতুন পরিস্থিতিতে তাঁরা কী কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করবেন তারই আলোচনা চলে। তাঁরা মনে করলেন, বিপ্লবীদের সহিংস এবং গুপ্ত আন্দোলন চালাবার আর প্রয়োজন নেই। তাঁদের যা চরম দান তা দেশ গ্রহণ করেছে। মুষ্টিমেয় বীরদের চরম ত্যাগের আদর্শ (maximum sacrifice of the minimum number) দেশময় ছড়িয়ে গেছে। চরম ত্যাগের আদর্শ এখন গ্রহণ করেছেন গান্ধীজীও। তিনি এতদিন যে-আন্দোলন দিয়ে দেশকে প্রস্তুত করছিলেন তার দাবি ছিলো সর্বাধিক লোকের স্বল্প ত্যাগ (minimum sacrifice of the maximum number), কিন্তু এখন তিনি চাইলেন সর্বাধিক লোকের চরম ত্যাগ (maximum sacrifice of the maximum number)। এই চরম ত্যাগের আদর্শ ছিলো বিপ্লবীদের। এখন বিপ্লবীরাও চান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তগত করতে। সেজন্য তাঁদেরও প্রয়োজন সর্বাধিক লোকের চরম ত্যাগ। মিলে গেল দুই পক্ষের পথ ও লক্ষ্য। কৃষক শ্রমিককে কংগ্রেসের নেতৃত্বে স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করতে হবে— এই হ'লো বিপ্লবীদের আদর্শ। পণ্ডিত জওহরলালও তখন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে এই লক্ষ্যে গ'ড়ে তুলছিলেন। কাজেই পরিপূর্ণ মিল হ'য়ে গেল উভয়ের। যুগান্তর

দল সেজন্য নিজেদের গুপ্তদল ভেঙে দিলেন, আর তার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। যোগ দিলেন তাঁরা কংগ্রেসে পুরোপুরিভাবে। অন্য কোনো রাজনীতি তাঁদের রইলো না। তবে আলোচনা-পরামর্শ চলে নিজেদের মধ্যেই, প্ল্যান-প্রোগ্রাম আলাদা না থাকলেও তাঁদের নির্দেশ ছাড়া দলের লোকেরা ব্যক্তিগতভাবে কেউ কিছু করতে পারতো না। সেই হিসাবে মনে হ'তো দলে আছি।

একদিন আমার উপরে নির্দেশ এলো 'মন্দিরা' মাসিক পত্রের সম্পাদিকা হবার। আমার পক্ষে সেটা কঠিন নির্দেশ পাওয়া। কিছুতেই যখন রাজী নই তখন অবশেষে ভূপেনদা (ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত) এলেন নিজে বোঝাতে।

দলের অনেকে তখন কমিউনিস্ট হ'য়ে গেছেন। অমনি ক'রে গেছে পুটু, গেছে কমলা চ্যাটার্জি। কমলা চ্যাটার্জি তখন 'মন্দিরা'র সম্পাদিকা। কাজেই 'মন্দিরা'তে চলছিলো ভেঙে-দেওয়া যুগান্তর দলের বিরুদ্ধ সমালোচনা। দাদারা সেটাতে অপমানিত, ক্ষুব্ধ বোধ করেছিলেন। অতএব আমাকে সম্পাদিকার ভার নিতে বললেন। এদিকে কমলা চ্যাটার্জির সঙ্গে হিজলী জেলে সুখে-দুঃখে এমন নিবিড়ভাবে জড়িয়েছিলাম এবং তার প্রতি আমার এতখানি দুর্বলতা ছিলো যে, তার স্থান আমার পক্ষে দখল করা ছিলো অসম্ভব। ভূপেনদা বোঝালেন, 'এটাকে ব্যক্তিগতভাবে নিচ্ছো কেন?' বোঝালেন, কমলা চ্যাটার্জি যেমন 'মন্দিরা'র ব্যাপারে ব্যক্তিগত মানুষ নয়, তার দলকে সে ফুটিয়ে তুলবে এর মধ্য দিয়ে, তেমনি আমিও 'মন্দিরা'তে ব্যক্তিগত কিছু নই। ফুঠে উঠবে এতে এঁদের রাজনৈতিক আদর্শ। সেখানে কমলা চ্যাটার্জির সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত বিরোধ নেই, আছে আদর্শগত বিরোধ। তবু তাকে ভালোবাসতাম ব'লে অত্যন্ত সংকোচ ও দুঃখ আমায় ঘিরে ধরছিলো।

আমার আর-একটা প্রকাণ্ড ভয় ছিলো, সেটা হচ্ছে আমার নিজের অযোগ্যতার। সেখানেও ভূপেনদা বোঝালেন যে, এটা আমার ব্যক্তিগত কাগজ নয়, বড়োদের এতে দায়িত্ব আছে; দায়িত্বশীল যাঁরা তাঁরা দায়িত্ব নিচ্ছেন, আমার কিছু ভয় নেই। তবু অতি সংকোচে ও লজ্জায় ১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসে সম্পাদিকার ভার গ্রহণ করলাম।

বাড়িতেই আছি। বাবা আর বিয়ের কথা বলেন না। কিন্তু একটা গভীর অভিমান নিয়ে ব্যবহার করেন। বাড়ির সঙ্গে আমার প্রকাণ্ড বিচ্ছেদ যেন। ভাইবোনেরা মনে করে, বাবা-মাকে দুঃখ দেওয়াই আমার কাজ। বাবা বলতেন, 'রিবেলিয়াস চাইল্ড'। বাড়িতে থেকেও কতো যে দূরত্ব, যেন কোথাও খাপ খাই না। অথচ এঁদের মতো আপন কে আছে? তাঁরা আমার সব সুখ সুবিধাই দেখেন, আমি শুধু তার সুযোগ নিই। দলের দাদারা চাকরি করতে দেবেন না, তা হ'লে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কাজের ব্যাঘাত হবে। আমার সমস্তটুকু সময়, সবটুকু কর্মক্ষমতা এবং শারীরিক ও মানসিক শক্তি শুধু এই কাজেই ব্যয় করবার জন্য তাঁদের দাবি, আমিও তৈরি। জানি, তখন নিজের খরচ নিজে বহন করা উচিত বাড়ির উপর নির্ভর না ক'রে। কিন্তু গ্রাহ্য করি না। একটু লজ্জা করে, কিন্তু সে-খরচও যেন নিজের জন্য নয়।

বাবার শরীর ক্রমেই ভেঙে পড়ছিলো। গল-ব্লাডার অপারেশনের বছর তিনেক পর থেকেই লিভার অকর্মণ্য হ'য়ে আসছিলো। অবশেষে তিনি শয্যা নিলেন। প্রায় ছ'মাস শয্যাগত রইলেন। খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে ডাক্তাররা যা কড়া ব্যবস্থা দিতেন তিনি তা শুনতে চাইতেন না। একদিন যখন বাবাকে মা কিছুতেই খাওয়াতে পারলেন না তখন আমাকে মা বললেন তাঁকে অনুরোধ

করতে। মা'র ধারণা বাবা আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। আমার কথা তিনি রাখবেন। আমি বাবাকে খেতে বলতেই তিনি আস্তে ক'রে বললেন, 'সমস্ত জীবন ধ'রে তুমি আমার কোনো কথা শোনোনি, আমিও আজ তোমার কথা শুনবো না।' মনে ভাবি, হায় রে! সমস্ত জীবন ধ'রে আমি বাবাকে তিলে-তিলে যত কষ্ট দিয়েছি, এই কি তার তুলনা হ'লো? এই হ'লো শোধ নেওয়া? চুপ ক'রে ব'সে রইলাম। বাবা মনে-মনে চাইতেন আমি তাঁর কাছে একটু ব'সে থাকি। কিন্তু মুখে বলতেন না, যদি না শুনি, যদি কাজে বেরিয়ে যাই, সেই তাঁর অভিমান। সত্যিই তো তাই করেছি। পারিবারিক জীবনকে, ব্যক্তিগত জীবনকে কিছু মূল্যই তো দিইনি!

বাবা শুনতে পাচ্ছিলেন ওপারের ডাক। জীবনের প্রদীপ তাঁর নিভে আসছিলো। সময় ফুরিয়ে এসেছে বুঝে তিনি একদিন সন্ধ্যাবেলায় ডেকেছেন আমাকে। বাড়িতে ছিলাম না। ফিরে আসতেই কাছে ডেকে নিলেন। আস্তে-আস্তে গায়ে আমার হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন, গলা কেঁপে উঠছে, তবু স্নেহকাতর কণ্ঠে বললেন, 'আমি তোমাকে কতো কষ্ট দিয়েছি, আমাকে তুমি ক্ষমা করো।'

'এমন কথা কেন বলো, বাবা? আমিও তো তোমাকে কতো কষ্ট দিয়েছি।'

'না, না, আমাকে তুমি কিছু কষ্টই দাওনি। আমার কোনো কষ্টই হয়নি।'

সারা জীবন ভ'রে আমার দেওয়া দুঃখ পলে-পলে তাঁকে গভীর আঘাত করেছে এবং সঙ্গে-সঙ্গে তিনি পিতৃ-হৃদয়ের অনুপম স্নেহে তা' ক্ষমা ক'রে গেছেন। তাই পরম নির্ভরে, পরম নিশ্চিন্তে তাঁরই ছায়ায় থেকে তাঁকেই আঘাত দিয়ে-দিয়ে জীবনটা সাহস ক'রে এ-ভাবে কাটিয়ে এসেছি, তবু তিনি ব'লে গেলেন তাঁকে কোনো কষ্টই

দিইনি। শুধু বাবা আর মা ছাড়া এমন অবিচলিত ক্ষমার প্রতিমূর্তি আর কে আছেন? তীব্র যাতনা যখন দিয়েছি তখনো সস্নেহ দু-বাহু বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি। জীবনের সমস্ত ঝড়ঝঞ্ঝা থেকে অশান্ত, অবাধ্য কন্যাকে আপন বুক দিয়ে রক্ষা করতে, দু-হাতে আবৃত ক'রে রাখতে কতো না আকুল প্রয়াস! আমি প্রাণপণে সে-বক্ষ, সে-হাত প্রবল ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে চ'লে গেছি, তিনি আবার এসেছেন, আবার পরম স্নেহভরে ডেকেছেন, ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে গেছেন, তবু চিরক্ষমাভরা সেই চ'লে যাওয়া।

চ'লে গেলেন বাবা। বাকি জীবনের শত দুর্যোগেও তাঁর ভয়ব্যাকুল কণ্ঠ আর তো সাবধান করতে ছুটে আসবে না!

পরাধীন দেশের যত ছেলেমেয়ে বাবা-মায়ের চরম অবাধ্য হ'য়ে সেদিন বীচিবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে চেয়েছিলো, তাদের সব বাবা-মা'ই বুঝি এমনিতরো গভীর দুঃখ পেয়েছিলেন, আবার এমনি ক'রেই সন্তানের কর্মপথে অজস্র আশীর্বাদ দু-হাতে ছড়িয়ে গেছেন। তাই তাঁদের ছেলেমেয়েরা নির্মম যাতনা দিয়ে গেছে, কিন্তু ফিরে দুঃখ কিছু পায়নি। সার্থক হয়েছিলো দুর্গম যাত্রাপথ।

সেই সব বাবা-মায়ের বেদনাদিগ্ধ অশ্রুরাশি যেন পরাধীনতার সমাধির উপর আজ প্রসন্ন পুষ্পরাশি হ'য়ে ফুটে আছে।

আরম্ভ হ'য়ে গেছে 'মন্দিরা'র কাজ। প্রথমে মনে হয়েছিলো আমার বুঝি বিশেষ কিছু করবার দায়িত্ব নেই। সে-দায়িত্ব বড়োদের। কিন্তু ভুল ভাঙতে মোটেই দেরি হ'লো না। তবু হোঁচট খেতে-খেতে এগিয়ে চলেছি।

লেখা যোগাড় করতে হবে। দলের বড়োদের কাছে লেখার জন্য তাগিদ দিয়ে ফিরি, তাঁরা কিছু অন্য লেখকের সন্ধান দেন। আমি তবুও তাঁদেরই লেখা চাই। কিন্তু লেখা চাওয়াতে তাঁদের সলজ্জ হাসিটুকুই বেশি প্রকাশ পেতো। তার অর্থ যেন, সময় কোথায়? হবে, হবে। অন্যদিকে অফুরন্ত কাজে বিদ্যুৎগতির মতো ব্যস্ত তাঁরা। 'মন্দিরা'র জন্য তো সম্পাদিকাই রয়েছে, যা হোক সেই ক'রে নেবে।

অথচ বহুদূরপ্রসারিত গভীর রাজনৈতিক দৃষ্টি নিয়ে নিয়মিত লিখবার জন্য নিজেদের একটি লেখকমণ্ডলীর প্রয়োজন ছিলো, যাঁরা মনোমতো রাজনৈতিক ও অন্যান্য লেখা সুষ্ঠুভাবে লিখে কাগজকে তার শৈশবে সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান ক'রে গ'ড়ে তুলবেন। রাজনীতি নিয়ে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে নিজে লিখতে থাকবে সে-স্পর্ধা সম্পাদিকার নিজের ছিলো না। কেবলি মনে হ'তো ছেড়ে দিয়ে বাঁচি, কিন্তু সে-উপায়ও নেই।

কিছুদিন বাদে সম্পাদকীয় লিখতেও শুরু করলাম। ক্রমে সবই অভ্যাস হ'য়ে এলো। অভিমান চ'লে গেল। দরদী কর্মী আছেন পাশেই। তাঁকে দেখে নিজের দুঃখ ভুলে যাই। পরেশচন্দ্র দে, 'মন্দিরা'র একনিষ্ঠ কর্মী। অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে চলেছেন তিনি রাত একটা-দু'টো পর্যন্ত। ভাঙা হাঁটুর পুরোনো বেদনা আছে, মাঝে-মাঝে পেটের অসহ্য যন্ত্রণা আছে, ফাটা চোয়াল জোড়া দিলেও মাঝে-মাঝে হাঁক দিয়ে ওঠে।

'অত ভাঙলো কি ক'রে পরেশবাবু ?'

'জানেন না ? এরোপ্লেন থেকে প'ড়ে গিয়েছিলাম।'

বুঝলাম মিথ্যা কথা। শেষে জানতে পাই পুলিসের অমানুষিক অত্যাচারে তাঁর হাঁটু ভেঙেছে, কনুই ভেঙেছে, চোয়াল ভেঙেছে, পেটে বুটের লাথির চোটে অন্ত্রকে ফাটিয়ে রক্ত চুঁইয়েছে, তবু কথা বের করতে পারেনি। খেলোয়াড়, পালোয়ান ছিলেন তিনি। আজও মনের শক্তির অন্ত নেই, উৎসাহে কখনো শ্রান্তি আসে না। 'মন্দিরা'র জন্য অক্লান্ত খাটছেন তিনি, যেন রাজনীতির ভিত্তিমূল নীরবে গেঁথে চলেছেন। আমি অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকি। 'মন্দিরা' দাঁড়াবে, উচ্চাঙ্গের কাগজ হবে, সেই আকাঙ্ক্ষা পরেশবাবুকে অস্থির ক'রে তুলেছে। অত কঠিন পরিশ্রম ভাঙা শরীরে সহ্য হবে কেন ? ক্ষত অন্ত্র সজাগ হ'য়ে উঠলো। নিরুপায় হ'য়ে তিনি বাড়ি চ'লে গেলেন।

জেল থেকে বেরিয়ে এলো বীণা। সে-ও আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে গেছে। বিজ্ঞাপন-সংগ্রহের চেষ্টায় তাকে নিয়ে ড্যালহাউসি স্কোয়ারের বিরাট দালানগুলির তিনতলা, চারতলা, পাঁচতলা উঠি আর নামি। কখনো লিফ্‌টে, কখনো সিঁড়ি ভেঙে।

নেশা লেগেছে 'মন্দিরা' গ'ড়ে তুলবার কাজে। আমাদের সঙ্গে যোগ দিলো মায়া ঘোষ, বিভা চৌধুরী, রেবা ঘোষ, কমলা সেন, তুলু দত্ত এবং আরো অন্য মেয়েরা। বিজ্ঞাপনের জন্য ছুটে যাওয়া, লেখা যোগাড় করা, গ্রাহক সংগ্রহ করা সমস্ত কাজই 'মন্দিরা'র মেয়েকর্মীরা রাজনীতির অঙ্গ মনে ক'রে মহাউৎসাহে দিনের-পর-দিন পরিশ্রম ক'রে চলেছে।

এক-সময়ে 'মন্দিরা'র কাছ থেকে গভর্নমেণ্ট সিকিউরিটি ডিপোজিট চাইলো এক হাজার টাকার। অরুণদা (অরুণচন্দ্র গুহ) তাঁর পরিচিত কয়েকটি নামের একটা লিস্ট লিখে দিলেন, আমরা বাড়ি-বাড়ি ঘুরে হাজার টাকা যোগাড় করলাম।

এক-একদিন রাত্রে সম্পাদিকার ঘরখানা দরদী লেখক এবং সমালোচকদের আনাগোনায় ভর্তি হ'য়ে যায়। নানা কথাবার্তায় কোথা দিয়ে সময় ব'য়ে যায়। কতো কাজের কথা, কতো লেখা ও লেখকের সমালোচনা, কংগ্রেসের রাজনীতি, গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গী, সরোজিনী নাইডুর বক্তৃতা ও অভ্যর্থনা, রবীন্দ্রনাথের কাব্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতি প্রকৃতি, এশিয়ার ভবিষ্যৎ, ইরাণ আক্রমণ, যুদ্ধরত জার্মানীর মতলব, জাপানের বৃহত্তর সম্ভাবনা, ইংরেজের টিঁকে যাবার আশঙ্কা, বার্নার্ড শ, বার্ট্র্যাণ্ড রাসেল, ইত্যাদি দুনিয়ার যত রকমের আলোচনা সব ভিড় জমিয়েছে সেখানে, ঘর সরগরম ক'রে চলতে থাকে হৈ-হৈ। কোথায় তলিয়ে যায় সম্পাদনার কাজ, চিঠির অসমাপ্ত উত্তর ফাইলেই ঢুকে যায়। না-পড়া লেখাগুলো আপনিই মুখ লুকোয়, সম্পাদিকা হারিয়ে যান বৃহত্তর জগতের মাঝে, বিপুল পৃথিবীর কোলাহলের অন্তরালে। বিশাল বিশ্ব অজান্তে এসে ছোট্টো তাঁর ঘরখানিতে ধরা দিতে চায়। রাতের মতো আর সব কাজ বন্ধ হ'য়ে যায় সেদিন, জেগে থাকে শুধু আনন্দময় অনুভূতি আর আলোচনার উত্তেজনা ও তার কোলাহল।

বাংলাদেশে যতগুলি প্রধান-প্রধান রাজনৈতিক পত্রিকা প্রয়োজনে গ'ড়ে উঠেছিলো তার জন্য নিজেদের উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তুলতে কিছুসংখ্যক নিজেদের লেখক ছিলেন, যাঁদের লেখার বৈশিষ্ট্য কাগজকে বিশেষত্ব দিয়েছে এবং রাজনৈতিক আবহাওয়া বুঝে বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদ মিটিয়েছে। তখনকার রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খেয়ে অভাব পূরণ হয়েছে, তৃপ্তি দিয়েছে। তাই সেই রাজনৈতিক কাগজ বিশেষ সময়ে বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিলো। এমন কাগজই ছিলো সন্ধ্যা, যুগান্তর, বন্দেমাতরম, ধূমকেতু, স্বাধীনতা, ছিলো বেণুও।

আমাদের সময়ে ১৯২৯-৩০ সালে 'স্বাধীনতা' কাগজখানা তরুণ

মনের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে জাগিয়ে দিয়ে পথ দেখিয়ে চলতো। তার লেখার ভিতর দিয়ে বিপ্লবের বাস্তব রূপ ফুটিয়ে তুলে কর্মীদের উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলা হ'তো। আমি নিজে যা দেখেছি, যা অনুভব করেছি তার তুলনা নেই। সাপ্তাহিক ওই কাগজখানার জন্য দিন গুনতাম। হাতে পেলে যেন প্রতিটি অক্ষর গোগ্রাসে গিলতাম। তার লেখাগুলি দাগ কেটে-কেটে মনে গেঁথে যেতো। গর্বে বুকটা ভ'রে উঠতো। সূর্য সেন নাকি বলতেন, 'ছেলেরা হাঁ ক'রে ব'সে থাকে কবে 'স্বাধীনতা' আসবে।' এমনি ছিলো 'স্বাধীনতা'র আকর্ষণ। প্রভাব ছিলো তার গভীর ও ব্যাপক।

কিন্তু 'মন্দিরা' সে-ধরনের কাগজ হ'য়ে উঠতে পারেনি, এই আমার ধারণা। তার প্রথম এবং প্রধান ত্রুটি সম্পাদিকার নিজের। কিন্তু নিজেদের মধ্যে তখনকার প্রয়োজন অনুযায়ী লিখবার লেখকের যে অভাব ছিলো তা মোটেই নয়, আসলে অভাব ছিলো তাঁদের সময়ের। ঠিক জোনাকি পোকার আলোর মতো দাদারা এই আছেন, এই নেই। অনেক জ্বালাতন করবার পর হয়তো দু-একটা লেখা পেতাম। কিন্তু বেশির ভাগই তাঁদের স্নেহস্বর কেবলি বলে, 'সময় কোথায়? তোমরাই লেখো।' তাঁরা উৎসাহ দিতে পারেন, কিন্তু সেই উৎসাহ কবি সৃষ্টি করতে পারে না, সুলেখক তৈরি করতে পারেনি।

বিনা তাগিদে বীণার লেখা 'মন্দিরা' প্রায়ই পেয়েছে। মন্দিরা যাঁরা প্রথম প্রকাশ করেন, কল্যাণী দাস তাঁদের অন্যতম এবং প্রতিষ্ঠাত্রী। তাঁর লেখাও মাঝে-মাঝে এসেছে। এমনিতরো নিজেদের লেখিকাদলের মধ্যে লেখা দিতেন মায়া ঘোষ, সুপ্রীতি মজুমদার, শান্তিসুধা ঘোষ, সুলতা কর, স্নেহলতা সেন প্রভৃতি। কিন্তু বড়ো কম লেখা দিতেন এঁরা, যেন সমুদ্রে বারিবিন্দু।

দাদাদের মধ্যে সময় ক'রে যখন কেউ লিখতেন, আমার মনে

হ'তো, এবার 'মন্দিরা' বুঝি একটু উজ্জ্বল হ'য়ে উঠবে। ডাক্তার যাদুগোপাল মুখার্জি, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, অরুণচন্দ্র গুহ, মনোরঞ্জন গুপ্ত, রসিকলাল দাস, যতীশচন্দ্র ভৌমিক, হেমন্ত তরফদার, নগেন্দ্রনাথ দত্ত, সুধীর রায়চৌধুরী প্রভৃতি সকলেই মাঝে-মাঝে লিখতেন বটে, কিন্তু ওইটুকু লেখাতে আমার নিজেরও তৃপ্তি হ'তো না, 'মন্দিরা'ও তাতে কোনোদিনই পূর্ণ হ'য়ে ওঠেনি।

ওদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ক্রমেই ভয়ংকর হ'য়ে বিশ্বের আতঙ্ক বাড়িয়ে তুলেছে। ভারতের রাজনৈতিক আকাশে ক্ষণে-ক্ষণে রং বদ্‌লে যাচ্ছে। কখন কি হয়! বাংলা কংগ্রেস গেল হাত বদল হ'য়ে। আমার উপরেই এসে গেল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের মহিলা-বিভাগের ভার। সে আর-এক বিপুল দায়িত্ব। দুই দায়িত্ব নিয়ে আমি যখন হয়রান ঠিক এমনি সময়ে দাদারা একে-একে বিদায় নিয়ে জেলের ভিতর বিশ্রাম করতে চ'লে গেলেন। সময়ের অভাব তাঁদের আর রইলো না, কিন্তু লেখা পাঠাবার উপায়ও আর ছিলো না। সেটা ছিলো ১৯৪১ সাল।

দাদাদের অবর্তমানে হঠাৎ 'মন্দিরা'র অবস্থা অনিশ্চিত হ'য়ে উঠলো। বিচলিত হ'লাম আমরা। ঠিক সেই সময়ে দেবদূতের মতো এসে পরেশবাবু হাল ধরলেন। আবার তিনি কখন হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়বেন, ফাটা রক্তাক্ত অন্ত্র আবার যন্ত্রণা দেবে, আবার তিনি চ'লে যাবেন, এই বিবেচনায় আমাদের নিজের হাতে পাকা-পোক্ত ক'রে নিতে চাইলেন। আস্তে-আস্তে সমস্ত কাজ আমাদের হাতে চ'লে এলো। সঙ্গে বীণা আছে বন্ধু 'ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, রাজদ্বারে'।

সম্পাদিকা কৃতজ্ঞ র'য়ে যায় বাকি জীবন ভ'রে সমস্ত লেখক, পাঠক এবং দরদী মরমীদের কাছে। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত (১৯৪২-৪৫ বাদ) এই সম্পাদিকার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁরা 'মন্দিরা'কে

বাঁচিয়েছেন, রস পরিবেশন করেছেন। 'মন্দিরা' যা-কিছু হ'য়ে উঠেছে তা তাঁদেরই সহযোগিতায়।

১৯৪২-৪৫ অবধি আমাকে জেলে আট্‌কে রাখে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সেই দারুণ দুর্যোগের রাত্রিতে 'মন্দিরা'র সম্পাদিকা হ'য়ে তার হাল ধ'রে যে তাকে বাঁচিয়ে রাখে সে হচ্ছে স্নেহলতা সেন। আবার ১৯৪৫ সালে আমি জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর 'মন্দিরা'য় আমার সহকর্মী হ'য়ে যে শক্তি যুগিয়েছে সে হচ্ছে কুমিল্লার সেই শান্তি ঘোষ (দাস)।

কতো শত মানুষের আনাগোনা, দেখাশোনা, বৈচিত্র্যময় কাহিনী, দুঃখগাথা, সব একে-একে অলক্ষ্যে রেখাপাত ক'রে যায় ক্ষুদ্র এ-জীবনের যাত্রাপথে। জীবনের পড়ন্ত বেলায় আজ তারই সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম দাগগুলো স্পষ্ট হ'য়ে বৃহৎ হ'য়ে চোখের সামনে ভেসে আসে। কতো জীবনের কতো নির্মম দুঃখ, কতো উদ্বেলিত অনুভূতি অন্তরের গভীর গহনে রেখে গেছেন তাঁরা। কতো মহৎ মানুষ এসে বৃহত্তর জগতের আচম্‌কা ক্ষণিক আভাস দিয়ে গেছেন, সবই র'য়ে গেছে জীবনের অদৃশ্য পাতায়। কিছু-কিছু মনে আছে, কিছু-বা ভুলে গেছি, তবুও ঐশ্বর্যভরা সমস্ত অনুভূতি, হাসিকান্না-মেশানো সকল অভিজ্ঞতা নিয়ে অলক্ষ্যে গ'ড়ে ওঠে, ভ'রে ওঠে এ-জীবন। আমি চিরঋণী র'য়ে যাই 'মন্দিরা'র কাছে।

ভূপেনদা সেই যে ১৯৩৮ সালে কী দু'টো কথা বুঝিয়ে রেখে আমার হাতে তুলে দিলেন 'মন্দিরা'। কিন্তু তারপর? যাবার বেলায় সব অভিমান ভুলে আজ আমি প্রণাম জানাই ভূপেনদাকে। জানতেন কি তিনি আমার সংঘাতময় যাত্রাকাহিনী? আমার নিগূঢ় অভিমান ? আর আমার নীরব শ্রদ্ধা ?

সুভাষবাবুর সঙ্গে মতবিরোধের ফলে বাংলা কংগ্রেস যখন দ্বিধা-বিভক্ত, দুর্বল, সেই দুর্দিনে এই দলের হাতেই ভার পড়েছিলো প্রাদেশিক কংগ্রেস গঠন ক'রে তুলবার। এঁরা তখন আন্তরিক বিশ্বাসের সঙ্গে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে কংগ্রেসের মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছেন। নিজেদের বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান 'যুগান্তর'কে আগেই এঁরা ভেঙে দিয়েছিলেন, কিন্তু পরিচিত সঙ্গী হিসাবে এক সঙ্গেই চলে-ছিলাম পুরাতন এই কর্মীদল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির মহিলা-বিভাগের সম্পাদিকা হবার ভার দিলেন তাঁরা আমার উপর ১৯৪১ সালে।

'মন্দিরা'র কাজ করতে-করতে প্রকাশ্য কাজের একটু অভিজ্ঞতা আমার তখন হ'য়ে আসছিলো। তার আগে পর্যন্ত গুপ্তদলের কাজ করতে গিয়ে রাজনীতি নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা করা বা নিজেদের সর্বসমক্ষে তুলে ধরা কল্পনার বাইরে ছিলো, মহাঅপরাধ ছিলো। 'মন্দিরা'র কাজ করতে গিয়ে অনভ্যস্ত মন প্রথম-প্রথম অত্যন্ত সংকুচিত হ'য়ে অন্ধকারে লুকিয়ে যেতে চাইতো। চারিদিকের খোঁচা খেয়ে একটু ক'রে যতই মুখ বের করুক, তবুও আসল স্বভাব কাটিয়ে ওঠা অতি কঠিন ব্যাপার ছিলো। আবার প্রকাশ্যে কাজ করতেও বাইরের আঘাত পেয়ে অন্তরটা পুনরায় সেই শামুকের খোলের মধ্যেই মুখ লুকোতে চেয়েছে। মনে হয়েছে, শামুকের খোলের ভিতরের সেই যে অতিপ্রিয় পরিচিত জগৎ সেখানেই যেন কাজ করা সহজ, সেটাই আমার আপন স্থান। তবুও রাজনৈতিক আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজের স্বভাব এবং অভ্যাস কিছু পরিবর্তন ক'রে তাকে মানিয়ে চলতেই হবে, নইলে এগিয়ে যাবার পথ নেই।

কংগ্রেসের মহিলা-বিভাগের কাজ হাতে নিয়ে দেখি, এখানেও

সেই প্রকাশ্যে রাজনীতি করার যুগ। এখানে সম্পাদিকার ভার গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে বাংলার কংগ্রেসের মেয়েদের দায়িত্ব নেওয়া। জেলাগুলিতে যাওয়া, সেখানে গিয়ে মহিলা সাব-কমিটি গঠন করানো, তাদের সক্রিয় ক'রে তোলা, এই ছিলো প্রথম কাজ। বাংলার মেয়েরা কাতারে-কাতারে কংগ্রেসে আসবে, কংগ্রেসকে শক্তিশালী করবে, স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বে, এমনি ক'রে নাড়া দিয়ে চলতে হবে। বাইরে আছেন তখনো দাদারা, নির্দেশ-গুলি শুনে রাখি। আছেন গান্ধীজী।

যেতে হবে মফঃস্বলে। কর্মপ্রেরণা সংহত করতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ক্রমেই ঘনীভূত হ'য়ে উঠছে, কংগ্রেসের '৪২ সালের বিপ্লব আসন্ন। সেই বিপ্লবে বাংলার নরনারীর সমস্ত শক্তি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যথাসম্ভব জড়িয়ে পড়বে, এই ছিলো সেদিনের সাধনা। প্রথমেই চ'লে গেলাম যশোহর, খুলনা, বরিশাল এবং তাদের কিছু-কিছু গ্রামের ভিতরে। সঙ্গে আছে বীণা। যেখানেই যাই মেয়েদের মধ্যে চঞ্চলতা, কাজের একটা প্রেরণাবোধ, একটা উদ্দীপনা যেন আগে থেকেই তৈরি হ'য়ে আছে। যেন অপেক্ষায় ছিলো একটা সূচনার। আলোচনা চলতে থাকে। রাজী হ'য়ে যায় তারা আনন্দের সঙ্গে কংগ্রেসের কাজ করতে। অনেক জায়গায় গ'ড়ে ওঠে কংগ্রেস মহিলা সাব-কমিটি। কর্মতালিকা প্রস্তুত হয়, তৃপ্তমুখে আমাদের বিদায় দেয় তারা। জেলার বড়ো শহর ছেড়ে চ'লে যেতে হয় গ্রামে। কোথাও যাচ্ছি নৌকায়, স্টীমারে, কোথাও ট্রেনে। কখনো মাইল-মাইল পথ হেঁটে চলা, কখনো প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্য দিয়ে, কখনো ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পূর্ব-বাংলার দিগন্তজোড়া সবুজ মাঠ খেত পার হ'য়ে যাওয়া। সে যে কী আনন্দের চলা, কী মোহ, কী মায়াময় অনুভূতি তার ভাষা নেই।

গ্রামের মধ্যে কোথাও-কোথাও আগে থেকেই ঠিক হ'য়ে আছে

যে আমরা আসছি, অতএব সভা হবে। সভা হবে হয়তো গ্রামের খোলা মাঠে। লোক জ'মে আছে। কিন্তু সভায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেওয়া ভাবতেই ঘেমে উঠি। ওদিকে প্রত্যেকেই উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি মেলে ব'সে আছে সরল প্রতীক্ষায়। চাষীরাই এসেছে বেশি। গান্ধীজীর পরিকল্পিত গ্রামের আদর্শ ছবি এই কৃষকদের মনে আমরা গেঁথে দিতে চাই। বলি সেই কথাই। এরা চেনে গান্ধীজীকে, জানে কংগ্রেসকে, তাই চেনে আমাদেরও। গান্ধীজীকে অথবা কংগ্রেসকে বাদ দিলে এদের কাছে আমরা অর্থহীন, আমাদের কর্ম-পন্থা মূল্যহীন। শুধু ওই দু'টি নামে এরা সব চেনে, সব বোঝে। খাওয়া এবং পরা এই দু'টি বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে গ্রাম। তারই আদর্শ ছবি ভেসে ওঠে সভার সামনে। এই স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম গ'ড়ে তুলতে যে বাধা আনছে সে হচ্ছে বিদেশী শাসন, তাকে প্রতিরোধ করছে কংগ্রেস, সেজন্যই কংগ্রেসের স্বাধীনতা-সংগ্রাম। সেই সংগ্রামকে সকলে মিলে জয়যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে সভা শেষ হয়।

গ্রামে-গ্রামে মেয়েদের নিয়েও সভা বসে, কোথাও ঘরোয়া বৈঠক। সভায় হয় বক্তৃতা, কিন্তু ঘরোয়া বৈঠকে হয় সংগঠন। মেয়েরা হয় সংঘবদ্ধ। বুঝিয়ে বলি গঠনমূলক কাজের কথা। এই-ভাবে ক্ষেত্রপ্রস্তুতির কাজ শুরু হ'লো।

১৯৪১ সাল থেকে কংগ্রেসের মহিলা-বিভাগের সম্পাদিকার কাজ ক'রে যেতে হয়েছে আমাকে ১৯৪৮ সালের অক্টোবর পর্যন্ত। মাঝখানে ১৯৪২ সালের অগস্ট থেকে ১৯৪৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত অবশ্য জেলে কেটেছে। কংগ্রেস তখন বে-আইনী প্রতিষ্ঠান। এই সম্পাদিকা-জীবনে অভিজ্ঞতার যেন আদিঅন্ত নেই। বাইরে যত ঘুরেছি ততই যেন নতুন জগতকে জেনেছি।

একই বাংলা দেশে ভাষার পরিবর্তন ক্রমশঃ পূর্বে ও পশ্চিমে

দূরে-দূরে গিয়ে কতো যে বিচিত্ররূপ গ্রহণ করেছে তা দেখে অবাক লাগতো। ভাষাতত্ত্ববিদ হ'লে এই চলার পথে অনেক রসদই সংগ্রহ ক'রে নিতে পারতাম। যশোহর খুলনার ভাষা কলকাতার থেকে পূর্ববঙ্গের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, বদ্‌লে গেছে, কিন্তু একেবারে পূর্ব-বঙ্গীয় বাঙাল ভাষা সেখানে পুরোপুরি আরম্ভ হয়নি। তখনো মিষ্টি লাগে তাদের ভাষা শুনতে। বরিশালে তো 'করিয়া' 'দেখিয়া'র সঙ্গে সুরের টান শুরু হ'য়ে গেল। বাঙালের জেদ এবং গোঁ কাকে বলে তা এখানে বেশ বোঝা যায়। স্বভাবেরও যেমন তেজ, ভাষারও তেমনি। আবার ময়মনসিং, জামালপুর এবং ময়মনসিং-এর গ্রামে ঢাকার মতো 'খামু', 'যামু', 'কইরা', 'দেইখ্যা' যেমন বলা হয় তেমনি সঙ্গে-সঙ্গে 'আইছিল্' অর্থাৎ এসেছিলো 'আইবাম্‌নে' অর্থাৎ আসবো, 'পকড', 'খাড' অর্থাৎ পকেট, খাট, 'টেহা ফুইসা' অর্থাৎ টাকা-পয়সা ইত্যাদিরও প্রচলন দেখা যায়। এখানে ভাষার টানটা আর-একটু বদ্‌লে গেছে। আবার কুমিল্লা, আগরতলা, নোয়াখালির গ্রামগুলিতে মজার ভাষায় বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালকে মনে ক'রে অতীতকাল ব্যবহার করা হয়। 'করতাম ফারতাম না' অর্থাৎ করতে পারবো না। 'হুইন্যা যাও' অর্থাৎ শুইন্যা যাও বা শুনে যাও। আরো পুবের ভাষা তো আমি বুঝবোই না। নিজে ঢাকার বাঙাল ব'লে আমি এদিকের ভাষা সবই বুঝতাম, ভালোও লাগতো। কিন্তু এ-কথাও সত্য, পূর্ববঙ্গের লোকে যখন ব'সে মিষ্টি ক'রেও গল্প করে তখনো মনে হয় যেন ঝগড়া করছে, লাঠি খাড়া যেন। আর কলকাতা কৃষ্ণনগরের লোকে যদি চেঁচিয়ে ঝগড়াও করে তখনো তা কানে শুনতে কী মিষ্টি লাগে! আমি কান পেতে ওদের মিষ্টি ভাষার ঝগড়া শুনতেও ভালোবাসি।

রামপুরহাট, সিউড়ি, বর্ধমান, কালনায় গিয়ে মনে হ'তো কলকাতার সঙ্গে এ-দিককার ভাষার কিছু অন্য ধরনের পার্থক্য

আছে, যদিও এ-অঞ্চলগুলি পশ্চিমবঙ্গ। রান্নাবান্না, ধরন-ধারণ তো পূর্ববঙ্গের থেকে অনেকটা তফাত। মেদিনীপুরের ভাষাতে যেন একটু উড়িষ্যার ছোঁওয়ার আভাস পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গের মালদহ, কুচবিহার, মাথাভাঙ্গা, জলপাইগুড়ি এবং দিনাজপুরের ও-দিকটার কথা মনে হ'লে প্রথমেই খাবার কথা মনে পড়ে— কী চমৎকার আম এবং চাল! আলিপুর দুয়ারের সেই গভীর রাত্রির নিবিড় জঙ্গল পার হ'য়ে ছুটে যাওয়া ভুলতে পারি না।

সব জায়গার নাম আজ মনেও আসে না, স্বপ্নে-দেখা কাহিনীর মতো আবছা অস্পষ্ট মনে হয়। সারা বাংলায় যখনই যেখানে গেছি, সেখানকার লোকদের গভীর স্নেহমমতার উত্তাপে অভিভূত হয়েছি।

এবার অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। জনসভার চেয়ে ওই সব ঘরোয়া বৈঠকে যেন কাজ হ'তো বেশি। বাইরের জনসভার বক্তৃতায় মাদকতা আছে, নেশা আছে, ক্ষণিক উত্তেজনা আছে, কিন্তু ওতে আমাদের যুগে কাজ কম হয়েছে ব'লে আমার বিশ্বাস। অবশ্য গান্ধীজী, জওহরলাল প্রভৃতির বক্তৃতার কথা বলছি না। আর-একটা কথা চুপি-চুপি বলি, বক্তৃতা দিতে আমি বড়ো নার্ভাস হই। তাই অতি ভয়ে-ভয়ে সভামঞ্চে যখন দাঁড়াতে হ'তো তখন মনে হ'তো, এর চেয়ে বনে-জঙ্গলে পালিয়ে যাই। বক্তৃতা দিতে দাঁড়ানোর অর্থ হচ্ছে যেন কঠিন শাস্তি পেয়ে নিজের কান নিজে ধ'রে এক-পায়ে সর্বসমক্ষে দাঁড়িয়ে থাকা। এত বড়ো শাস্তির পীড়নটা কিন্তু আমি ছাড়া আর কেউ বুঝতো না। যাঁরা বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করেন তাঁরা ভাবেন, আমরা বাইরের লোক এসেছি, কতো গণ্য-মান্য, কতো উঁচুতে আমাদের স্থান। একটা পার্থক্য, একটা বিশেষ উচ্চ স্তরে রেখে আমাদের সঙ্গে তাঁরা ব্যবহার করতেন। কংগ্রেসের কাজ করতে গিয়ে বাইরে ঘুরতে হয়েছে অনেক। সেই চলার মধ্যে আনন্দ আছে, দ্রুতগতির মধ্যে উন্মাদনা আছে, স্থান থেকে

স্থানান্তরে ছুটে যেতে-যেতে গ'ড়ে তুলবার কাজে বিপুল উত্তেজনা আছে, বিচিত্র জগতকে চোখের সামনে নেমে আসতে দেখে বিস্ময় আছে। কিন্তু এর সঙ্গে-সঙ্গে মিশে আছে একটা সর্বাপেক্ষা লজ্জা এবং দুঃখের ব্যাপার। সেটা হচ্ছে ফুলের মালা এবং নাম ধ'রে জয়ধ্বনি। ওই মালা ও জয়ধ্বনি যেন সকল মানুষ থেকে আমাদের বহু দূরে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে, যেন তাঁদের এবং আমাদের মধ্যে বিরাট ব্যবধান। অথচ মনে-মনে জানি, আমরাও তাঁদেরই মতো ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়ে ভালোয়-মন্দয় মিশিয়ে সাধারণ কর্মী। তবে কেন এই ফুলের মালা? কেন এই জয়ধ্বনি? এই দু'টো জিনিস মানুষে-মানুষে যে-পার্থক্য আনে সেটা রাজনৈতিক কর্মীদের আদর্শে না থাকাই বোধ হয় মঙ্গল। এর থেকেই কর্মীরা নাম-যশের কাঙাল হ'য়ে উঠতে পারেন হয়তো। কর্মীর প্রতি কর্মীর সম্মান যদি দিতে হয় তা থাকুক মনে এবং কাজের মধ্যে থাক তার পরিচয়।

ঘরোয়া বৈঠকে আমি বেশি সুবিধা পেতাম। মনের কথাটি বুঝিয়ে ব'লে কর্মপন্থা স্থির ক'রে কাজের ধারা আরম্ভ ক'রে আসা, সেইটুকুতেই যেন সার্থকতা। তার থেকেই গ'ড়ে ওঠে অন্তরের প্রীতি ও স্নেহের সম্পর্ক, কাজ সহজে এগোয়। উৎসাহদীপ্ত মুখগুলি যখন আনন্দে সাড়া দিয়ে কথা কইতে থাকে তখন অনুভব করি, আমাদের এই যাওয়া এবং সম্পর্ক স্থাপন করা কতো প্রয়োজনীয় ছিলো।

গ্রামের মেয়েদের মধ্যে কাজ করতে-করতে কতো কথাই যে অনুভব করতে হয়। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও স্বাস্থ্যের দৈন্য এবং দারিদ্র্য তো সেখানে প্রতিনিয়তই জাগ্রত হ'য়ে আছে। শুধু তাই নয়, বিধবাদের করুণ দৃশ্য দেখে চোখে জল রাখা যায় না। সেটা ছিলো আষাঢ় মাস। যশোহরের একটা গণ্ডগ্রাম। সঙ্গে আছে সুরেশদা-র মেয়ে কুন্তল দাস। গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে গল্প করছি। বোধ হয় অম্বুবাচীর তৃতীয় দিন সেটা। একটি বিধবা ছেলেমানুষ মেয়ে

ভালো ক'রে কথা বলতে পারছে না, এতই তার শরীর খারাপ লাগছে। শুধু আম কাঁঠাল আর ফল মিষ্টি খেতে সে পারে না। তার ফলে তিন দিনই কাটছে তার প্রায় না-খেয়ে। আগুনে ছোঁওয়া জিনিস অম্বুবাচীতে বিধবাদের খেতে নেই। কাঁচা ফল দুধ খেতে হয়। সবাই তো তাতে আর অভ্যস্ত নয়। বাঙালীর ডাল-ভাতের মুখে মাছের স্বাদের সঙ্গে যেমন সব ফল এবং মিষ্টিই অমৃত মনে হয়, উপবাসী বিধবাদের কিন্তু অনেক সময়ই সেগুলি দেখলে বমি আসে। অথচ বলার উপায় নেই! বিধবাটির করুণ মুখখানি দেখে কিশোরী মেয়ে কুন্তলের মুখখানাও ম্লান হ'য়ে যায়।

সেই বিধবা মেয়েটি শুধু একটি প্রতিনিধিমাত্র। বাংলার ঘরে-ঘরে বিধবাদের যে দুঃখ তার আদিঅন্ত নেই। এতকালের খাওয়ার অভ্যাস তাদের একদিনে চিরতরে শেষ হ'য়ে যায়, পোশাক তাদের বিভীষিকা আনে, অলংকারকে করতে হয় বিষবৎ পরিত্যাজ্য। কিন্তু কেন? একদিন মনুর শাস্ত্র মেয়েদের বেলায় এ-সব নিষিদ্ধ ক'রে দিয়েছিলো। তখনকার কারণ জানি না। কিন্তু বর্তমানে কি এর কিছু সার্থকতা আছে? গ্রামের মেয়েরা একে তো লেখাপড়া জানে না, তাদের মনের স্বাভাবিক গতিকে ঊর্ধ্বে টেনে তুলবার জন্য নেই শিক্ষা, নেই অনুকূল পরিবেশ, নেই কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা। অথচ আছে সংস্কার, আছে সমাজের পীড়নের ভয়। সামনে প'ড়ে আছে দীর্ঘজীবন। ফলে সমাজে কতো যে হীন কাজ অন্ধকারে লুকিয়ে হ'য়ে যাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই।

যশোহরের গ্রামের বিধবা মেয়েটির করুণ মুখখানির দিকে তাকিয়ে ভেবেছি, আমাদের দেশ যদি কখনো স্বাধীন হয় তবে আমরা এমন ব্যবস্থা করবো এবং এমন আবহাওয়া সৃষ্টি করবো, যাতে আমাদের বিধবাদের এই অসহ্য পীড়ন ঘুচে গিয়ে তাঁদের মুখে প্রসন্নতা ফুটে উঠবে। পুরুষের যেমন স্ত্রীর মৃত্যুতে শোক দুঃখ

থাকে, মেয়েদেরও ঠিক তেমনি। শোকের দুঃখ তো ভুলবার নয়। চিরজীবনের জন্যই তো সে সঙ্গীহারা হ'য়ে গেছে। সেটা কি উপবাস করানো, পোশাক ছাড়ানোর মতো বাইরের পীড়ন দিয়ে ঢাকা যায়? ভোলা যায়? নেভানো যায়? মনের দুঃখ তারা নিঃশব্দে নিজের মনেই বহন করবে। কিন্তু যারা ভুলতে পারে এবং অন্য জীবন নতুন ক'রে আরম্ভ করতে চাইবে, তাদের জন্যও খোলা থাকবে স্বাভাবিক পথ। অনাবশ্যক পীড়ন থেকে মুক্ত হ'য়ে নারী সেদিন জীবনীশক্তি ফিরে পাবে।

এমনি ক'রে যখনই গ্রামে-গ্রামে ঘুরতে গিয়ে নানা সমস্যা জটিল হ'য়ে চোখের সামনে ফুটে উঠেছে, তখনই স্বাধীন ভারতে সেগুলির প্রতিকারের অনিবার্যতা অনুভব করেছি এবং সঙ্গে-সঙ্গে একটা মস্ত তালিকা মনে-মনে স্থির হ'য়ে গেছে।

১৯৪২ সালের প্রথম থেকে এবং তার কিছু আগে থেকেও জাপানীরা বর্মায় নানাস্থানে বোমা ফেলতে লাগলো। রেঙ্গুন ধ্বংস হ'য়ে যাচ্ছিলো। কাতারে-কাতারে ভারতীয়রা বর্মা ত্যাগ ক'রে চ'লে আসতে শুরু করলো। কলকাতায় আউটরাম ঘাটে জাহাজ এলে হাজার-হাজার মানুষের বন্যা নেমে আসে, ডক কেঁপে ওঠে। ভারতবর্ষের যত প্রদেশ ও জাতি আছে সবই যেন উপস্থিত সেখানে— মাদ্রাজী, ওড়িয়া, নেপালী, বিহারী, পাঞ্জাবী, মধ্যপ্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশবাসী, বাঙালী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষা ও পোশাকের লোক এরা। চট্টগ্রাম হ'য়ে বহুলোক ট্রেনে চ'লে এসেছে। আবার প্রোম ও মণিপুর পার হ'য়ে শত-শত নরনারী হাঁটাপথে এসে কোনো-প্রকারে পৌঁছেচে। ভীত, আর্ত অতিথিকে কলকাতাবাসী যথাসাধ্য সেবা ও পরিচর্যা ক'রে স্ব-স্ব স্থানে পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করেছিলেন।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা যেতাম dock-এ যেখানে জাহাজ এসে ভিড়তো। হাজার-হাজার লোক নেমে আসছে জাহাজ থেকে, বাইরের বাতাস পেয়ে তারা বুক ভ'রে এক-একটা নিশ্বাস নিচ্ছে। জাহাজে যত লোক ধরে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি লোক ঠাসাঠাসি গাদাগাদি ক'রে গুদামঠাসা হ'য়ে এসে পৌঁছেচে। কারো কলেরা, কারো বসন্ত, উদরাময়, জ্বর ইত্যাদি নানা রোগে এবং গরমে আধমরা হ'য়ে ভয়বিহ্বল অগণিত নরনারী ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েছে। Dock-এর আশেপাশে হয়েছে তাদের সাময়িক থাকবার ব্যবস্থা।

গঙ্গার ধারে বাবুঘাট ধর্মশালা। দূর থেকে দেখা যায় সহস্র-সহস্র বিপন্ন মানুষ রয়েছে সেখানে। উদ্‌বিগ্ন চিত্তে তারা অপেক্ষা করছে স্থানান্তরে যাবার প্রত্যাশায়। ফুটপাথ থেকে আরম্ভ ক'রে জনতার ভিড় চ'লে গেছে ধর্মশালার ভিতরে, একতলায়, দোতলায়—কোথাও তিলার্ধ স্থান বাকি নেই। মারোয়াড়ী রিলিফ সোসাইটি তাদের অকাতরে খেতে দিয়ে চলেছেন। শুধু তাঁরা নন, সোশিয়ালিস্ট পার্টি, নববিধান সমাজ, গুজরাটি অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি কতো পরিচিত অপরিচিত রিলিফ-প্রতিষ্ঠান সেখানে অক্লান্ত কর্তব্য ক'রে চলেছেন। কংগ্রেসকর্মীদের তো কথাই নেই, প্রাণপণ পরিশ্রম ক'রে তাদের শুশ্রূষা ও তত্ত্বাবধান করছেন তাঁরা। কংগ্রেসের মেয়েরাও নেমে পড়েছেন দলে-দলে। সকলের মুখেই সেবা, কর্তব্য ও মানবতার একটা উদার ছাপ, চারিদিকের হাওয়াটা স্নেহকোমল কিন্তু উদ্‌গ্রীব।

এই নাকি যুদ্ধ? যত লোক হাঁটাপথে দুর্গম গিরিকান্তার পার হ'য়ে এসেছে, তাদের মধ্যে অনেক পরিবার প্রায় নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে। অনেকে যাত্রার দিনে সপরিবারেই রওনা হয়েছিলো, কিন্তু রাস্তার নিদারুণ কষ্টে কেউ সন্তান, কেউ স্ত্রী, শিশু হারিয়ে অবশেষে দু-একজন এ-দেশে এসে পৌঁছেচে। যুদ্ধের ফলে কী ভাবে একটা

দেশ ধ্বংস হ'য়ে যেতে পারে তার ছবি দেখতে থাকি। বর্মায় যখন বোমা পড়ছে সে-কাহিনী তারা ব'লে যায়। শিশুগুলি অসহায়-ভাবে ম'রে যাচ্ছে, স্বামীরা, ভাইয়েরা রাস্তাঘাটে কর্মক্ষেত্রে জীবন্ত বলি হ'য়ে যাচ্ছে বা পঙ্গু হ'য়ে যাচ্ছে, মেয়েরাও তাই। রাস্তাঘাট, দালান কোঠাগুলি মানুষই তৈরি করেছিলো, মানুষেই ধ্বংস করছে আজ। যুদ্ধের বীভৎসতার একটা পরিষ্কার চিত্র এদের চোখে-মুখে দেখতে থাকি। মনে করি, আমাদের দেশে যদি যুদ্ধ বাধে আর এইরকম ধ্বংস হ'তে থাকে, তখন অসহায় নাগরিকেরা হয়তো এদেরই মতো কাতরভাবে ছুটোছুটি করতে থাকবে এবং কাতারে-কাতারে শেষ হ'য়ে যেতে থাকবে। কিন্তু এমন নৃশংস যুদ্ধ কি করতেই হবে? কেন?

মানুষ বলে তারা সভ্যতা আনতে চায়, মানুষকে বাঁচাতে চায়, তার ভালো করতে চায়। কিন্তু যে-সভ্যতা আনতে গিয়ে এমন অসভ্যের মতো নৃশংস হ'তে হয় সে কেমন সভ্যতা? মনে ভাবি, মানুষ কি তবে আজ অবধি কিছুমাত্র সভ্য হয়নি? শুধু মস্তিষ্ক আছে ব'লে বিজ্ঞান উন্নত হচ্ছে এবং বিজ্ঞান উন্নত হচ্ছে ব'লে ধ্বংসের বীভৎসতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। মনুষ্য-ধ্বংসেই কি এর পরিসমাপ্তি? মানুষের মস্তিষ্ক কি তবে মনুষ্যজাতির নাশের জন্যই বীজ নিয়ে এসেছিলো? কী জানি মানুষের ভবিষ্যৎ কেমনতরো!

চোখের সামনে সেদিন রেঙ্গুন ধ্বংসের একটা সামান্য ছবি মনটাকে তোলপাড় ক'রে তুলেছিলো। হায় রে! তখন কি জানি দেখা বাকি প'ড়ে আছে— কলকাতার দাঙ্গা, নোয়াখালির নৃশংসতা, ভারত-বিচ্ছেদের সময়কার হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা এবং তার ভীষণ পরিণাম! আজও তার জের শেষ হয়নি। ওদিকে তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সম্ভাব্যতা ভয় দেখাচ্ছে। চলছে অ্যাটম্ বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা তৈরির প্রতিযোগিতা। সেই দৈত্যই কি পৃথিবীকে ভস্মে

পরিণত করবে ? এ-কথা ভাবতে মন শিউরে ওঠে। এই নির্মমতার, নিষ্ঠুরতার শেষ কোথায় ?

না, না, এর উর্ধ্বে মানুষকে উঠতেই হবে। এমন একদিন নিশ্চয় আসবে যখন মানুষ নিজের স্বার্থের জন্য অন্যের গলা টিপে ধরবে না, নিজের আধিপত্য এবং প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য অন্যের উপবাস সৃষ্টি করবে না, নিজের বিলাস ঐশ্বর্য ভ'রে তুলবার জন্য অপরের হাওয়া বিষাক্ত ক'রে তুলবে না। বরং একে অন্যের মঙ্গল কামনা ক'রে মানুষ নির্ভয়ে পাশাপাশি বাস করবে। সকলের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হবে এমন পরিস্থিতি মানুষকেই সৃষ্টি করতে হবে। আছে মানুষের মনে শুভবুদ্ধি, কল্যাণের প্রতিমূর্তি সে। সেই অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্ব একদিন জেগে উঠবে বৈকি। সেদিন মানব-সভ্যতার অন্তরে ব'সে স্নিগ্ধ সৌম্য হাসি হেসে উঠবেন— বুদ্ধ, যীশু, গান্ধী।

॥ আঠারো ॥

১৯৪২ সাল। সমগ্র ভারতবর্ষ মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় অসহিষ্ণু। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম আর রোধ ক'রে রাখা যাবে না। যে-উদ্দেশ্য সামনে রেখে গান্ধীজী ১৯৩৯ সাল থেকে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করছিলেন, সেই পরিস্থিতি আজ এসে গেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবার সঙ্গে-সঙ্গে ১৯৩৯ সাল থেকেই কতকগুলি বামপন্থী দল ক্ষমতা দখল করার শ্লোগান দিচ্ছিলেন। তাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গান্ধীজীকে চাপ দিচ্ছিলেন তখনই সংগ্রাম আরম্ভ করবার জন্য। অথচ জনসাধারণকে তখনো সেজন্য প্রস্তুত করা হয়নি। কারণ, যুদ্ধের প্রথম দিকে জনসাধারণের উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যের ছিলো অত্যন্ত চাহিদা। তাই তারা অতিরিক্ত মূল্য পেয়ে তখন সন্তুষ্টই ছিলো। গান্ধীজী জানতেন গণসংগ্রাম সম্ভব হয় ব্যাপক ক্ষুধার সৃষ্টি হ'তে থাকলে এবং জনসাধারণের অসন্তুষ্টি চরমে উঠলে। কাজেই গণসংগ্রামের সময় তখনো আসেনি।

রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করবার উদ্দেশ্য নিয়ে গান্ধীজী ১৯৪০ সালে গ্রামে-গ্রামে কেন্দ্র প্রস্তুত করতে লাগলেন। আরম্ভ হ'য়ে গেল ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন। এই আন্দোলনের ভিতর দিয়ে গণসংযোগ করতে চেয়েছিলেন তিনি। গণসংগ্রামের ক্ষেত্র-প্রস্তুতির জন্য গণনেতৃত্ব তিনি সঙ্গে-সঙ্গেই তৈরি করছিলেন। সত্যাগ্রহীরা গ্রামের-পর-গ্রামকে এই কথাই জানিয়ে যাচ্ছিলেন যে, এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে একটি পয়সা বা একটি লোক দিয়েও সাহায্য করবে না। এইভাবে বিদেশী সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি ক'রে দেশকে শেষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করতে চেয়েছিলেন গান্ধীজী। তাই এটা ছিলো সংগ্রামের ক্ষেত্র-প্রস্তুতির জন্য সত্যাগ্রহের আহ্বান।

বিনোবা ভাবে ছিলেন প্রথম সত্যাগ্রহী। তারপর ওয়ার্কিং কমিটি, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্যগণ এবং মন্ত্রী ও ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ একে-একে সকলেই সত্যাগ্রহ ক'রে দেশটাকে চঞ্চল ক'রে তুলতে-তুলতে গ্রেপ্তার হ'তে লাগলেন। শুধু গান্ধীজী রইলেন মুক্ত। প্রায় ত্রিশ হাজার সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার হ'য়ে গেলেন। বাংলাদেশের কংগ্রেস-সভাপতি সুরেন্দ্র-মোহন ঘোষও সেই গণসংযোগের ভিত্তি গঠন করতে গিয়ে কারার অন্তরালে চ'লে গেলেন। গ্রেপ্তার ও অত্যাচার বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে দেশ চঞ্চল হ'য়ে উঠতে লাগলো। গান্ধীজী আন্দোলনের অগ্রগতি লক্ষ্য ক'রে চললেন।

১৯৪২ সালে পণ্যদ্রব্যের মূল্য ক'মে যাবার ফলে জনগণের অসন্তুষ্টি আরম্ভ হ'য়ে গেল। এপ্রিল মাসে স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ নতুন সনদ হাতে নিয়ে উপস্থিত হলেন। গান্ধীজীর সঙ্গে ক্রিপ্‌সের আলোচনা চলতে থাকলো। সব দিক থেকে গান্ধীজী সনদটিকে বিচার ক'রে দেখতে লাগলেন। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এতদিন যে-কথা বলেছিলো, ক্রিপ্‌স্‌ও তার পুনরুক্তি ক'রে বললেন, 'জাপানকে আটকাও।' দেশের অনেক লোক তখন এই জাপানী আক্রমণকেই রুখে যাওয়া প্রধান কর্তব্য ব'লে প্রচার শুরু ক'রে দিয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী মনে করতেন, পরাধীন দেশের পক্ষে দুই সাম্রাজ্য-বাদীই সমান। তিনি বলতেন, 'যে-শক্তি দিয়ে আমরা দেশকে স্বাধীন করতে পারবো সেই শক্তি অন্য বিদেশী আক্রমণকারীকেও রুখতে পারবে। আমরা ব্রিটিশ এবং জাপান দু-জনকেই আটকাতে চাই। দেশ যদি একবার স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামশক্তি অর্জন করতে পারে তবে তখন আর তাকে আর-একটা বিদেশী জাতি অধীন করতে পারে না। পক্ষান্তরে ইংরেজের অধীনে থেকে এতকালের একটা আড়ষ্ট জাতি কোনো আক্রমণকারীকে রুখতে

পারে না। সেজন্যই আমাদের সর্বাগ্রে প্রয়োজন স্বাধীনতা অর্জন করবার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।'

ক্রিপ্‌স্‌-সনদের অন্যান্য দিকগুলি গান্ধীজী বিচার ক'রে দেখতে লাগলেন। সনদে অনেক মধুর কথাই ছিলো। ছিলো না কিন্তু দেশের জনগণের স্বাধীনতার কোনো উল্লেখ, ছিলো না ভারতবাসীর দেশরক্ষার অধিকার, সকল দল একত্র হ'য়ে দাবি করলেও নয়। সব দেখে-শুনে তদানীন্তন কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্ট মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বললেন, 'এর ভিতর স্বাধীনতার কথা কোথায়?' গান্ধীজী নাকি ক্রিপ্‌স্‌-সাহেবকে বলেছিলেন, 'এই যদি তোমার প্রস্তাব হয় তবে পরের প্লেনে বাড়ি যেতে পারো।'

ক্রিপ্‌স্‌-প্রস্তাব ব্যর্থ হবার পর গান্ধীজী ইংরেজকে কেবলি বলতে লাগলেন, 'কুইট ইণ্ডিয়া— ভারত ছেড়ে চ'লে যাও।' তাঁর লেখায়, বক্তৃতায়, আলোচনায় তিনি 'কুইট ইণ্ডিয়া' প্রচার করতে লাগলেন। দেশে ইংরেজ-বিদ্বেষ চরম তীব্রতায় পৌঁছালো। মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত—সকলের মধ্যেই গভীর উত্তেজনা দেখা দিলো। ওদিকে রপ্তানী ক'মে যাওয়ার ফলে জিনিসপত্রের দাম ক'মে গেল। জন-সাধারণের মধ্যে অসন্তুষ্টি বাড়তে লাগলো। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো তখন ভেঙে পড়ছে।

সর্বত্র এই ক্রমবর্ধমান অসন্তুষ্টিকে গান্ধীজী কাজে লাগাতে চেষ্টা করতে লাগলেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করাই ছিলো তখন তাঁর উদ্দেশ্য।

১৯৪২ সালে গান্ধীজী এবং বিপ্লবী উভয়েরই লক্ষ্য একটি কেন্দ্রে এসে পৌঁছেচে। সেটা হ'লো ইংরেজের হাত থেকে ক্ষমতা দখল করা। জনসাধারণই সেই ক্ষমতা দখল করবে। এখন বিপ্লবী সকলেই, কংগ্রেস নিজেই বিপ্লবী। বিপ্লবীরা তো তিন বছর পূর্বেই নিজেদের

বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান ভেঙে দিয়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন কংগ্রেসকে ক্ষমতা দখলের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে।

১৯৪২ সালের অগস্ট মাস। উদ্বেলিত জনসাধারণকে আর আটকে রাখা যাচ্ছে না। সংগ্রামের ক্ষেত্র তখন পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত, দেরি করলে সময় ব'য়ে যাবে, ক্ষেত্র নষ্ট হ'য়ে যাবে। ৮ অগস্ট বোম্বাইতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসলো। সহজ ছোট্টো ভাষায় গান্ধীজীর প্রস্তাব পাস হ'লো— 'কুইট ইণ্ডিয়া— ভারত ছাড়ো।' প্রস্তাবে আরো ছিলো যে, গত কুড়ি বছর ধ'রে সংগ্রাম ক'রে দেশ যে-শক্তি অর্জন করেছে, সেই সমস্ত শক্তি নিয়ে সে আজ শেষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অধিকার-লাভের জন্য গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস এখনই সংগ্রাম আরম্ভ করবে। সব রকম দুঃখ ও ত্যাগ স্বীকারের জন্য দেশকে প্রস্তুত থাকতে তাঁরা আবেদন করলেন। আরো বললেন, হয়তো এমন এক সময় আসবে যখন জনগণকে নির্দেশ দেবার সুবিধা থাকবে না। তখন সংগ্রামরত প্রতিটি নরনারী নিজেই নিজের নেতৃত্ব ক'রে সংগ্রাম পরিচালিত ক'রে যাবে। এবারে স্বাধীনতা-অর্জন করতেই হবে।

তারপর গান্ধীজী কথা বললেন, 'আজ যদি সমগ্র বিশ্ব, এমন কি সারা ভারতবর্ষও আমাকে ফিরে যেতে বলে তবুও আমি এগিয়ে চলবোই। কংগ্রেস সংগ্রামের সংকল্প গ্রহণ করেছে। আমি এবং কংগ্রেস আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, Congress will do or die— করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।'

'কুইট ইণ্ডিয়া' প্রস্তাব পাসের পরদিনই ৯ অগস্ট প্রত্যুষে দেখা গেল ব্রিটিশসিংহ বেঁকে দাঁড়িয়েছে কংগ্রেসের সংকল্পের বিরুদ্ধে। ব্রিটিশসিংহের সেই চ্যালেঞ্জ কংগ্রেস গ্রহণ করলো। গান্ধীজী এবং অন্য সমস্ত নেতা গ্রেপ্তার হ'য়ে গেলেন। নেতাদের গ্রেপ্তারের সঙ্গে-

সঙ্গে জাতি যেন খেপে উঠলো। ঠিক বিদ্যুৎপ্রবাহের মতো সমস্ত দেশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনের অগ্নিশিখা ছড়িয়ে পড়লো। হাল ধরতে সেদিন নেতার প্রয়োজন হয়নি। সবাই নিজেই নিজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে। গান্ধীজী বলেছেন, 'কুইট ইণ্ডিয়া', সমগ্র জাতিও পণ করেছে ইংরেজকে 'কুইট ইণ্ডিয়া' করিয়েই ছাড়বে। গান্ধীজী ব'লে গেছেন, 'Do or die.' আমরা পেয়েছি তার অনুলিপি। এবং পেলাম একটা বিরাট প্রোগ্রাম। সেই প্রোগ্রামে রয়েছে থানা দখল ক'রে রাষ্ট্রশক্তি করায়ত্ত করার ধারা।

Do or die, করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে— এই কথাটি জাতির মর্মে-মর্মে গেঁথে বসলো। মরতে তারা প্রস্তুত। গান্ধীজীর অনারব্ধ কাজ তারা আপন অস্থি দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে সম্পূর্ণ ক'রে যাবে। তাদের দেহের ধ্বংসস্তূপের উপরে গ'ড়ে উঠবে স্বাধীন ভারতের শুভ্র সৌধ। আরম্ভ হ'য়ে গেল গণসংগ্রাম। আমরা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তার নির্যাতনের চাকা নির্মমভাবে চালিয়ে দিলো। কংগ্রেসকে ঘোষণা করলো বে-আইনী প্রতিষ্ঠান। সভা-সমিতি নিষিদ্ধ। সংবাদপত্রের কণ্ঠ রুদ্ধ হ'লো। সমস্ত সংবাদ চেপে দেওয়া হ'তে লাগলো। বেপরোয়াভাবে চলতে লাগলো লাঠিচার্জ, গুলি। এলো মিলিটারি। শুরু হ'লো তাদের গুলি-বৃষ্টি। মেশিনগান, হাওয়াই জাহাজ থেকেও গুলি চললো। কোথায় লাগে মধ্যযুগের টাইমুর লঙ অথবা চেঙ্গিস খাঁর বর্বরতা!

ওদিকে ক্ষিপ্ত জনগণ রেললাইন উপড়ে ফেলতে লাগলো, স্টেশন পুড়িয়ে দিতে লাগলো, পোস্টআপিস জ্বালিয়ে দিলো, গভর্নমেণ্টের শস্যের গুদাম ও গোলা লুঠ করলো, টেলিগ্রাফের তার, ট্রামের তার কেটে দিতে লাগলো। যুদ্ধের জন্য যা-কিছু প্রয়োজনীয় যানবাহন সবই নষ্ট ক'রে ফেলতে লাগলো। শাসন-যন্ত্রের শিরা-উপশিরাগুলিকে

ছিন্নবিচ্ছিন্ন ক'রে দিচ্ছিলো তারা। গভর্নমেণ্টকে অচল ক'রে তোলাই তাদের উদ্দেশ্য। ওদিকে কৃষকেরা জমিদারের কাছারি পুড়িয়ে দিচ্ছে। ছাত্রগণ স্কুল-কলেজে পিকেটিং করছে। আমেদা-বাদের মিল বন্ধ হ'য়ে গেছে। টাটা ইস্পাতের কারখানার কুড়ি হাজার শ্রমিক নিয়ে সমস্ত কর্মী ধর্মঘট শুরু করেছে। এবার তো জেলে যাবার আন্দোলন নয়, এবার চলছে ক্ষমতা-দখলের লড়াই। গণশক্তি উদ্বুদ্ধ।

ওদিকে সাতারা, বালিয়া এবং বাংলাদেশে মেদিনীপুর জেলায় চলেছে ক্ষমতা দখল ক'রে পাশাপাশি স্বাধীন গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করবার সংগ্রাম।

মেদিনীপুরে তমলুক, মহিষাদল, সুতাহাটা ও নন্দীগ্রাম থানাকে তারা স্বাধীন ঘোষণা করেছে। মহিষাদল থানার সামনে যখন কুড়ি হাজার লোক এই ঘোষণা করলো, তখন তমলুকের S. D. O. অর্থাৎ মহকুমা হাকিম কনেস্টবলদের আদেশ দিলেন চারজন বক্তাকে গ্রেপ্তার করতে। জনতা রুখে দাঁড়ালো। S. D. O. লাঠিচার্জ করবার হুকুম দিলেন। কনেস্টবলরা লাঠিচার্জ করতে অস্বীকার করলো। নিরুপায় অফিসার সদলবলে পলায়ন ক'রে বাঁচলেন।

মেদিনীপুরের সংগ্রাম গভীরতর হ'য়ে উঠতে লাগলো। সেখানকার থানা, কোর্ট এবং অন্যান্য সরকারী কেন্দ্রগুলির উপর আক্রমণ করবার তারিখ স্থির হ'লো ২৯ সেপ্টেম্বর। ২৮ তারিখে সাতাশ মাইল টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন লাইন কেটে নষ্ট ক'রে দেওয়া হ'লো। খেয়া পারাপারের নৌকোগুলো ডুবিয়ে দেওয়া হ'লো।

তারপর ২৯ সেপ্টেম্বর তমলুক, মহিষাদল, সুতাহাটা এবং নন্দীগ্রাম থানা আক্রমণ করা হ'লো। আরম্ভ হ'লো সাতদিন ব্যাপী অবিরাম সম্মুখসংগ্রাম।

তমলুক থানা অধিকার করবার জন্য আট হাজার বিদ্রোহী অকুতোভয়ে এগিয়ে চলেছেন। শহরকে তখন গভর্নমেণ্ট দুর্গের মতো সুরক্ষিত ক'রে রেখেছে। শুরু হ'লো প্রচণ্ড লাঠিচার্জ, কিন্তু জনগণ নির্ভীক, দৃঢ়। গভর্নমেণ্ট আদেশ দিলো, গুলি চালাও। গুলির বৃষ্টি চলতে লাগলো। নিরস্ত্র জনতা তার সামনে টিকতে পারলো না। আহত রামচন্দ্র বেরাকে তাঁর বন্ধুদের হাত থেকে হঠাৎ সরকারী সৈন্যরা ছিনিয়ে নিয়ে গেল। রামচন্দ্রের ক্ষত থেকে রক্তের ফোয়ারা ছুটেছে। তাকে থানার সামনে ফেলে রেখে সৈন্যরা চ'লে গেল। রামচন্দ্র হঠাৎ এক-সময়ে জ্ঞান ফিরে পেলেন। নিজের ক্ষতবিক্ষত দেহের বেদনা তিনি ভুলে গেলেন। বুলেটবিদ্ধ ঝাঁঝরা-করা দেহটাকে কোনোমতে টানতে-টানতে তিনি থানার দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এলেন। অমনি জয়োল্লাসে রামচন্দ্র চিৎকার ক'রে ব'লে উঠলেন, 'এই যে আমি থানায় পৌঁছে গেছি, থানা দখল করা হ'য়ে গেছে।' তাঁর অন্তিম নিশ্বাস জয়ের আনন্দে সার্থক হ'য়ে উঠলো।

শহরের আর-একদিক থেকে আসছে আর-একটি বিপুল বাহিনী। তার নেত্রীত্ব করছেন মাতঙ্গিনী হাজরা। তিয়াত্তর বর্ষীয়া বৃদ্ধা থানা দখল করতে চলেছেন। ইংরেজ গুলিবর্ষণ করতে লাগলো। একে-একে মাতঙ্গিনী হাজরার দু-খানা হাতই গুলিবিদ্ধ হ'য়ে গেল। কিন্তু তখনো দৃঢ়মুষ্টিতে উঁচু ক'রে ধরা আছে কংগ্রেসের জাতীয় পতাকা, তখনো এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি। ভারতীয় সৈন্যদের আহ্বান ক'রে ব'লে চলেছেন তিনি, 'ভাইয়ের বুকে গুলি চালিও না, দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদান করো।' তার উত্তরে আর-একটি গুলি এসে তাঁর ক্ষীণ দেহটিকে ধরাশায়ী ক'রে দিলো। রক্তাপ্লুত দেহের সেই প্রাণহীন হাতে তখনো উঁচু হ'য়ে উড়ছে জাতীয় পতাকা।

এইভাবে চলেছিলো সেদিন ক্ষমতা দখল করার সংগ্রাম তমলুক, মহিষাদল, সুতাহাটা ও নন্দীগ্রামে। তারপর মেদিনীপুরের কংগ্রেস

কর্মীগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার গঠন করবার।

১৯৪২ সালের ১৭ ডিসেম্বর মেদিনীপুর কংগ্রেস কমিটি একজন সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত ক'রে দিলেন। বরিশাল শঙ্কর মঠের স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের শিষ্য সতীশ সামন্ত ছিলেন প্রথম সর্বাধিনায়ক। তিনিই ছিলেন যুদ্ধমন্ত্রী। এই জাতীয় সরকারের অধীনে ও পরিচালনায় ১৯৪৩ সালের ২৬ জানুয়ারি তমলুক, মহিষাদল, সুতাহাটা ও নন্দীগ্রামে চারটি থানায় চারটি জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের অধীনে এক-একটি বিদ্যুৎবাহিনী অর্থাৎ জাতীয় সেনাবাহিনী গঠিত হয়। এই জাতীয় সরকারের ছিলো সংগ্রাম-বিভাগ, গুপ্তচর-বিভাগ, অ্যাম্বুলেন্স-বিভাগ। কয়েকদিন পরে খোলা হয় Guerilla Detachment, Sisters' Army, Law and Order. এই আইন-শৃঙ্খলা-বিভাগটি চোর ডাকাত ইত্যাদি গ্রেপ্তার করতো, তাদের বিচার হ'তো। দেওয়ানী, ফৌজদারি দুই রকম বিচারই চলতো।

প্রায় দু-বছর ধ'রে এই স্বাধীন জাতীয় গভর্নমেণ্ট ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থেকে অতি দক্ষতার সঙ্গে কার্য-পরিচালনা ক'রে গেছে। সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী অমনিতরো জাতীয় সরকার গঠন করাই ছিলো বিদ্রোহী ভারতের পরিকল্পনা।

এইভাবে বাংলার পশ্চিমপ্রান্তে মেদিনীপুরে রইলো জাতীয় সরকার, ওদিকে পূর্বপ্রান্তে আসামের সীমান্তে এগিয়ে আসছে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ। যে-কোনো সময়ে তারাও বাংলাদেশে এসে পড়তে পারে। তার ফলে সমস্ত বাংলায় একটা বিদ্রোহী জাতীয় সরকার গ'ড়ে উঠতে পারে। এই সম্ভাবনাকে রোধ করতে ও জাপানকে আটকাতে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গব্যাপী একটা man made famine অর্থাৎ মানুষের নিজের হাতে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ এনে ফেললো ইংরেজ ১৯৪৩ সালে। সে-কথা আসবে আরো পরে।

কিন্তু ১৯৪২ সালে সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী তখন চলেছিলো ব্রিটিশ রাজশক্তিকে ধ্বংস করবার জন্য অগস্ট-বিপ্লব। দেশ সেদিন বেপরোয়া, মরিয়া। বিদ্রোহী ভারতের এই রূপ ইংরেজকে স্তম্ভিত ক'রে দিলো। তারাও বুঝে নিলো জাতীয় চেতনার এই দুর্নিবার শক্তির সামনে তাদের দুই শত বছরের শাসনের কাঠামো ক্ষ'য়ে ধ্ব'সে যাচ্ছে। সর্বত্র ঘটছে অরাজকতা। কর্মীরা কাতারে-কাতারে কেবলি এগিয়ে যাচ্ছে। ভারতবর্ষে যত জেল ছিলো, তার সংখ্যা বাড়লো, সবগুলির দরজা খুলে দিয়েও ইংরেজ সামলে উঠতে পারছে না। সমগ্র ভারতবর্ষই সেদিন বিরাট কারাগার। বিশাল রণক্ষেত্রে চলেছে তারই মুক্তিসংগ্রাম।

১৯৪২ সালের জাতীয় সংগ্রাম সেদিন সমুদ্রের ওপারে অঙ্গুলি-সংকেত ক'রে ইংরেজকে পথ দেখিয়ে দিচ্ছিলো— 'কুইট ইণ্ডিয়া।' এই ছিলো সেদিন কংগ্রেসের সাধনা, এই ছিলো গান্ধীজীর মন্ত্র।

॥ উনিশ ॥

আবার সেই হাজার-হাজার বন্দী, রাজবন্দী জেলখানা পরিপূর্ণ ক'রে ফেলতে লাগলো। ২৭ অগস্ট (১৯৪২) আমাদের বাড়িতে আবার এলো পুলিস, চালালো তল্লাসী। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দেখিয়ে আবার আমাকে নিয়ে চললো প্রেসিডেন্সি জেলে। লোহার দরজাটা তেমনি ঝনাৎ ক'রে খুলে আমন্ত্রণ ক'রে নিলো পুরাতন সেই বন্দীকে নতুন ক'রে। পরিচিত সেই বটগাছটা আজও সকল দুঃখের সঙ্গী হ'য়ে, সকল বেদনার সমব্যথী হ'য়ে বন্দীদের দিকে তাকিয়ে আছে।

আবার সেই জানানা ফাটক। রাজার অতিথি হ'য়ে অনেক মেয়ে-বন্দী সেখানে আগেই এসেছেন। ফাটকের দরজাটার দিকে কেবলি তাঁদের দৃষ্টি আবদ্ধ থাকে, আরো কতো বন্দী আসে। আমিও ঝাঁকের কৈ ঝাঁকে মিশে গেলাম।

প্রেসিডেন্সি জেলের ফিমেল-ইয়ার্ড বড়ো ছোটো। গতবারের হিজলীর সেই বিরাট আকাশ, প্রকাণ্ড অঙ্গন কিছুই এখানে নেই। ক্ষুদ্র পরিসরটুকু যেন বছরের-পর-বছরে মানুষের ক্ষুদ্রতা এবং হীনতাকে আরো পঙ্কিল, আরো অসহ্য ক'রে তোলে। মানুষের মধ্যে যে একটা অ্যাব্‌নর্মাল মন আছে সেটা জেলের মধ্যে যত পরিষ্কার হ'য়ে তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে, এমন আর বোধ হয় কোথাও হয় না। কতো রকমের মানুষ এখানে আসে, কতো ধরনের তাদের মনের গতি!

বিচিত্র এই মানব-চরিত্র! জেলে দেখেছি প্রভাকে (মজুমদার)। সে ছিলো একটা উচ্ছল তরঙ্গ, একটা দুর্দান্ত বেগবান প্রাণ। তার চঞ্চলতাকে থামিয়ে দেওয়া যায় না, শত আঘাতেও প্রাণটাকে নিভিয়ে অন্ধকার ক'রে দেওয়া যায় না। সে হাসতে শিখেছিলো প্রচুর, কিন্তু কাঁদতে পারেনি মোটেই, প্রয়োজনেও নয়। তার মায়ের মৃত্যু খবর যখন এলো, এক ফোঁটা অশ্রুও তার চোখে কেউ দেখতে

পায়নি। সান্ত্বনা দিতে তার কাছে যাওয়াও ছিলো একেবারে অর্থহীন। গভীর দুঃখের অংশ বোধ হয় মানুষ সব সময়ে অন্যকে দিতে পারে না।

শুধু তাই নয়, জেলের মধ্যে অনেক সময়ে অ্যাব্‌নর্মাল মনের সৃষ্ট এমন একটা পঙ্কিল আবর্ত পাকিয়ে ওঠে যে, সেখানে কাল্পনিক জগৎ এসে যুক্তিকে অবিশ্বাস করে, ব্যঙ্গভরে অট্টহাসি হেসে ওঠে। এমনি একটা আবর্তের শিকার হ'য়ে গেল প্রভা। এই নির্মম পরিবেশ যখন আঘাতের-পর-আঘাত হেনে তাকে চিরে-চিরে নুন মাখিয়েছে তখনো চোখ দুটো তার শুকনোই থাকতো, মাথাটা তার সোজাই থাকতো। ছেলেমানুষ তাজা প্রাণটা ওর যেন চাবুক খেতে-খেতে চাবুকগুলি গুনে-গুনে চলতো। কিন্তু পরাজয় সে মানেনি। মনের জোরের কঠিন পরীক্ষা চলে জেলখানায়। সেই শক্তিপরীক্ষার প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে যাদের নাম শীর্ষে র'য়ে গেছে তাদের মধ্যে প্রভা একজন।

একদিন এলেন লাবণ্যদি (দাশগুপ্ত)। স্নিগ্ধ কোমল রূপ থেকে তাঁর স্নেহ মমতা ঝ'রে পড়ছে। স্নেহকোমল চোখ দুটি তাঁর একবার দেখলে আবার মনে পড়ে। অসুস্থ লাবণ্যদিকে একবার নিয়ে গেল মেডিক্যাল কলেজে। ফিরে এসে লাবণ্যদি কতো কাহিনীই বর্ণনা করলেন। সেই হাসপাতালে একটি সাত-আট বছরের ছোটো ছেলে রোগের অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে-করতে যখন অবশেষে মারা গেল তখনো তাকে কেউ দেখতে এলো না। কেউ নেই তার এ-সংসারে। লাবণ্যদি তার পাশে দাঁড়িয়ে অজস্র চোখের জল ফেলতে-ফেলতে বিদায় দিয়েছেন। তারপর এক ডোম এসে তাকে নিয়ে গেল। সে-দৃশ্য বর্ণনা করতে-করতে লাবণ্যদির চোখে প্লাবন নেমে এসেছে। এমন নরম হৃদয়খানি তাঁর না-জানি জীবন ভ'রে অন্যের দুঃখে কতো কান্নাই কেঁদেছে।

আর-একটি মেয়ে ছিলো, সে শুধু উল বুনে, সেলাই ক'রেই জেলের পাহাড়ের মতো দিনগুলি কাটিয়ে দিতে পারতো। নিজের সেল থেকে বের হওয়া বা নিচে নেমে আলো-বাতাসে একটু বেড়ানোর কথা সে মনের কোণেও স্থান দিতো না। কেমন ক'রে যে আধো-অন্ধকার সেলের মধ্যে একটি মানুষ দিনের-পর-দিন, বছরের-পর-বছর একা-একা সঙ্গীহীনভাবে অনায়াসে কাটিয়ে দিতে পারে সেটা একটা পাঠ করবার মতো আশ্চর্য চরিত্র।

একবার আমাদের একদল মেয়ের খেয়াল হ'লো আমরা এক-সঙ্গে জোট হ'য়ে ব'সে সিরিয়াস্ বই আলোচনা ক'রে পড়বো। এই পড়ুয়ার ঝাঁকে যারা এসে যোগ দিয়েছিলো তাদের মধ্যে প্রধান উৎসাহী ছিলো তিন চার জন। আমিও ছিলাম তাদের একজন। অন্য তিন জন ছিলো ভদ্রা, বনলতা সেন ও নির্মলা রায়। ভদ্রা অর্থাৎ প্রতিভা ভদ্র, নামেও ভদ্র ব্যবহারেও অতিভদ্র। শান্তশিষ্ট মেয়েটির ভিতরে কিন্তু একটি কবি এবং সাহিত্যিক মন লুকিয়ে আছে। বুদ্ধি তার প্রকাশ পায় বই পড়তে ব'সে গভীর আলোচনা এবং তার সূক্ষ্ম তর্কের ফাঁকে-ফাঁকে।

দ্বিতীয় বন্ধু নির্মলা। স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যে শ্রীমতী, লম্বাচওড়া মেয়ে। সংসারে যেন কারো ধার ধারে না। একটু আপন-ভোলা, একটু আপন-মনে চলা, এই ছিলো তার স্বভাব। পাঠ্য বিষয়ের আলোচনায় কিন্তু সে সজাগ, তখন আর নিজের মনে পথ ক'রে চলে না। বুঝবার আগ্রহ তার চোখেমুখে চকচক ক'রে ওঠে।

তারপর বনলতা সেন। তর্ক করতে গিয়ে কণ্ঠস্বর তার কখনো উত্তেজিত হ'য়ে উঠতো না। চুলচেরা তর্ক শেষ না হওয়া পর্যন্ত, না বুঝে নেওয়া পর্যন্ত বনলতার কাছে নিস্তার নেই, তার নিজেরও নয়, অন্যের তো নয়ই। তার যেন বুঝতেই হবে, বোঝাতেই হবে এই লাইনটার যুক্তি কি? একটা প্যারা বনলতা পড়েছে, তারপর

চলেছে তার ব্যাখ্যা। বনলতা তখন একাই একশো। হিজিবিজি, আবোল-তাবোল সে নিজেও বলবে না, অন্যে বললেও রেহাই নেই। বইয়ের প্রতিটি শব্দের অর্থ হওয়া চাই, প্রতিটি বাক্যের যুক্তি থাকা চাই।

এলো প্রথমে লেনিনের বই। সেগুলি সাঙ্গ হ'য়ে গেলে আসে Engels-এর লিখিত বই Anti Duhring. কঠিন বইয়ের কঠিন ব্যাখ্যা। তার চেয়েও কঠিন এক-এক জনের ভাষ্য ও টীকা। মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব এসে আঁকড়ে ধরে, চলে পাঠচক্রে তুমুল তর্কবিতর্ক। আলোচনার মীমাংসা হয় না, অর্থ পরিষ্কার বোধগম্য হয় না। চিন্তার তীক্ষ্ণ গতি ডানা মেলে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে তোলপাড় ক'রে চলেছে, মহাবিশ্বের আদি অন্তকে ধ'রে অণু পরমাণুতে খুঁজে ফিরছে। গ্রহ, নক্ষত্র, নেবুলা, ম্যাটার, এনার্জি, সৃষ্টি, স্থিতি, বিলয় সব ছাতু-ছাতু হ'য়ে যাচ্ছে, তবু তর্ক শেষ হয় না।

তার পরেও শান্তি নেই। যার-যার রাজনৈতিক দাদার কাছে যায় প্রশ্নের বাণ চিঠির মধ্য দিয়ে। আমিও না লিখে পারি না। মনকে বিশ্বাস করাবার মতো, মূল শিকড়ে নাগাল না পাওয়া পর্যন্ত সোয়াস্তি নেই। অহোরাত্র ওই চিন্তাই মনটাকে শিকার ক'রে ফিরছে। সেই সময়ে অরুণদা (অরুণচন্দ্র গুহ) বক্সা জেল থেকে মাঝে-মাঝে আমাকে চিঠি লিখতেন। আমি তাঁকেই প্রশ্ন ক'রে-ক'রে হয়রান ক'রে তুলি। অন্তর্নিহিত অর্থ না বুঝলে আমার কিছুতেই চলছে না। বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক বিশ্লেষণের সঙ্গে আসে অরুণদার উত্তর। কোথায় যেন মনটা আরো জানতে চায়, আরো গভীরে চ'লে যেতে চায়। পথটা যেন কিছুতেই ধরতে পারি না। আবার লিখি প্রশ্ন। অরুণদা বিব্রত হ'য়ে যাচ্ছেন কিনা সেদিকে আমার বিন্দুমাত্রও খেয়াল নেই। অন্যদিকে দৃষ্টি দেবার

মতো মনের অবস্থা একেবারেই নেই, আমি শুধু জানি আসল কথা না-বুঝলে আমি স্থির হ'তে পারছি না। আবার আসে অরুণদার উত্তর। আরো বিশ্লেষণে ভরা সেই চিঠি। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে যতখানি সম্ভব পরিষ্কার ক'রে লিখে যাচ্ছেন তিনি, আমাকে পথের অনুসন্ধান দেবার প্রয়াসে। আমার মনটা কোথায় যেন একটু ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যায়, সন্ধানের একটা উপায় পাওয়া যেন সম্ভব মনে হয়। তবু চিন্তার এবং জানবার যেন আদিঅন্ত নেই।

দাদাদের চিঠি নিয়ে চলে আবার আমাদের পাঠচক্রের আলোচনা। আলোচনারও যেন আর শেষ নেই। সুখে কেটেছে এই সময়টা।

গান জিনিসটা জেলের মধ্যে একটা মস্ত ঐশ্বর্য। সময়ের চাকাটা যখন আর এগোতে চায় না, গানের সুর তখন বন্দী মনকে অজানিতে অন্য জগতে নিয়ে যায়, চাকা আবার গড়িয়ে চলে। এক-একদিন সন্ধ্যার পরে যখন লক-আপ হ'য়ে গেছে, শান্ত নিস্তব্ধ চারিদিক, তখন দেখি কেউ আপন সেলের জানলার উপর ব'সে বৃথাই বাইরের জগতকে অন্ধকার বিদীর্ণ ক'রে-ক'রে দেখতে চাইছে, আর অবিরাম গান গেয়ে চলেছে, যেন তার গানে-গানেই জেলের আঁধার রাত্রি ক্ষ'য়ে গিয়ে ফুটে উঠবে নবীন উষা। এমনি ক'রে গান গাইতো ছায়া (গুহ), গাইতো নির্মলা।

আবার নিচে আমাদের ওয়ার্ডের পিছনে ছেলেদের হাজত-ঘর থেকে সুর ভেসে আসছে— 'গোধূলির বাঁশরী ডাকিলো পথের 'পরে।' গাইছে তারাদাস ভট্টাচার্য। তার গাওয়া উদাস করুণ পূরবীর সুর সমস্ত বন্দী মনকে ক'রে তোলে বিচলিত, অশ্রুসজল। কান পেতে অপেক্ষা করি আবার যদি গায়। কারাপ্রাচীরের কঠিন ব্যবধান ভেদ ক'রে আবার যদি ভেসে আসে তার মধুর কণ্ঠের সুর। এই তারাদাস একদিন আপন-জীবনের গোধূলিতে কোন্ বিদ্রোহী পথের সন্ধানে ছুটে গেল নেপালে। বিদ্রোহী তারাদাস তার চরম কর্মরত

মুহূর্তে পূর্ণাহুতি দিয়ে গেল নিজের অমূল্য জীবনকে। সার্থক তার বিপ্লবী জীবন। গোধূলির বাঁশরী সত্যিই তাকে ডেকে ফিরেছিলো পথের 'পরে। আমাদেরও সে শুনিয়েছিলো সেই গান, কিন্তু আমাদের মধ্যে সে-গান শুনবার এবং বুঝবার পার্থক্য ছিলো বুঝি।

রানাতন্ত্রের বিরুদ্ধে নেপালের জনসাধারণ বিদ্রোহ করেছিলো নেপাল কংগ্রেসের নেতৃত্বে ১৯৫০ সালে। সেই বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করতে তারাদাস গিয়েছিলো সেখানে বিস্ফোরক-বিশেষজ্ঞ (explosive expert) হিসাবে। যখন বহু বোমা তৈরি করেছে এবং যেদিন বিকালে এরোপ্লেন থেকে বোমা ফেলা হবে ব'লে বোমাগুলিতে শেষ প্রস্তুতির কাজ ক'রে চলেছিলো সেদিন সেই বিরাট বোমা তৈরিরত তারাদাসের একটা বোমা টেবিল থেকে প'ড়ে গিয়ে ফেটে যায়। ফলে ঘরের সমস্ত বারুদ ও বোমা ফেটে ঘর উড়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে তারাদাসের তেজোদৃপ্ত তরুণ দেহখানিও টুকরো-টুকরো হ'য়ে গেল। বিদ্রোহী নেপালকে আপন-বুকের রক্ত দিয়ে সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো তারাদাস। তারিখটা ছিলো ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৫০ সাল।

এ তো গেল জেলের দৈনন্দিন জীবনের একটা দিক। আর-একদিকে ছিলো বন্দীদের একটা ঔৎসুক্যপূর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টি। সেটাও নিভে যায় না। তারা লক্ষ্য ক'রে চলে যুদ্ধের গতি এবং বাইরের খবর।

দেখতে-দেখতে এসে গেল ১৯৪৩ সাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জগতকে বধির ক'রে তুলেছে, ইংরেজের সর্বশক্তিকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করছে। যুদ্ধের এই শোষণের একটা প্রধান দাবি মেটাচ্ছে ভারতবর্ষ। সেদিন সে বাণবিদ্ধ, রক্তক্ষরা। জীবনীশক্তির প্রধান আধার রসদসম্ভার ছুটে চলেছে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধক্ষেত্রের প্রয়োজনে।

বাংলাদেশের পরিস্থিতি আরো জটিল। জাপানী আক্রমণের ভয়ে ইংরেজ এখানে কার্যে পরিণত করছে Denial policy বা বঞ্চনা নীতি। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট স্থির করেছে, জাপান বাংলাদেশ দখল ক'রে নিতে আসবার মুখে বাংলায় যেন যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য জাপানীরা যানবাহন, রসদ বা খাদ্য কিছুই না পায়। তাই আগে থেকে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এখানে পুড়িয়ে ফেলছে নৌকো, নষ্ট করছে সাইক্‌ল্‌ এবং অন্যান্য যানবাহন, সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অজস্র খাদ্য-সম্ভার। এইভাবে খাদ্য, রসদ ও যানবাহনের অভাবে জাপানীরা যাতে বাংলায় যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য হয়, সেই নীতি ছিলো ইংরেজের।

তা ছাড়া, ওদিকে বাংলার পশ্চিমপ্রান্তে আছে মেদিনীপুরের জাতীয় গভর্নমেণ্ট, পূর্বে বর্মায় তো জাপান এসেই গেছে, এর পরেই পূর্বপ্রান্ত ধ'রে আসবে জাপানী সৈন্য ও আজাদ হিন্দ্‌ বাহিনী। আশঙ্কায় অধীর হ'য়ে উঠেছে ইংরেজ, বুঝি-বা সমস্ত বাংলাদেশ জুড়ে অমনিতরো এক বিদ্রোহী জাতীয় সরকার খাড়া হ'য়ে ওঠে! ভীত ত্রস্ত ইংরেজ তাই নিজে হাতে ইচ্ছে ক'রে এনে ফেললো দুর্ভিক্ষ সারা বাংলাদেশ জুড়ে।

ক্ষুধার্ত দরিদ্রের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে তারা অন্যত্র মজুদ রাখে, রণক্ষেত্রে যোগান দেয়। কালা আদমীগুলো না খেয়ে ম'রে গেলে ইংরেজের কোন্‌ দায়? বাংলায় দুর্ভিক্ষ এসে গেল তার বিভীষিকাময় মূর্তি নিয়ে। সোনার বাংলার আকাশে-বাতাসে উঠেছে হাহাকার, বুক-ফাটা কান্নার রোল। তারই প্রতিধ্বনি পৌঁছায় গরাদের অন্তরালে বন্দীদের কানে। বন্দীরা স্টেট্‌সম্যানে ছবি ছাখে আর চমকে ওঠে, এ কি? উপবাসী ক্ষুধার্তের তিলে-তিলে এ কি অসহ্য মৃত্যু! তারা গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেছিলো খাবারের অন্বেষণে। সেখানে এসে ক্ষুধার যাতনায় হাজারে-হাজারে কঙ্কাল

অমনি ফুটপাথে নীরবে শেষ হ'য়ে গেল ? তাদের ক্ষুধার প্রাপ্য অন্ন লরী বোঝাই হ'য়ে পাশ দিয়ে চ'লে গেল! জেলে ও পুলিসেব লাইনে, সিপাইদের জন্য ও কারখানায়, চা-বাগানে সর্বত্র কুলি-মজুরের জন্য তিন-চার বছরের মতো রসদ গুদামজাত করা হ'য়ে গেল। ধনীরা কালোবাজার জাঁকিয়ে বসলো। দোকানে থরে-থরে খাবার সাজানো রইলো। সেই গুদামেরই পাশে অথবা রাস্তায় অনাহারে ছটফট ক'রে মানুষ মৃত্যুর গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে। এমন একটি বিপ্লবীও তখন বাইরে ছিলেন না যিনি ক্ষুধার্তদের বলবেন, 'চালের গুদাম, ধানের গোলা, মজুদ-করা খাদ্য তোমরা লুঠ ক'রে খাও, অজস্র খাদ্যের পাশে তোমরা উপবাসে ম'রে যেয়ো না।' সত্যিকারের বিপ্লবী শক্তিকে সেদিন ইংরেজ নিঃশেষে জেলে পুরে রেখেছে।

জেলের ভিতরে কিন্তু ইংরেজ করেছে অদ্ভুত ব্যবস্থা। ইংরেজ জানে বাইরে যখন কাতারে-কাতারে দেশবাসী অনাহারে বীভৎস মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে তখন জেলখানাতে তার স্পর্শ লাগতে দিলে ফল ভালো হবে না। তাতে যে-আগুন জ্ব'লে উঠবে তাকে রুখে রাখা যুদ্ধরত সাম্রাজ্যবাদীর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই জেলখানার বরাদ্দ তারা হ্রাস করেনি। বরং যা জেল-গুদামে নেই, তাও যেমন ক'রে হোক সংগ্রহ ক'রে এনে দিয়েছে। যেন এরা খেয়ে প'রে শান্ত থাকে। জনসাধারণের নিকট হ'তে বিপ্লবী শক্তিকে কঠিন হাতে তারা পৃথক ক'রে রাখতে চায়। জেলের মধ্যে বিপ্লবীরা সবই বুঝতে পারেন। বদ্ধ দরজার রন্ধ্রের মধ্য দিয়ে দুর্ভিক্ষের হাহাকার তাঁরা শোনেন, কিন্তু দরজা ভাঙবার উপায় খুঁজে পান না। একটা শুভক্ষণ এসে ব'য়ে গেল, বিপ্লব আনা গেল না।

ইংরেজের কারাগারে একটার-পর-একটা বছর আসে আর চ'লে যায়। এলো ১৯৪৪ সাল। ভারতের পূর্বসীমান্ত অতিক্রম

ক'রে আসছে জাপানী সৈন্য ও আজাদ হিন্দ্ বাহিনী। তার পুরোভাগে রয়েছেন সুভাষচন্দ্র। আমরা শুনি জাপান আসছে। মনে-মনে ভাবি, বিদেশী সৈন্য এসে আমাদের দেশকে এনে দিয়ে যাবে স্বাধীনতা? এও কি সম্ভব? ভারতের অতীত ইতিহাস বলে, যখনি আমরা বিদেশী সৈন্যের সাহায্য নিয়ে লড়াই করেছি তখনই সেই জয়ে বিদেশীরাই রাজ্যপ্রতিষ্ঠা ক'রে গেছে। এমনি ক'রে এসেছিলো পাঠান মহম্মদ ঘোরী, এসেছিলো মোগল বাবর, এসেছে ইংরেজ ক্লাইভ। আবার প্রভু বদল? ওদিকে শুনি, সাইগন রেডিও থেকে নাকি গোপনে সংবাদ আসছে, নেতাজী বলেছেন, 'ভয় নেই, আমি জাপানের হাতের পুতুল নই, জাপানের স্বার্থ আমি দেখবো না। আমার চিরজীবনের স্বপ্ন, আমি ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে আনবো স্বাধীন ভারত।'

আজাদ হিন্দ্ বাহিনী সেদিন যে-বীরত্ব, যে জ্বলন্ত দেশপ্রেম ও একতা নিয়ে কোহিমা, ডিমাপুরে বিজয়পতাকা উড়িয়েছিলো সে-দান ভারতের ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা আছে।

এই আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর বিচার (I. N. A. Trial) হয়েছিলো ইংরেজের আদালতে ১৯৪৫ সালে। তার ফলে জেগেছিলো সমস্ত ভারতবর্ষে দারুণ উত্তেজনা ও অভূতপূর্ব উন্মাদনা। ছুটে চলেছিলো বিক্ষোভের তরঙ্গরাশি। সেই বিক্ষোভ এনে দিলো কলকাতায় ছাত্র-আন্দোলন নতুন ধারায়। হাসিমুখে বুক পেতে গুলি নিয়ে অমর হ'য়ে আছে রামেশ্বর প্রভৃতি। সেদিন দেশাত্মবোধের প্রেরণায় সাধারণ ছাত্রও যেন অসাধারণ হ'য়ে উঠলো। যে আগে কখনো রাজনীতি বা বিদ্রোহের কথা ভাবেনি সে-ও সেদিন অন্তরে-অন্তরে উদ্বুদ্ধ, এগিয়ে যেতে উন্মুখ, চঞ্চল। এই কলরোল শুধু ছাত্র-আন্দোলনেই সীমাবদ্ধ রইলো না। শুরু হ'লো বোম্বাইয়ে এবং করাচীতে নৌবিদ্রোহ এবং এরোপ্লেন বাহিনীর ধর্মঘট। প্রত্যেকটা আন্দোলন ও বিদ্রোহ ইংরেজকে মর্মে-মর্মে বুঝিয়ে দিয়েছিলো যে,

যে-দেশে ছাত্র, সৈন্য এবং নৌবাহিনী তার দৃঢ়মুষ্টির বাইরে চ'লে গেছে, তাকে আর বেশিদিন শাসন করা অসম্ভব।

ভারতবর্ষের ষাট বছরের সংগ্রামের ইতিহাস একটার-পর-একটা বিপ্লবের ঢেউ এনেছে, তার প্রত্যেকটা তরঙ্গ পরিপূর্ণ সম্ভাবনার ভারে ভরপুর হ'য়ে এসেছে। ইংরেজের অত্যাচারে নিপীড়নে কারাগারের অন্তরালে মনে হয়েছে, বুঝি বারে-বারেই বিপ্লব ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে-ফিরে গেছে। কিন্তু ইতিহাস বলছে, প্রতিবারেই জাতি আরো শক্ত হ'য়ে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে গেছে। তাই ১৯৪৭ সালে তাকে আর ইংরেজ রুখে রাখতে পারেনি, ভারতের সংগ্রামশক্তির কাছে তাকে মাথা নত করতেই হ'লো।

॥ কুড়ি ॥

সাধারণ কয়েদীরা জেলের পরম বন্ধু। আমি ওদের ভালোবাসি। ওরা চোখের জলে দিন কাটায়। স্বদেশী বন্দীরা জেলে এলে তারা যেন হাতে স্বর্গ পায়। ভাবে, আমরা বুঝি তাদের দুঃখ কিছু দূর করতে পারবো। গতবারে যে বিশবছরী কয়েদীদের রেখে গিয়েছিলাম তাদের কেউ-কেউ এবার আর নেই।

জমাদারনীকে জিগ্যেস করি, 'জহরা কোথায়?' জমাদারনী বলে, 'সে তো নেই, মারা গেছে।' বুকটা আমার ভারী হ'য়ে ওঠে। মনে পড়ে সেই ছোটো মেয়েটিকে। ১৯৩২ সালে এই প্রেসিডেন্সি জেলে দেখেছি তাকে। প্রথম যখন জহরা জেলে ঢুকেছিলো তার বয়স ছিলো তেরো-চোদ্দ বছর। ওইটুকু মেয়ের সাজা হয়েছিলো বিশ বছরের কালাপানি। ইংরেজের বিচারালয় তাকে সংশোধন করবার অন্য উপায় খুঁজে পায়নি। চরম দণ্ড দিয়ে প্রতিশোধ নিয়েছে। জিগ্যেস করতাম, 'কেন এমন শাস্তি হ'লো রে জহরা?' জহরা বলতো, 'দিদিমণি, আমি কিছুই জানিনে। খুড়তুতো ভাইয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিলো। পাশাপাশি ঘর। ছোটো ছিলাম ব'লে মা'র কাছে বেশি থাকতাম। একদিন মা'র কাছে শুয়ে আছি, গভীর রাতে শুনি আমার স্বামী মারা গেছে, ভোরে পুলিস এসে আমায় থানায় ধ'রে আনলো। রাতে আমি স্বামীকে ভাত দিয়েছিলাম। ওরা বললো, আমি নাকি ভাতে বিষ মিশিয়েছি, তাই সাজা দিলো বিশ বছরের কালাপানি।' আমি জিগ্যেস করি, 'সত্যি ক'রে বলো তো ভাই, তুমি কি বিষ খাইয়েছিলে?' সে জবাব দেয়, 'মিথ্যে ব'লে লাভ কি? এখন তো আর নতুন ক'রে আমার সাজা কম বেশি হবে না। আমি বিষ মিশোইনি দিদি, আমি কিছুই জানিনে। সে তো ভালো লোক ছিলো।'

আজ জহরা নেই। মনে পড়ছে জহরার সদাহাসি কচি মুখখানা।

সেই ভালো লোকের স্ত্রী ইংরেজের বিচারের চরম উত্তর দিয়ে চ'লে গেছে। হয়তো সত্যিই সে নির্দোষ ছিলো। মনে-মনে ভাবি, স্বাধীন ভারতে আমরা এমন বিচার রাখবো না। তেরো-চোদ্দ বছরের মেয়ের দোষ যদি প্রমাণও হয় তবু তার এমনতরো বিশ বছরের কালাপানি হবে না। তাকে সংশোধন করবার উপযুক্ত ব্যবস্থা আমরা করবো, সহানুভূতি দিয়ে, দরদ দিয়ে। জেলখানা তার জন্য নয়, কালাপানি তো নয়ই।

ফুলমণিও এবারে নেই। জমাদারনী বললে, 'তার যে কাল রোগ হ'লো। জান খালাস দিলে বড়ো সাহেব। বাড়ি থেকে কেউ নিতে এলো না। কি করবে, এখানেই শেষ হ'য়ে গেল।' আমার মনে পড়ে কি ক'রে তার এই রোগ হয়েছিলো। প্রেসিডেন্সি জেলে ফুলমণি হাঁড়ি-মেথরের কাজ করতো। শীতের অতি ভোরে উঠে সে ময়লা পরিষ্কার করতো। ভিতরে-ভিতরে অসুস্থ হ'য়ে সে যখন আর পারছে না তখনো তাকে দিয়ে জোর ক'রে খাটিয়ে নেওয়া হ'তো। একদিন অমনি এক ভোরে সে ঝাড়ু-হাতে ব'সে পড়েছে, বলছে, 'আমি আর পারছি না।' তবু জমাদারনী তাকে মারছে আর ধমকাচ্ছে, 'কাজে ফাঁকি দেবার মতলব তোমার। পরিষ্কার তোমাকে করতেই হবে।' জমাদারনীকে গিয়ে বলি, 'ছেড়ে দাও ওকে, ওর শরীর অসুস্থ।' জমাদারনী তেড়ে আসে। বলে, 'তুমি স'রে যাও, ওদের তোমরা চেনো না। এ-সবে কথা বলবার নিয়ম নেই তোমাদের।' এই ব'লে হিড়হিড় ক'রে টানতে-টানতে তাকে নিয়ে যায় আর চিৎকার করে, 'জ্বর হয়েছে না ছাই, করতেই হবে তোর কাজ।' অশক্ত তপ্তদেহে ফুলমণি কয়েদীর সশ্রম কর্তব্য ক'রে চলে। শেষে ফুলমণির জ্বর যখন ১০১°-১০২° ডিগ্রি উঠতে থাকে, মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে, তখন তাকে সরানো হয় হাসপাতালে, কালরোগই হয়েছে বটে।

বড়ো সাহেব শেষে তাকে জান খালাস দিয়েছিলেন। আমি ভাবি, জান তার খালাস পেয়েছে বটে, জমাদারনীর নিষ্ঠুর হাতের পীড়ন থেকে। সেখানে গিয়ে বেঁচেছে সে। কুড়ি বছরের কালাপানি নেই সেখানে, নেই মেট্রনের রুলারের পিট্টি, নেই জল্লাদ জমাদারনীর অবিশ্বাস। ফুলমণির রোগক্লান্ত দৃষ্টি, তার সেবারত শ্রান্ত হাত দু-খানি আজও যেন ফিমেল-ইয়ার্ডে র'য়ে গেছে। যেন সে ডেকে-ডেকে বলছে, স্বাধীন ভারতে তোমরা এর বিহিত করবে না?

১৯৩৫ সালের আর-একটা স্মৃতি মনে পড়ে। একদিন দেখি, একটি কয়েদীকে দু-জন জমাদারনী মাটিতে ফেলে লাথি মারছে এবং জমাদারনীর অনুগত পাঁচ-সাতটি মেট পাহারাওয়ালী কয়েদী তাকে হিঁচড়ে টানতে-টানতে নিয়ে যাচ্ছে ডিগ্রি বন্ধ করতে। কয়েদীটি চিৎকার করছে, ডিগ্রি বন্ধ সে হবে না। অনেক কষ্টে জানতে পারি, আমাদের খাবার সে খেয়েছিলো, এই তার অপরাধ। চুরি ক'রে সে খায়নি, কিন্তু যে-কয়েদী রাজবন্দীদের কাজ করে সে ছাড়া অন্য-কোনো কয়েদী রাজবন্দীদের খাবার নাকি খেতে পারে না, সেই জেলরুল হঠাৎ ফলাচ্ছে জমাদারনী দমাদ্দম্ পদাঘাত ক'রে। ভিতরের কথাটা আমার বুঝতে দেরি হ'লো না যে, কয়েদীটি জমাদারনীকে ভাগ দেয়নি অথচ নিজে খেয়েছে, সেটা জমাদারনী সহ্য করতে পারেনি। মারের চোটে হৈ-হৈ শোর প'ড়ে গেল। এলো জেলার। লালমুখো জেলার বলে, 'কোথায় কয়েদীকে মেরেছে প্রমাণ দেখি? কোনো রক্ত বা খুনখারাবি তো ওর শরীরে দেখা যাচ্ছে না! বরং জমাদারনীর জামাটাই কয়েদী ছিঁড়ে দিয়েছে।' জমাদারনীর নালিশে মিথ্যা অজুহাতে কয়েদীকে সাতদিনের ডিগ্রিবন্ধ এবং ছালার চট পরাবার আদেশ দিয়ে জেলার চ'লে গেল। কয়েদীর বুক-ফাটা কান্নায় কারাপ্রাচীর বোবা হ'য়ে রইলো। আমি ভেবে রাখি, স্বাধীন ভারতে কারাসংস্কারে আমূল পরিবর্তন আনতে হবে।

এবারে ১৯৪২ সালে এসে পেয়েছি পিসি-ভাইঝি দুই কয়েদী। বিশ বছরের সাজা এদের। পিসি তো পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের বুড়ি। তারা ডাল ভাঙবে কি ক'রে? শাস্তির কল্পনা তাদের ভিতরটা অহোরাত্র শুকিয়ে আনছে। জিগ্যেস করলে বলে, 'খুন আমরা করিনি দিদিমণি, চোখেও দেখিনি কে খুন করলে।' বলে, বান্দার (মানুষের) দেওয়া শাস্তি খোদা জানে কতো মিথ্যা। এদের মুখ দেখলে, ব্যবহার দেখলে, কথা শুনলে সত্যি বিশ্বাস হয় না যে, এরা মানুষ খুন করতে পারে। আমিও তাদেরই মতো মনে-মনে বলি, বান্দার দেওয়া শাস্তি খোদা জানে কতো মিথ্যা, কতো ভুল। পরাধীনতার শাপমুক্ত ভারতবর্ষে বান্দার দেওয়া শাস্তি যেন বান্দার মতোই হয়। আর খুন যদি এরা ক'রেই থাকে? সেজন্য এমন প্রতিকারহীন চরম শাস্তি পাবে? ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ প্রতিকারের পথ দেখাবে, প্রতিশোধের নয়। ইংরেজের জেলখানা তো শুধু নির্মম প্রতিশোধই নেয়, মানুষ আরো তাতে অমানুষই হ'য়ে ওঠে, প্রতিকার তো কোথাও নেই।

আর-একটি কয়েদী বলে, 'খুন আমি করিনি, যে খুন করেছে তাকে আমি জানি। আমার মাথায় পেতে নিয়েছি তার দোষ। আমি যার জন্য জেল খাটছি তার জন্য প্রাণ দিতে, জেল খাটতে, কোনোটাতেই আমার দুঃখ নেই।' আমি অবাক হ'য়ে ভাবি, এমন স্বার্থত্যাগ এই সাধারণ কয়েদীর? সমুদ্রের অতল গভীরে কতো মণিমুক্তা ছড়িয়ে আছে, কে তার খবর রাখে?

মাদারীরা বেদে ধরনের। এরা যেমন সরল, তেমনি আন্তরিক। কিন্তু তারা ঘন-ঘন চুরি করে, পকেট মারে আর জেলে আসে। জিগ্যেস করি, 'কেন তোমরা এতবার চুরি করো, আর দু-চার মাস ক'রে জেল খেটে যাও? জীবনভোর এমনি চুরি করবে আর জেল খাটবে? জেলে এসে এই যে আমার কাজ করছো, কই, আমার

জিনিস তো চুরি করো না? ছেড়ে দাও তোমাদের চুরি করবার ব্যবসা, সৎপথে থাকো।' মাদারী বলে, 'এখানে তোরা ভালো-ভালো খেতে দিস, দোক্তাপাতা দিস, তেল সাবান দিস, আর চুরি করবো কেন রে? বাইরে আমাদের ঘরবাড়ি নেই, খেত চাষ নেই, খাবার পরবার নেই। আমাদের জাত শুধু ঘুরে-ঘুরে বেড়ায়, খুব বেশি হ'লে চুড়ি-বালা বিক্রি করে, চুরি করে অথবা পকেট কাটে। নইলে খেতে দেবে কে রে? পেটের জ্বালায় চুরি করি। কি ক'রে খাবো তুই ব'লে দে।' উত্তর শুনে আমি মনে-মনে উপায় খুঁজি। তাই তো!

আর-এক কয়েদী হাবলুর মা। জিগ্যেস করি, 'হাবলুর বাবাকে তুমি কাটলে কেন?' সজল করুণ চোখে উত্তর দেয়, 'কেন কেটেছি দিদিমণি? আমাকে খেতে দিতে পারে না, কতো না-খেয়ে থাকবো? হাবলুটা চার মাসের বাচ্চা, ওকে খাওয়াতে হবে না? নিজে না-খেলে ওকে কেমন ক'রে খাওয়াবো? হাবলুর বাবা রোজ সন্ধেবেলা ফিরে এসে বলবে, খেতে দে। কোথা থেকে রোজ-রোজ আমি খাওয়াবো? কতোদিন ভিক্ষে ক'রে, চুরি ক'রে এনে খেতে দিই। কিন্তু তাতে তো দিন চলে না। সে আমাকে খাওয়াতে পারে না, রোজগার নেই, আবার আমার সঙ্গে ঝগড়া করে ভাত রাঁধি না ব'লে। সেদিন শেষে আমিও ঝগড়া করলাম। ভাত দিইনি ব'লে আমাকে মারতে এলো। আমিও হাতের কাছে দা পেয়ে এক কোপ মেরে বসলাম। খিদের জ্বালায়, রাগের মাথায় এমন কোপ পড়লো দিদিমণি যে, সে না-খেয়ে জন্মের মতো চ'লে গেল। আমি তো এমন শাস্তি চাইনি।' অজস্র চোখের জলে তার বুক ভেসে যায়।

আমি ব'সে-ব'সে ওদের দেখি আর ভাবি, স্বাধীন ভারতে এই সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে হবে। আমরা আনবো

এমন রাষ্ট্র, এমন সমাজ-ব্যবস্থা, যেখানে সকলে ছু-মুঠো খেতে পরতে পাবে, কাজ পাবে, মানুষ হবার উপায় দেখতে পাবে। থাকবে শিক্ষার উপযুক্ত সুযোগ, থাকবে নৈতিক শিক্ষার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া। সেখানে কোনো মাদারীর চুরি করবার দরকার থাকবে না। ক্ষুধার্ত হাবলুর মা ক্ষুধার্ত স্বামীকে কেটে অনুতাপে দগ্ধ হবে না। এরাই তো আমাদের দেশের লক্ষ কোটি অর্ধভুক্ত, উপবাসী, মূক জনসাধারণ। এরাই তো বিশাল ভারতবর্ষ। আমার অস্তিত্বও আছে এদেরি মধ্যে। এই অসহনীয় অবস্থা দূর করবার জন্যই তো স্বাধীনতা-সংগ্রাম। প্রতিষ্ঠিত হবে একদিন কিষাণ-মজুররাজ, সে-রাষ্ট্র আমাদের আনতেই হবে, করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।

বিশ্বযুদ্ধ থেমে গেছে। অনেককেই মুক্তি দিচ্ছে। ১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসের এক সকালে আসে আমারও মুক্তির আদেশ। জেল ছেড়ে যাবার আগে কয়েদীদের কাছে বিদায় নিতে যাই। অসময়ের বন্ধু, ছুর্দিনের মমতাময়ী সাথী এরা। এদের ফেলে রেখে চ'লে যাচ্ছি নিজে। এদের স্নেহমাখা সেবা, আন্তরিক ভালোবাসার কথা ভুলবো কি ক'রে? বন্দীজীবন ছাড়া এদের জীবনকথা, এদের মর্মব্যথা আর তো কোথাও বোঝা যায় না। বাইরের লোক এদের যত মন্দই বলুক তারা তো জানে না, এই মন্দের মধ্যেও কতো সততার সম্ভাবনা, কতো অস্ফুট মহত্ব, কতো দরদী সেবা, কতো বুদ্ধিদীপ্ত কোমল অন্তর র'য়ে গেছে। হয়তো শিক্ষা পেলে, সুযোগ পেলে, সৌরভে সুষমায় আপনি তারা বিকশিত হ'য়ে উঠতে পারতো। কিন্তু জেলখানা এদের পিষে ফেলতে চায়, ফুলটি থেঁৎলে ম'রে যায়। তাদের ছেড়ে যেতে গলাটা আমার আজ বন্ধ হ'য়ে আসে। হাত বাড়িয়ে শেষবারের মতো ওদের হাতগুলি ধরি।

ওরা চোখের জলে হাত ধ'রে বলে, 'দিদিমণি, আমরাও ভালো হবো, আমাদেরও বাইরে নিয়ে চলো।'

গলা আমার আটকে গেছে। মনে-মনে বলি, ভালো তোমরা হবে বৈকি বোন, তোমাদের ভালো হবার জন্যই, ভারতের অন্তরাত্মার সেই গভীর কান্না মোছাবার জন্যই তো এই স্বাধীনতা-সংগ্রাম। স্বাধীন ভারত তোমাদের অশ্রু মোছাবে, তবেই তো সে বেঁচে উঠবে। সেদিন তোমরা একহাতে সোনা ফলাবে, অন্য হাতে শিল্পকলায়, বিজ্ঞানে, দর্শনে জগতকে স্তম্ভিত ক'রে দেবে। আমরাও তো আছি বোন তোমাদেরই মধ্যে, কোথাও তো দূরত্ব নেই, তফাত নেই। সমগ্র জাতিকে মানুষের মতো বাঁচতে দিয়ে তবেই তো আসবে ভারতের অন্তরের মুক্তি। জয় হবে সেদিন স্বাধীন ভারতের।

বেরিয়ে এসেই আবার শুরু সেই 'মন্দিরা', সেই কংগ্রেস মহিলা সাব-কমিটির কাজ। দ্রুত পট-পরিবর্তন হ'য়ে চলেছে ভারতের রাজনৈতিক আকাশে। মেয়েদের মধ্যেও ব'য়ে যাচ্ছে ক্রমচঞ্চল কর্মস্রোত। কলকাতায় আসছেন সরোজিনী নাইডু। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে তাঁকে নিয়ে আয়োজন হয় মহিলা-সভার। সভায় গিয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনে, তাঁর ব্যক্তিত্বে ও প্রতিভায় মেয়েরা মুগ্ধ হ'য়ে যায়। তিনি যেন মেয়েদের রক্তের মধ্যে বড়ো হবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিয়ে গেলেন, আগুন ধরিয়ে দিলেন তাদের স্বাধীনতা-কামনায়। উৎসাহ যেন কূল ছাপিয়ে বহুদূর ছুটে যায়। জাতির জীবনস্পন্দন অতি দ্রুত, অতিশয় বেগবান।

মেয়েরা শিখছে ম্যাজিক ল্যাণ্টার্নের ব্যবহার। উদ্দেশ্য, স্বাধীনতা আনতে জনমনকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলবে। ঝাঁপিয়ে পড়েছে তারা দলে-দলে। যাই তাদের নিয়ে হরিজন-বস্তিতে। হরিজনদের মধ্যে ফিরে পাই আমার জেলের বন্ধু সেই দরদী কয়েদীদের অন্তর-স্পর্শ-করা স্নেহমমতা, আর ফিরে পাই দেশের সেই গূঢ়তম সমস্যাবলী। এদের মধ্যে নিজেদের ডুবিয়ে দিয়ে সমাধানের পথ খুঁজতে চায় কর্মীরা।

আরম্ভ হয়েছে মেয়েদের ফার্স্ট-এইড শিক্ষার ক্লাস। গ'ড়ে উঠেছে স্বেচ্ছাসেবিকাবাহিনী। নিজেদের ছড়িয়ে দিচ্ছে তারা ক্ষেত্র থেকে ক্ষেত্রান্তরে— সিন্ধুর অশান্ত তরঙ্গরাশি ফুলে-ফুলে গর্জে উঠছে, কোথাও সীমারেখা টানবার উপায় নেই।

ওদিকে আমাদের চ'লে যেতে হবে মফঃস্বলের শহরে ও গ্রামে, সংগঠিত করতে হবে, সক্রিয় ক'রে তুলতে হবে সেখানকার মেয়েদেরও। সময় নেই আর এক মিনিটও, সর্বত্রই অতি দ্রুত গতি।

এমনি সময়ে ১৯৪৬ সালে অগস্ট মাসে কলকাতায় ঘ'টে গেল

হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা। মুসলিম লীগ ১৬ অগস্টকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন ঘোষণা করেছিলো। হিন্দুরাও নৃশংসতায় মুসলমানের চেয়ে কম যায়নি। নির্দোষ নরনারীর সে কী নিষ্ঠুর হত্যাসাধন!

আর্ত নরনারীকে আশ্বাস দেওয়া, নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসা, তাদের খাওয়াপরার ব্যবস্থা ইত্যাদি যখন চলছে কলকাতায় পূর্ণোদ্যমে, তখন খবর আসে নোয়াখালির নির্মম দাঙ্গার।

একবার চ'লে গেলাম প্রভাদি (বোস), বীণা ও আমি নোয়াখালির দিকে। চৌমুহনী, দত্তপাড়া, কুমিল্লা, চাঁদপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা গিয়ে নিজের চোখে দেখে এলাম, মানুষ মানুষের কী সর্বনাশ করতে পারে।

কলকাতা ফিরে এসে দাঙ্গাবিধ্বস্ত লোকদের জন্য যতই জামা, কাপড়, অর্থ ইত্যাদি সংগ্রহ করি এবং নোয়াখালি পাঠাই না কেন, মনের মধ্যে শান্তি পাই না। কী দেখে এলাম চক্ষে!

॥ বাইশ ॥

আমার ভাই একদিন বললে, নোয়াখালির ধর্ষিতা মেয়েদের বিয়ে করবার প্রস্তাব নিয়ে প্রায় ছিয়াশিখানা চিঠি এসেছে ওর এক বন্ধুর কাছে, আমি এ-ব্যাপারে কিছু সাহায্য বা ব্যবস্থা করতে পারি কিনা! আমার মনটা খুশি হ'য়ে ওঠে, বাংলার ছেলেরা এত উদার? ভূপেনদাকে গিয়ে জিগ্যেস করি, 'এ-বিষয়ে কি করবো?' ভূপেনদা বললেন, 'চ'লে যাও চিঠিগুলি নিয়ে নোয়াখালিতে গান্ধীজীর কাছে।' ছোট্টো কথাটি ভূপেনদার। কিন্তু এমন দরদমাখানো উত্তর আর বুঝি ওর হ'তে পারতো না। কংগ্রেসের মহিলা-বিভাগের কর্তব্য ছড়ানো রয়েছে বাংলাদেশের সর্বত্র। তারই সম্পাদিকারূপে কংগ্রেস পাঠালো আমাকে নোয়াখালিতে।

১৫ ডিসেম্বর, ১৯৪৬। রওনা হয়েছি নোয়াখালির দিকে। পরদিন চৌমুহনী পৌঁছেই ব্যবস্থা ক'রে ফেললাম গান্ধীজীর কাছে যাত্রার। প্রথমে যেতে হবে কাজিরখিল। তারপর মধুপুর। সেখান থেকে তিন মাইল দূরে শ্রীরামপুরে আছেন গান্ধীজী।

গান্ধীজীর বাড়িতে আমাদের সর্বপ্রথম অভ্যর্থনা করলো একটি পোড়া ঘর। তার পরেই গিয়ে উঠলাম অধ্যাপক নির্মল বোসের ঘরে। তিনি লিখতে ব্যস্ত ছিলেন। তারই মধ্যে হাসিমুখে পাশের একটা বেঞ্চে আমাদের বসালেন। নিজে ব'সে আছেন একটা ছোটো তক্তপোশে, অবিরাম লিখে চলেছেন।

তাঁকে জানালাম, কয়েকজন ভদ্রলোক নোয়াখালির ধর্ষিতা মেয়েদের বিয়ে করতে চান। তারই দূত হ'য়ে এসেছি গান্ধীজীর কাছে। নির্মলবাবু সংবাদ নিয়ে চিঠিগুলি হাতে ক'রে গেলেন গান্ধীজীর ঘরে। সঙ্গে-সঙ্গেই ডাক পড়লো। যে-কয়জন গিয়েছিলাম, সবাই মিলে চললাম তাঁর ঘরের দিকে। ঘরে ঢুকবার আগেই দেখি

গান্ধীজী আমাদের উদ্দেশে দু-হাত জোড় ক'রে নমস্কার করছেন, স্নিগ্ধ হাসিমাখা মুখ। অপরিচিত আমরা। আমরা প্রণাম করবার আগেই তিনি আমাদের নমস্কার করছেন, আমরা ঘরে ঢুকবার আগেই তিনি হাসিমুখে অভ্যর্থনা করছেন, এ যেন শুধু গান্ধীজীকেই সম্ভব, আর কোথাও এমন তো দেখিনি!

সেদিন ছিলো তাঁর মৌন দিবস। ইশারায় পরিচয় জিগ্যেস করলেন। নির্মলবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমার বক্তব্য তিনি আগেই ব'লে রেখেছিলেন। গান্ধীজী তাঁর জবাবটুকু একটা পুরনো খামের ওপিঠে লিখে দিলেন :

> 'Personally I do not think the extent of the evil is so great. Many such cases have not come under my observation. In any case you may keep in mind the young men who will take in such girls and see what can be done when you come across a bonafide case.'

অর্থাৎ 'এমন অশুভ ঘটনার সংখ্যা এত বেশি ব'লে আমি মনে করি না। এ-রকম ঘটনা খুব বেশি আমার নজরে আসেনি। যাই হোক, যে-সব যুবক এমন মেয়েদের বিয়ে করতে চায় তাদের কথা মনে রেখো এবং যখন এ-রকম প্রকৃত ঘটনার সন্ধান পাবে তখন কি করতে পারো দেখো।'

নির্মলবাবু বললেন, সন্ধ্যার সময় প্রার্থনার পর কথা হবে। ফিরে এলাম নির্মলবাবুর ঘরে। তাঁর কলম আবার চলতে লাগলো। তক্তপোশের ওপরে ছোটো একটি ডেস্ক, এই হ'লো তাঁর লিখবার ব্যবস্থা। এক-সময় তিনি কলম থামিয়ে দিলেন। গান্ধীজীকে মনে ক'রে একান্ত প্রিয়জন-সম্পর্কে সস্নেহ ভাষায় বললেন, 'প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয়ে বুড়োর এত দৃষ্টি, এমন সূক্ষ্মবোধ যে, সাধারণ লোকে তাঁকে ধরতে বা বুঝতেই পারবে না।' বললেন, 'রান্নাঘরটা ওঁর হাতে গেলে তবেই হয়েছে।' বুঝলাম নির্মলবাবুকে কতোখানি

হুঁসিয়ার থাকতে হয়। আবার বলেন, প্রত্যেকটা চিঠির সেদিনই উত্তর দিতে হবে, একটা ক'রে নকলও রাখতে হবে। একটা চিঠির উত্তর দিতে একদিন দেরি হ'য়ে গিয়েছিলো। গান্ধীজী বললেন, 'কিন্তু তারা কি মনে করবে?'

নির্মলবাবুকে আমি আগেও দেখেছি। কিন্তু সেই দেখা মোটে দেখাই নয়। সত্যিকারের মানুষটিকে আজই যেন প্রথম দেখছি। এমন পরম আনন্দে অমন কঠিন পরিশ্রম দিবারাত্রি ক'রে চলেছেন এ যদি নিজের চোখে না দেখতাম তবে গান্ধীজীকে দেখার আর-একটা দিক বাদ থেকে যেতো। ঘুমোন তিনি খুব কম সময়, খাওয়াও অদ্ভুত, শুধু এই বিরাট মানুষটিকে তিনি যেন অতি কাছাকাছি থেকে চিনতে এবং বুঝতে চেষ্টা ক'রে চলেছেন, সেখানেই রয়েছে নির্মলবাবুর নীরব সাধনা।

গান্ধীজীর সঙ্গে যে-ক'টি মানুষ সেখানে ছিলেন তাঁদের প্রায় সকলকেই তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন আলাদা-আলাদা গ্রামে কেন্দ্র ক'রে ব'সে যাবার জন্য। নিজে রয়েছেন পুড়ে-যাওয়া এক নির্জন বিষাদাচ্ছন্ন বাড়িতে দু-তিনটি মানুষ নিয়ে। সমস্ত ভারতবর্ষের প্রাণ এখানে স্পন্দিত হচ্ছে, প্রবল ব্রিটিশ শক্তি এদিকে দৃষ্টি মেলে রেখেছে। আমরা দেখি, সাতাত্তর বছরের এক ক্ষীণকায় বৃদ্ধ দু-তিনটি একান্ত অনুগত লোক নিয়ে বাংলা তথা ভারতের কঠিনতম সমস্যা সমাধানের জন্য, ইংরেজের কূটতম নীতিকে ব্যর্থ ক'রে দেবার জন্য সাধনা করছেন। একটি মুহূর্তও তিনি বৃথা নষ্ট হ'তে দেবেন না, একটি সুযোগও নয়। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতিতে তাঁর প্রতিটি পরিস্থিতি প্রতিফলিত হচ্ছে। অথচ কোথাও কোনো প্রকাশ নেই। সব নীরব, অনাড়ম্বর, যেন অতিসাধারণ প্রতিদিনের ঘটনাই ওখানেও ঘটছে। কথা বলবার সময় কোথায়? ছুটোছুটি হট্টগোল করবার মানুষ কোথায়? অন্ততঃ এখানে তাদের স্থান নেই।

নির্মলবাবু ক্ষিপ্র নিপুণ হাতে কাজ ক'রে চলেছেন। হালকা পায়ে গান্ধীজীর কাছে দ্রুত আনাগোনা করছেন এবং তাঁর সূক্ষ্ম মনের গতি বুঝে প্রতিটি কাজ ওজন ক'রে সমাধা করছেন। পরম শ্রদ্ধা ও অনুরাগে নির্মলবাবু যেন গান্ধীজীর মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে তাঁকে অনুভব করতে চেষ্টা করছেন।

সন্ধ্যায় প্রার্থনা শুরু হ'লো। সোদপুরে দেখেছি, চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে ঠিক যেন তেমনি ক'রে গান্ধীজীর প্রার্থনা-সভায় হাজার-হাজার লোক ছুটে চলেছে। কিন্তু এখানে কি দেখি? বোধ হয় শ'খানেক লোক একটি টিনের চালার নিচে ব'সে গান্ধীজীর প্রার্থনা শুনছে। তার মধ্যে আছে কয়েকজন মাত্র হিন্দু ও মুসলমান গ্রামবাসী, বাকি পুলিস, মিলিটারির লোক এবং প্রেস-রিপোর্টারের দল।

প্রার্থনার পর মৌন ভঙ্গ ক'রে তিনি বেরিয়ে পড়লেন বেড়াতে নোয়াখালির খেতের খোলা মাঠে। আমরা সঙ্গী হ'লাম। একটি মহিলা কলাপাতায় একটি ফুলের মালা এনে গান্ধীজীকে দিলেন। মধুর হাসি হেসে মালাটি তিনি আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'নাও।' অমন মিষ্টি হাসি যেন আর কোথাও দেখিনি।

জীবনে বড়ো বা বিশিষ্ট লোকদের কাছে যদি কখনো প্রয়োজনে যেতে বা কথা বলতে হয়েছে, প্রায় সকলের কাছে গিয়েই একটা দূরত্বের ব্যবধান বোধ করেছি। অন্তত প্রথমটা সংকোচ বোধ করেছি, অনেক সময় একটু বিব্রত বোধ করেছি। কিন্তু গান্ধীজীর কাছে একেবারে বিপরীত। প্রথম যখন তাঁর ঘরে ঢুকেছিলাম, তাঁর জোড়-হাতে হাসিমুখে অভ্যর্থনা আমাকে যেমন সহজভাবে ঘরে তুলে নিয়েছিলো, তেমনি এখন ফুলের মালাটি দিয়ে তাঁর ভুবনভোলানো হাসি যেন আমায় চিরপরিচিত ক'রে তুললো। অতি সহজভাবে তাঁর পাশাপাশি চলতে লাগলাম। মনে হ'তে লাগলো যেন মায়ের সঙ্গে

বেড়াতে বেরিয়েছি, গল্প করতে-করতে চলেছি। কোনো বিরাট ব্যক্তির পাশে রয়েছি সে-কথা মনে ছুঁয়েও গেল না। ছোটো-বড়োর বিন্দুমাত্র পার্থক্য না রেখে অজানিতে এমন বন্ধু যে তিনি কেমন ক'রে হ'য়ে গেলেন জানতে পারিনি। তখন শুধু জেনেছি, তিনি আমার পরম আপন এবং একেবারে পরিচিত। সোজা ব'লে চলেছি ভুল হিন্দীতে যা খুশি।

হাসিমুখে তিনি বললেন, 'তোমার প্রশ্ন সম্বন্ধে আমার যা বলার তা লিখে দিয়েছি। তুমি দেখতে থাকো যদি এ-রকম মেয়ে পাও।'

আমি বললাম, 'যদি আমি খুঁজি এবং এ-রকম মেয়ে পাওয়া যায় তবে তার final responsibility, শেষ দায়িত্ব আপনার থাকবে।'

তিনি রাজী হ'য়ে বললেন, 'আচ্ছা। এ-রকম বিয়ে করতে ইচ্ছুক ছেলে এবং মেয়েকে তুমি আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ো।'

তারপর খুব কৌতুকের সঙ্গে হাসতে-হাসতে বলছেন, 'তোমার ছেলে এবং মেয়ে তুমি খুশিমতো বিয়ে দেবে। ছেলে মেয়ের বিয়ে দিতে মা কি অন্যের উপর নির্ভর করে?' তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে সবাই খুব হেসে উঠলেন। আমিও।

এই সময়ে একটা ছোট্টো সুপুরিগাছের সাঁকো তিনি পার হ'তে যাচ্ছিলেন। তাঁর ধরবার মতো কিচ্ছু ছিলো না। ওঁর পা এবং লাঠি দুই-ই একটু কাঁপে। আমি তাড়াতাড়ি ওঁকে ধ'রে ফেললাম, যদি প'ড়ে যান। খুব হেসে বললেন, 'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, প'ড়ে গেলে তার পরে ধ'রো।' উনি এগুলি নিজে পার হ'তে চেষ্টা করেন। সাহায্য ছাড়া চলবার এই যে প্রয়াস তার পিছনে আর কি ছিলো জানি না। তবে শুনেছিলাম, আসন্ন ভবিষ্যতে উনি গ্রাম থেকে গ্রামে পায়ে হেঁটে যাবেন। সেই যাত্রার জন্য হয়তো নিজেকে তিনি এখন থেকে প্রস্তুত করছিলেন। শুনেছিলাম প্রতি ঘরে গিয়ে তিনি গ্রামবাসীদের বলবেন তাঁর কথা। নোয়াখালিতে যে-

আগুন জ্বলেছে তা আপন হাতে নিভিয়ে দেবার জন্য তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। গান্ধীজীর সেই যাত্রার পশ্চাতে কি নীতি, কি কর্মধারা ছিলো জানতাম না। তবে এমন-কিছু ছিলো যাতে দুঃখী গ্রামবাসী এবং ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট দুইয়ের দিকেই দৃষ্টি রেখে তিনি উপায় খুঁজছিলেন।

জিগ্যেস করলাম, 'এখানে হিন্দু মুসলমান পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস ফিরে আসা কি সম্ভব?' জোরের সঙ্গে তিনি বললেন, 'নিশ্চয় ফিরে আসবে। দক্ষিণ আফ্রিকায় এক শালা-ভগ্নীপতির মধ্যে চল্লিশ হাজার পাউণ্ড নিয়ে খুব ঝগড়া ছিলো। কিন্তু পরে তাদের মধ্যে পুনরায় সদ্ভাব ও সম্প্রীতি ফিরে আসে। এখানেও ফিরে আসবে।' আবার জিগ্যেস করলাম, 'কতোদিনে শান্তি ফিরে আসবে?'

বললেন, 'তা বলতে পারি না।'

বলি, 'বিশ্বাস ও শান্তি কেমন ক'রে ফিরে আসবে?'

তিনি বললেন, 'এক-একজন সাহসী ব্যক্তি মৃত্যুপণ ক'রে গ্রামে গিয়ে বসবে। এইভাবে ক্রমে-ক্রমে কাজ হবে। তাদের দেখে গ্রামের লোকেরা সকালে গিয়ে সন্ধ্যায় ফিরে আসবে প্রথমে। তারপর আস্তে-আস্তে থেকে যাবে।'

আমাদের একজন প্রশ্ন করলেন, 'যারা গ্রামে ফিরে আসছে, মুসলমানেরা তাদের এই ব'লে শাসাচ্ছে যে, গান্ধী চ'লে গেলে কে তোমাদের রক্ষা করবে?'

এই কথা শোনামাত্র খুব জোরের সঙ্গে গান্ধীজী ব'লে উঠলেন, পূর্ণ শান্তি ফিরে না-আসা পর্যন্ত তিনি ছাড়বার পাত্র নন। **वह तो छोड़नेवाला नहीं है।** (উয়ো তো ছোড়নেওয়ালা নহী হ্যায়)।

প্রত্যেকটি কথা উনি এমন অনুপ্রাণিত হ'য়ে পরিপূর্ণ আত্ম-বিশ্বাস নিয়ে ব'লে গেলেন যে, কর্মীদের মনে আপনা থেকেই একটা আত্মপ্রত্যয় ও শক্তি সঞ্চার হ'য়ে যায়।

যত কর্মী ওঁর সঙ্গে নোয়াখালি গিয়েছিলেন তাঁদের প্রায় সকলকেই এক-একটি গ্রামে তিনি বসিয়ে দিয়েছিলেন। কোথাও একা, কোথাও দু-জন ক'রে তাঁরা এক-একটি কেন্দ্র গঠন করেছিলেন। যেন তাঁদের দেখে গ্রামবাসীরা নির্ভয়ে গ্রামে ফিরে এসে বাস করতে পারে, এই ছিলো উদ্দেশ্য। গ্রামবাসীরা কংগ্রেসের কর্মীদের নিজেদের গ্রামে বসতে দেখলে মনে অসীম শক্তি অনুভব করতো, যেন বাঁচবার একটা উপায় পেয়ে তাঁদের আঁকড়ে ধরতে চাইতো। তাদের সরল বিশ্বাস, আর্ত আবেদন গান্ধীজীকে কোন্ পথে নিয়ে চলেছিলো কি জানি। গান্ধীজী নিজে মৃত্যুপণ ক'রে ব'সে আছেন। তাই অন্যের কাছ থেকেও এই পণ দাবি করছেন। সফল তাঁকে হ'তেই হবে। **वह तो छोड़नेवाला नहीं है।**

গান্ধীজীকে তাঁর ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এসে মনে হ'লো যেন আকাশে বাতাসে এবং মনের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে উনি ব'লে চলেছেন, **वह तो छोड़नेवाला नहीं है।** সমস্ত ভারতবর্ষ নিয়ে গান্ধীজীর অস্তিত্ব। সেই পরিপূর্ণ সত্তা নিয়ে উনি সকলকেই জাগিয়ে দিয়ে ব'লে চলেছেন, **वह तो छोड़नेवाला नहीं है।** আমাদেরও উনি ছাড়ছেন না। ওঁর কাছে এলে কাজ না ক'রে থাকা অসম্ভব। কাজ আমাদের করতেই হবে, **वह तो छोड़नेवाला नहीं है।**

ভাগ্যে গান্ধীজীর কাছে এসেছিলাম। এমন তীব্র অনুভূতি, এমন ক'রে মজ্জায়-মজ্জায় মিশিয়ে দেওয়া প্রেরণা, এমন সহজভাবে অমন কঠিন সমস্যার আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত আগে তো কখনো জানিনি!

ফিরে গেলাম মধুপুরে। সেখানেই আমাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা। গান্ধীজী নিজের কাছে কাউকেই রাখছেন না। বহু লোক অজানা সেই গ্রামের সন্ধানে মাইল-মাইল পথ হেঁটে আসছে। কাছাকাছি যানবাহনের ব্যবস্থাও নেই। দূর-দূরান্তর থেকে ওই দুর্গম

পথে কতো লোকই যে ছুটেছে বৃদ্ধকে দেখতে, তার ইয়ত্তা নেই। যে যার মতো ব্যবস্থা ক'রে নিতে পারো নাও, নইলে চ'লে যাও। প্রেস-রিপোর্টাররাও ওখানে কাছাকাছি একটা বাড়িতে নিজেদের আড্ডা ঠিক ক'রে নিয়েছেন। তাঁরা অন্তত গান্ধীজীকে ছাড়তে পারেন না। ছায়ার মতো রয়েছেন তাঁর কাছাকাছি, কিন্তু একেবারে আলাদা হ'য়ে।

তার পরদিন একজন বললেন, 'চলুন একটা দাঙ্গাবিধ্বস্ত গ্রাম দেখে আসবেন।' এই গ্রামের হিন্দু গৃহস্বামীরা অধিকাংশই ছিলেন বর্ধিষ্ণু। ধনী দরিদ্র প্রত্যেকটা বাড়িই পুড়িয়েছে। যখন এক-একটা পুড়ে-যাওয়া বাড়ি দেখতে লাগলাম, মনটা যেন সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে উঠলো। প্রকাণ্ড এক-একটা বাড়ি, বিশাল তার বাগান, সব পেট্রোল ঢেলে জ্বালিয়ে দিয়েছে। এমন আগুন জ্বলেছিলো যে বাগান অবধি পুড়েছে।

সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি আমরা, যেন মৃত্যুর পরে শ্মশানে দাহ শেষ ক'রে একবার ভেবে নিতে চেষ্টা করছিলাম যে, কী হ'য়ে গেল! এমন সময় যেন চিতাভস্ম থেকে উঠে এসে একজন লোক জিগ্যেস করলো, 'মাগো, এখন আমরা তবে কি করবো?'

সেই জনশূন্য চিতাভস্মে-ঢাকা গ্রামের মধ্য থেকে এ কী প্রশ্ন? এ যেন প্রেতাত্মা, এ তো জীবন্ত মানুষ নয়! কী জবাব দেবো? গান্ধীজী বলেছেন, মৃত্যুপণ ক'রে সাহসভরে এক-একজনকে থেকে যেতে। সেই কথাটা উচ্চারণ করা দূরে থাক্ ম'রে-যাওয়া এই মানুষটির প্রশ্ন শুনে কান্না আসতে চায়। একে কেমন ক'রে বলি, এর পরেও আগুনে পুড়তে থাকো? জবাবে কিছুই মুখে আসে না। শুধুই বলি, 'তাই তো!'

এরা আমাদের কাছে আশ্বাস চায়, আমাদের দেখলে ভরসা পায়, কম্পিত পদেও সাহস ক'রে দাঁড়াতে চায়, চিতার আগুন

নিভিয়ে দিয়েও বেঁচে উঠতে চায়। গান্ধীজী তাই তো এসে দাঁড়িয়েছেন এদের পাশে, এদের হাত ধ'রে শক্ত মুঠিতে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চ'লে যাবেন, এই তাঁর পণ। একদিকে দেখলাম শ্মশানভস্ম, আর-একদিকে দেখি, সেই শ্মশানস্তূপেরই উপর ধীরে-ধীরে নতুন জীবনের অঙ্কুর ফুটিয়ে তুলবার ভার নিয়েছেন গান্ধীজী নিজের হাতে। ভয় কি?

ফিরে এলাম রামগঞ্জে। কাজ আরম্ভ ক'রে দিতে হবে, আর তো দেরি করবার সময় নেই।

॥ তেইশ ॥

নোয়াখালির অত্যাচারিত মেয়েদের বিয়ের ব্যাপার নিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে যে-আলোচনা হয়েছিলো, সেই অনুযায়ী মেয়ে খুঁজতে চ'লে যাই কুমিল্লায়। বিয়ের জন্য মেয়ে খুঁজতে আমি চেষ্টা করছি দেখে সবাই হাসে, আমিও। কিন্তু হাল ছাড়ি না। রিলিফ-কেন্দ্রে গিয়ে মেয়েদের কাছে চুপিচুপি জিগ্যেস করি। সাহস পায় না তারা অত্যাচারের ব্যাপার বলতে। যদি-বা বলে, অতি সংগোপনে, অতি সংকোচে। এই অবস্থায় গান্ধীজীর কাছে নিয়ে গেলে এরা হয়তো তখন স্বীকারই করবে না। তা ছাড়া, রিলিফ-কেন্দ্রের ভার নিয়ে যে-সব নেতারা ছিলেন তাঁদের কাছেও গেলাম। তাঁরা বলেন, অত্যাচারিত মেয়েদের কেসগুলি তাঁদের হাতে যা আছে তা তাঁরা প্রকাশ করতে রাজী নন, লিগ্যাল অ্যাড্ভাইসরের নিষেধ।

অনেক চেষ্টার পর আমি যা বুঝলাম তা এই: মেয়েরা অত্যাচারিত হ'য়ে থাকলে সহজে স্বীকার করতে চায় না। ফলে সঠিক খবর পাওয়া কঠিন। যারা স্বীকার করে তাদের মধ্যে বিবাহিতের সংখ্যাই বেশি এবং তাদের স্বামীরা সবাই প্রায় ফিরিয়ে নিয়েছে। অবিবাহিত ছোটো মেয়ে যারা আছে তারা প্রায় সবাই চোদ্দ বছরের নিচে, কাজেই বিয়ে দেওয়া যায় না। আবার যে-ছেলেরা বিয়ে করতে চান তাঁরা সামান্য হ'লেও একটু লেখাপড়া জানা মেয়ে চান, অথচ এরা প্রায় নিরক্ষর। কাজেই এদের মধ্যে বিয়ে ঘটানো কঠিন ব্যাপার। জানা ছিলো বাংলাদেশে বিয়ের জন্য ছেলে পাওয়া শক্ত। কিন্তু এটুকু জানা ছিলো না যে, মেয়ে পাওয়া আরো শক্ত। মনের মধ্যে নৈরাশ্য ঘিরে আসছে, এমন সময় এসে গেলেন সুচেতা কৃপালানী। তাঁর হাতে আমি বিয়ের ঘটকালির দায়িত্ব তুলে দিলাম। তিনি হাসিমুখে সেই দায়িত্বভার নিয়ে নিলেন। আমি তাঁর

নোয়াখালির অন্য কাজের ভার নিলাম। শেষপর্যন্ত তিনিও কিন্তু ওইরকম বিয়ে ঘটিয়ে দিতে পারেননি।

এসেছি দত্তপাড়ায়। রোজই যাই কয়েকজনে মিলে বড়ালিয়া গ্রামে। সেখানে পুনর্বসতি করাতে হবে গ্রামবাসীদের। একটা পোড়া বাড়িকে বাসের যোগ্য ক'রে একটি পরিবারকে সেখানে বসিয়ে দেওয়া হবে। বাড়িটার আধপোড়া টিনগুলো ভিটের ছাইয়ের উপর মুখ থুব্ড়ে প'ড়ে আছে। কতো শত ভাঙা শিশি-বোতল পেট্রোলের আগুনে গ'লে দলা পাকিয়ে পিণ্ড হ'য়ে আছে। বাড়ির মালিক সামনেই রয়েছেন। একে-একে তাঁরই হাতে জিনিসগুলো তুলে দিই। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কোনো-কোনোটা সযত্নে আলাদা ক'রে সরিয়ে রাখছেন, যেন বহুমূল্য ধন ফিরে পেয়েছেন। একটা পুরনো খল-নুড়ি ছাইয়ের গাদা থেকে উদ্ধার ক'রে তাঁর হাতে দেওয়া হ'লো। বহুপরিচিত সেই খল-নুড়ি পেয়ে করুণ একটু হাসি তাঁর মুখে ফুটে উঠলো। হাসি যে কতো করুণ, কতো বিষণ্ণ হ'তে পারে তা দেখেছি সেই নিভে-যাওয়া গ্রামে পুনর্বসতি আনতে গিয়ে।

দগ্ধাবশেষ পরিষ্কার করা হ'য়ে গেল। সুপুরিগাছের নতুন খুঁটি বসিয়ে আবার সেই পোড়া টিনগুলো এনে চাল বসানো হ'লো। পোড়া ভিটের উপর পোড়া টিন সাজিয়ে যে নতুন ঘর বাঁধা হ'লো তাতে পুরনো বাড়িটা যেন চিতা থেকে উঠে এসে দগ্ধদেহে হাসতে গিয়ে কাঁদতে লাগলো। ওই নতুন ঘরে পা দিতে গিয়ে সকলেই সেদিন বাড়ির কর্তার হাসিমাখা কান্নার সঙ্গে কেঁদেছে।

হিন্দু মুসলমান সকলের বাড়িতেই যাচ্ছি। উদ্দেশ্য, বাস্তুত্যাগীদের পুনরায় ফিরে আসতে উৎসাহ দেওয়া, সাহস যোগানো, আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা।

মুসলমানদের বুঝিয়ে বলি, সদ্ভাব সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনবার কথা, পরস্পরকে ভালোবেসে বসবাস করবার কথা। হিন্দুদের প্রতি তাদের অতীত অন্যায় বুঝিয়ে দিই। তারা সবই এমনভাবে স্বীকার ক'রে নেয়, অনুতপ্ত হয়, হিন্দুদের ফিরিয়ে আনার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে যে, অবাক হ'য়ে ভাবি, তবে ওই অমানুষিক অত্যাচার ঘটেছিলো কেমন ক'রে? অবশ্য পরে বুঝতে পারি, মূল কারণটা ছিলো তাদের নিজেদের গ্রেপ্তার হবার ভয়। তারা মনে করতো হিন্দুরা ফিরে এলে এবং সদ্ভাব রেখে চললে হয়তো গ্রেপ্তার হবে না। তাই এত নরম।

মুসলমানদের বাড়িতে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি। অন্ন সংস্থানের জন্য তারা স্ত্রী-পুরুষ ঘরে বাইরে খুব পরিশ্রম করে। বেশির ভাগই তারা দীন দরিদ্র। হিন্দুদের জমিতেই অধিকাংশ তারা চাষ করে, ধান বোনে, ধান কাটে। পরে নিজের বাড়িতে ধান আছড়ে ছাড়িয়ে হিন্দুদের বাড়িতে ব'য়ে দিয়ে যায়। অন্যের জমিতে কঠিন পরিশ্রম ক'রে সে পায় একটা সামান্য অংশ। নিজেদের জমি কম মুসলমানেরই আছে। কিন্তু তারা পরিশ্রমী, তাই সাহসী। হিন্দুরা অধিকাংশই আয়েশী ও পরমুখাপেক্ষী, তাই দুর্বল ও ভীতু।

চাষের সামান্য অংশ নিয়ে মুসলমানদের বছরের খাবার হয় না। তাদের বাড়িতে দেখেছি হাঁস, মুরগী, ছাগল, গরু। মুরগী তারা খায়, ডিম বিক্রি করে, ছাগল গরুর দুধও বিক্রি করে। নারকেল সুপারি যার যা আছে তাও বিক্রি করে। নিজেদের বছরের খাবার সংগ্রহের জন্য কী প্রাণপণ পরিশ্রম ক'রে যায় এরা! এদের মেয়েরা বাড়িতে ধান আছড়ায়। নোয়াখালিতে গরিব হিন্দু মেয়েরা এ-সব কিছুই করতো না। এই পরনির্ভরশীল লোকেরা মরবে না কেন? এখানে মুসলমানেরা দিবারাত্র পরিশ্রম ক'রে উৎপন্ন ফসলের ছোটো একটা অংশ পায় এবং সমস্ত বছর দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন যাপন

করে। তাদের শ্রমের প্রধান ফল ভোগ করে অন্যে। আবার ধানটা বাড়ি ব'য়ে দিয়ে যাওয়া পর্যন্ত মেহনত ক'রে যাবে তারা, কিন্তু ভাতটা রান্না করবার সময় হিন্দুরা তাদেরই দেবে সর্বাগ্রে দূর ক'রে, তারা তখন অস্পৃশ্য। কেন সহ্য হবে এত অপমান? এক সম্প্রদায়ের এই যে মানুষের প্রতি অন্যায় মনোভাব, এই যে হিংসা ও ক্রোধ উদ্রেককারী আচরণ যা ওরা স'য়ে এসেছে যুগ-যুগ ধ'রে— তারই স্বাভাবিক সুযোগ নিয়েছে আর-একটা সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান এবং ইংরেজ। সমাজের গ্লানি জ'মে-জ'মে যেখানে বিপ্লব এসে দেশকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে পারতো, সেখানে বিদেশী বণিক ও সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান সমাজের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে চক্রান্ত ক'রে অন্যভাবে নিয়ে এলো প্রতিবিপ্লব। সবই ঘোরালো। জটিল হ'য়ে উঠলো। আমরা, কর্মীরা তো দেশের দরিদ্র জনগণের মধ্যে, মুসলমানদের মধ্যে তেমন ক'রে কাজ করিনি— তাই সময়ে বিপ্লব আসেনি। গান্ধীজী কিন্তু এদের মধ্যে কাজ করবার জন্যই দিয়েছিলেন গঠনমূলক কর্মপন্থা। ক'জন কর্মী সে-কাজ করেছেন? অনুভব করি, অপরাধের আমাদের অন্ত নেই।

॥ চব্বিশ ॥

কয়েকদিন পরে সুচেতা কৃপালানী আমাকে জিগ্যেস করলেন, বিজয়নগরে নতুন কেন্দ্র খোলা দরকার, কেন্দ্রের ভার নিয়ে আমি যেতে চাই কিনা। সানন্দে আমি রাজী হ'য়ে গেলাম।

পৌঁছলাম বিজয়নগর। আরো পাঁচ-ছ'টা গ্রাম নিয়ে আমাদের কর্মক্ষেত্র। দ্বিতীয় দিনেই পূর্ণোদ্যমে কাজ শুরু হ'য়ে গেল। যত বাড়ি পুড়েছে, যত জিনিস লুঠ হয়েছে, ব্যবসায়ীর যত ব্যবসা নষ্ট হয়েছে সব নিজে চোখে দেখে, বাড়ি-বাড়ি গিয়ে তালিকা তৈরি করতে হবে। গভর্নমেন্ট ক্ষতিপূরণের জন্য যেটুকু দিচ্ছে তা এদের পাইয়ে দিতে হবে। বহু বাধাবিঘ্ন রয়েছে পদে-পদে।

প্রথমে গেছি কর্মী হিসাবে শুধু আমি ও অনিল সেন। পরে এসেছেন অন্য কর্মীরা। আমরা যোগেশবাবুর (মজুমদার) বাড়িতে কেন্দ্র স্থাপন করেছি। এই তিনজন মিলে প্রতি তাঁতীর বাড়িতে গিয়ে তাদের পুড়ে-যাওয়া, লুঠ-হওয়া তাঁতের তালিকা তৈরি করি। তার পরদিন দগ্ধ বাড়িগুলি দেখতে গেলাম। কোনো-কোনো বাড়িতে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশখানা ক'রে ঘর পুড়েছে। গরিবদের যা গেছে তার ভাষা নেই। ঘরগুলো দাঁত-বের-করা কঙ্কালের মতো প'ড়ে আছে। দগ্ধ বাড়ির তালিকা করতে গিয়ে হাত কেঁপে ওঠে।

লুঠ? এমন বাড়ি দেখিনি যেখানে লুঠ হয়নি। কিছু লোক সেই ভয়ংকর দুর্যোগের দিনে ভয়ে পালিয়েছিলো। পরে যখন ফিরে আসছে তখন আর প্রায় কিছুই পায়নি, হাহাকার-করা শূন্য ভিটেয় ব'সে চোখের জলে ভাসছে।

তালিকা লিখে চলি, ওরা চোখের জলে ভাসে। আমরা সান্ত্বনা দিই, ওরা সরল মনে শুনে যায়, আশ্বস্ত হ'তে চায় না। তবুও আমরা কাছে গেলে কতো যে খুশি হয়, সাহস পায়! পরমাত্মীয়ের মতো জড়িয়ে রাখতে চায়। এদের সঙ্গে থাকলে, এদের পাশে

এসে দাঁড়ালে তবে এরা জোর পায়, বিশ্বাস করে। নইলে ফিরে এসেও যাই-যাই করে।

বিজয়নগর ক্যাম্পের অধীনে যে-গ্রামগুলি রয়েছে তাদের সমস্যা অনেক। কয়েকটা গ্রামের দুঃস্থরা ফ্রি রেশন ঠিক মতো পাচ্ছে না। কারণ, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট নাকি বলতে চান, গ্রামগুলো মোটেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। আমরা কিন্তু নিজেরা গিয়ে তাদের দুর্দশা দেখেছি, লুঠ হওয়া তাঁতের তালিকা তৈরি করেছি, তবু বলে, কিছু ক্ষতি হয়নি।

আর-একদল লোক যখন আশ্রয়কেন্দ্র থেকে বাড়ি ফিরে আসছে পুনরায় বসবাস করবার জন্য, তাদের কিছুদিন ফ্রি রেশন পাবার টিকিট দিয়ে দিয়েছে, তবু তারা রেশন পাচ্ছে না। কি করা যায়! আমরা পরামর্শ করতে চ'লে যাই সুচেতা দেবীর কাছে বড়ালিয়ায়, পাঁচ মাইল দূরে।

সুচেতা দেবীর কেন্দ্রে ঢুকতেই দেখি, তিনি বারান্দায় ব'সে গ্রামের রাজনীতি শুনছেন, সমাধান দিচ্ছেন। তাদের দিয়ে তিনি কাজ করিয়ে নিতে চেষ্টা করছেন। বলেন, কাজ করলে তবে জামা-কাপড় পাবে। শুধু-শুধু ভিক্ষে চেয়ো না। পরিশ্রম করো, কাজ করো, জিনিস নিয়ে যাও। শুনতে আমার খুব ভালো লাগে। আমরা যখন আমাদের কেন্দ্রে ওই কথা বলি, ওরা কিন্তু সে-কথার মূল্য দিতে চায় না। শুধুই চাইতে এবং ভিক্ষে নিতে যেন ওদের বেশি ভালো লাগে।

তারপর আমাদের সমস্যা নিয়ে পরামর্শ দেন সুচেতা দেবী। তিনি বলেন, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে রেশনের সব কথা লিখে জানাবে, ঝগড়া করতে হবে, রেশন আদায় ক'রে নেবে। সেদিন বিজয়নগরে ফিরে আসার সময় তিনি দিয়ে দিলেন সঙ্গে একটি মেয়ে-কর্মীকে, নাম কল্যাণী দত্ত।

গেছি আমেদপুরে। এখানে কর্মী আছেন অশোকা গুপ্ত। সেখানে তাঁতীরা জানায়, 'সুতোর সমস্যা চলছে'। গান্ধীজী বলছেন, ফেনী থেকে সুতো পেতে পারি। কিন্তু সেই খদ্দর বিক্রি করবার ভার নেবে কে?' অশোকা ওদের বুঝিয়ে বলেন, নিখিল ভারত কাটুনী-সংঘের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তারা আবার বলে, 'গান্ধীজীর শর্ত হচ্ছে, যারা ফেনীর চরকার সুতো নেবে, তারা শুধু খদ্দরই বুনবে, মিলের কাপড় বুনতে পারবে না। কিন্তু তাতে আমাদের লাভ ক'মে যাবে, আমরা দুই-ই বুনতে চাই।'

এ-সমস্যার সন্তোষজনক উত্তর সহসা দেওয়া সম্ভব নয়। স্থির হ'লো গোপীনাথপুরে গিয়ে পরে পুনরায় আলোচনা করবো।

বিজয়নগর থেকে গোপীনাথপুর দু-মাইল পথ। বহু দুঃস্থ সেখানে ফিরে এসে জড়ো হয়েছে। আমরাও পরদিন গেছি। আমাদের কথা শুনবার জন্য উন্মুখ তারা। সুতো সম্বন্ধে নতুন কথা বলতে পারি না। শুধু গান্ধীজীর গঠনমূলক পরিকল্পনা বুঝিয়ে দিই। আত্মনির্ভরশীল হ'য়ে নিজের পায়ে সাহস রেখে তাদের গ্রামে থেকে যেতে বলি। শোনে তারা আগ্রহের সঙ্গে, কিন্তু উৎসাহ পায় না।

এক-একটা গ্রামে যাই, তাদের নষ্ট বাড়িঘর জিনিসপত্রের তালিকা করি এবং সঙ্গে-সঙ্গে সার্কেল-অফিসারকে পাঠিয়ে দিই ক্ষতিপূরণের জন্য।

বিজয়নগরের মুসলমানদের ঘরে-ঘরেও যাই, তাদের সঙ্গে মিশি। এতদিন তো হিন্দুদের পাশাপাশি শান্তিতেই ছিলো এরা। এখন হিন্দুরা চ'লে যাওয়াতে দৈনিক খেটে খাওয়ার কতো কাজ, খেতের কতো কাজ বন্ধ। আমরা বলি, 'আপনারা দায়িত্ব নিয়ে হিন্দুদের ফিরিয়ে আনুন।' মুখে তারা সবাই রাজী। আমরা আরো বলি, 'আমাদের ক্যাম্পে ডাক্তার আছেন, ওষুধ আছে, দুধ আছে। যা

দরকার নিতে আসবেন।' প্রথমে আমাদের অবিশ্বাস করতো। পরে কিন্তু আমাদের ক্যাম্পে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতো।

তার কয়েকদিন পরে একদিন সন্ধ্যায় ফিরে এসে শুনি, আমাদের বাজারে মুসলমানদের জোর মিটিং চলছে, তার গণ্ডগোল নাকি বহুদূর থেকে শোনা যাচ্ছে। আমি তখন ক্যাম্পে একা। অন্য কর্মীরা গ্রামান্তরে গেছেন, তখনো ফেরেননি। যে-বাড়িতে আমরা ক্যাম্প ক'রে আছি সে-বাড়ির কর্তা যোগেশবাবু আমাকে খবরটা দিয়ে নার্ভাস-মুখে নিজের ঘরে চ'লে গেলেন। তাঁকে বললাম, 'ভয় কি ? যতক্ষণ আমরা আছি, কিছু ভয় নেই আপনাদের। আমরা বেঁচে থাকতে আপনাদের কেউ মারতে পারবে না।' তবু তাঁরা ভয়ে বিবর্ণ হ'য়ে রইলেন। আমরা সারারাত্রি প্রস্তুত হ'য়ে পাহারা দিতে থাকি, কিছুই ঘটলো না কিন্তু।

পরদিন কিছু টাকা নিয়ে আসেন সার্কেল-অফিসার। বাড়ি, ব্যবসা ইত্যাদির ক্ষতিপূরণের জন্য অল্প কিছু টাকা বিলি ক'রে চ'লে যান তাঁরা। ব'লে যান, আবার শিগ্‌গিরই আরো টাকা নিয়ে আসবেন।

গ্রামের বুভুক্ষু প্রত্যাশীরা প্রাতঃকাল থেকে রোদে শুকিয়ে ব'সে আছে টাকার আশায়। শূন্য মনে বাকিরা সন্ধ্যার আঁধারের মতো নিঃশব্দে মিলিয়ে যায়। সবই যাদের গেছে তাদের এই টাকার আশাই বা কতোটুকু ?

এইভাবে কাজ চ'লে যাচ্ছিলো। একদিন সতীশবাবু (দাশগুপ্ত) খবর পাঠালেন, গান্ধীজী গ্রাম পরিক্রমা ক'রে চলেছেন যে-পথ দিয়ে, তার মধ্যে আমাদের গ্রাম প'ড়ে যাবে। তিনি আসবেন হয়তো আমাদের ক্যাম্পে। যাঁরা এই বার্তা নিয়ে এসেছেন তাঁদের মুখে সতীশবাবুর দেওয়া প্রত্যেকটি নির্দেশ বুঝে রাখি। নন্দীগ্রাম থেকে গান্ধীজীকে নিয়ে আসতে হবে আমাদের। তাঁর আসবার

রাস্তাটা তৈরি করতে হবে। তাঁরা ব'লে গেলেন, অন্যান্য সমস্ত দায়িত্বই আমাদের, তবু পাকা কথা সেদিন হ'লো না। কিন্তু প্রস্তুতি শুরু হ'য়ে যায় খাতায় আর মনের পাতায়।

লক্ষ্মীপুরে যাওয়া দরকার। যদি গান্ধীজী আসেন সেই উপলক্ষে লক্ষ্মীপুরের ক্যাম্পের রিফিউজিদের পুনর্বসতি করানো যায় কিনা সেটা একবার চেষ্টা ক'রে দেখবো। গান্ধীজীর আমাদের ক্যাম্পে আসা সম্বন্ধে তখনো নিশ্চিত ছিলাম না। তাই তাঁর আসবার কথা না-ব'লে নানা যুক্তি দেখিয়ে তাদের ফিরে আসতে অনুরোধ-উপরোধ করতে থাকি। একটি বুদ্ধিমতী বউ এমনভাবে আমাদের কথা কেটে-কেটে দিচ্ছে, অবাক হ'য়ে যাই! বলে, 'গুণ্ডারা সব ধরা পড়েছে কি? গ্রামের অমুক-অমুক উকিল এবং বড়োলোকরা বাড়ি ফিরে গেছেন কি?' উত্তরে বলি, 'না ভাই, তা তো হয়নি। বড়োলোকরা এখন কি ফিরবে? নিরীহ দরিদ্ররা বিপদ মাথায় নিয়ে বসবাস করলে যখন গ্রাম বিপদমুক্ত হবে তখন সেই নিরাপদ গ্রামে ফিরে আসবে বড়োলোকের দল। তাদের উপর আশা করো কেন, বোন? নিজের উপর সাহস রেখে, ভরসা রেখে ফিরে চলো। আমরাই তো আছি, ভয় কি?' বউটি বলে, মরতে তারা ভয় পায় না, কিন্তু মেয়েদের উপর অত্যাচার সইতে রাজী নয়। তারপর আমাদের জেরা করে, আমরা তাদের ফিরে আসতে বলছি কিসের জোরে? আমরা নিজেরা এখানে থাকবো ক'দিন? তারপর কি হবে? অনেক, অনেক প্রশ্ন তার। অবাক হ'য়ে যাই। গ্রামের বউ, এত কথা কইতে শিখলো কেমন ক'রে?

ফিরে আসি বিজয়নগরে।

॥ পঁচিশ ॥

সতীশবাবু আবার লোক পাঠিয়েছেন। পাকা কথা নিয়ে এসেছেন এবার। আমাদের ক্যাম্পে ৯ এবং ১০ ফেব্রুয়ারি ছু-দিন থাকবেন গান্ধীজী। তিনি থাকবেন আমাদের ঘরের অতিথি হ'য়ে। এই সত্যটা হৃদয়ের অন্তঃস্থলে অনুভব করতে চেষ্টা করি। তাঁর আসার আয়োজনের জন্য প্রস্তুত হ'তে হবে। কতোটুকু বা সময়! এরই মধ্যে নন্দীগ্রাম থেকে বিজয়নগর অবধি আড়াই মাইল তিন মাইল রাস্তা তৈরি করতে হবে। আবার আমাদের ক্যাম্প থেকে প্রার্থনা-সভা পর্যন্ত প্রায় সোয়া মাইল যাবার পথটাও ঠিক করতে হবে। তা ছাড়া আছে অতিথিদের জন্য তাঁবু ফেলার ব্যবস্থা, বাড়িটার জঙ্গল পরিষ্কার করা, গান্ধীজীর থাকবার ঘর ঠিক করা, অন্যরা কে কোথায় থাকবেন তার ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি অতিথিদের ছু-দিনের খাওয়া, শোওয়া, স্নান, ল্যাট্রিন ইত্যাদির সব আয়োজন করা। এত বড়ো দায়িত্ব আমি আগে তো কখনো পালন করিনি। তবু গান্ধীজীকে আমার ভয় ছিলো না, মনে হচ্ছিলো, সেই বাপুজীই তো আসছেন, আমি ঠিক পারবো।

এদিকে আমাদের কিছুই নেই। আছি যোগেশ মজুমদারের বাড়িতে। তাঁর অনেক-কিছু লুঠ হয়েছে, কিছু পুড়িয়েছে, ধর্মান্তরিত করেছে, লীগের চাঁদা নিয়েছে। এমন বাড়ি দেখিনি যারা সে-সময়ে ওখানে ধর্মান্তরিত হয়নি। জোর ক'রে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিলো ব'লে তারা অবস্থা শান্ত হ'য়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গে আবার স্বাভাবিক-ভাবে নিজের ধর্মানুষ্ঠান পালন ক'রে চলেছে। এটা একটা সুলক্ষণ। জাতিভেদ প্রথাটা যদি এভাবে মুছে যেতো! এই যোগেশবাবুর বাড়িতে আমাদের ক্যাম্পে আসছেন গান্ধীজী। তাঁকে ধরে না কোথাও, তবু শ্মশানভূমি নোয়াখালির গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চলেছেন তিনি পায়ে হেঁটে। নোয়াখালির পথ বুঝি তাঁর সঙ্গে কথা

কয়। এর মধ্যে রয়েছে তাঁর শান্তির তপস্যা, তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক মীমাংসার সাধনা, আছে তাঁর জগতে অহিংসা ও প্রেমের উচ্চতর সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন। পথে চলতে মুসলমানদের বাড়ির অতিথি হ'তেই তিনি বেশি ইচ্ছুক, যদি সে-মুসলমান হন দাঙ্গাতে নির্দোষ এবং দরিদ্র। দরিদ্র তো ওরা নোয়াখালির ঘরে-ঘরে, কিন্তু নির্দোষ কোথায়? বিরল তারা। কাজেই আকাঙ্ক্ষা তাঁর পূরণ হয় খুব কম। সেই দারুণ দুর্যোগের দিনে বাইরে থেকে দুর্বৃত্তের দল এসেছিলো ঠিকই। কিন্তু তাদের সঙ্গে যোগ দেয় প্রথমে গ্রামের দুর্বৃত্তেরা। তারপর যখন চারিদিকে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে, সেই প্রলোভনের ঢেউ অতি অল্প লোকেই সামলাতে পেরেছে, এমন কি নির্বিরোধ লোকেরাও সেই কলুষ থেকে একেবারে মুক্ত থাকতে পারেনি। তারা ভবিষ্যৎ ভাবেনি, লোকের অন্তিম আর্তনাদে কর্ণপাত করেনি, অতীত বন্ধন মানেনি। উন্মাদনায় মেতে গিয়ে অন্ধ বেগে লুঠ করেছে, আক্রমণ করেছে। সোনার নোয়াখালি প্রেতভূমি হ'য়ে গেছে। গান্ধীজী চলেছেন সেই প্রেতভূমিকে সোনার ভূমিতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। তাঁর পায়ে-পায়ে তাই নোয়াখালির নতুন রাস্তা সভয়ে আস্তে-আস্তে কথা কয়, আবার যেন আশার আলো প্রত্যূষের আভা নিয়ে দেখা দেয়। একদিন হয়তো সমস্ত চলা তাঁর সার্থক হ'য়ে উঠবে, চলছে তারই প্রস্তুতি। গতিবেগ অতি মন্থর।

তাঁর সেই পুণ্য আগমনের যাত্রাপথে প'ড়ে গেছে বিজয়নগর। সেখানে থাকবেন তিনি পুরো দু-দিন। বিজয়নগর তাই প্রস্তুত হচ্ছে তার ক্ষীণ বাহু নিয়ে।

অবিশ্রাম কাজ চলেছে। আর চারদিন মাত্র বাকি আছে। রাস্তা তৈরি যেন শেষ হ'তে চায় না। ক্যাম্পের কর্মী অনিল,

কালিপদ ডাক্তার, বঙ্কিম, কৃষ্ণ ও যোগেশবাবু উদয়াস্ত রাস্তা তৈরির কাজে ব্যস্ত। এই পাঁচজনে কতোটুকু বা হয়? প্রয়োজন অন্তত একশত জনের। সময় কম, অথচ আড়াই মাইলেরও বেশি রাস্তা বাকি প'ড়ে আছে। কোথায় বা লোক, কোথায় বা যথেষ্ট দা, খন্তা, কুড়ুল, কোদাল? সবই তো লুঠ হ'য়ে গেছে। ওদিকে ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ড থেকে বড়ো-বড়ো মাটির ঢেলা এনে রাস্তার উপর ফেলে দিয়ে যাচ্ছে। সেই শক্ত-শক্ত মাটির ঢেলার উপর দিয়ে জুতো পায়েই চলা ভীষণ কষ্টকর। বারণ করলেও শোনে না। আমাদের ছেলেরা মাথায় হাত দিয়ে বসেছে। কেমন ক'রে তারা গান্ধীজীর খালিপায়ে চলার রাস্তা তৈরি করবে? মসৃণ পথ হওয়া দরকার যে। গ্রামের প্রধানদের অনুরোধ করি ওটা বন্ধ করবার জন্য। তবুও খানিকটা পথ খারাপই র'য়ে যায়। তখন সেখানটা মাঠের মধ্য দিয়ে নামিয়ে নেওয়া হ'লো। আলাদা রাস্তা সেটুকু।

দারুণ প্রয়োজন কর্মীর, সময় নেই আর। বিজয়নগরে তত পুনর্বসতি তখনো হয়নি, কাজেই কাজ করবার লোক কম। ওই কয়টি লোকের অত বড়ো রাস্তা তৈরি করা এগোয় না। ডাকি মুসলমানদের। তাঁরা মুখে রাজী হন, কথাও দেন, কিন্তু কাজের সময় উপস্থিত হন না। শেষে ডেকে পাঠাই পার্বতীনগর গোপীনাথ-পুরের ফিরে-আসা লোকদের। আসে হাসনাবাদ, জহানাবাদ, হেতিমপুর, সোনাপুরের ফিরে-আসা দুঃস্থ হিন্দুরাও। শেষ তিন-চার দিনে রাস্তা তৈরি হ'য়ে যায়।

ওদিকে ক্যাম্পের ভিতরে কাজ রয়েছে অজস্র। ক্যাম্পের মেয়ে-কর্মী অর্চনা, কল্যাণী, মীরা ক্যাম্প পরিষ্কার করছে। দিবা-রাত্রি কাজ চলছে। অতিথি মেয়েদের জন্য স্নানের ঘর তৈরি করতে হবে। উঠানের মধ্যে খট্‌খটে রোদ আসে এমন জায়গায় গান্ধীজীর স্নানের ঘর করবার জন্য আটটি খুঁটি পুঁতে রাখতে হবে। কতগুলি

ল্যাট্রিন তৈরি করতে হবে। তাঁবুর বন্দোবস্ত করতে হবে। অত লোকের রান্নার জন্য চালা বাঁধতে হবে। কাঠ কাটিয়ে রাখতে হবে। লক্ষ্মীপুর থেকে চাল ডাল তরকারি প্রভৃতি রান্নার যাবতীয় জিনিস আনতে হবে।

আস্তে-আস্তে সব একে-একে এসে যাচ্ছে। বঙ্কিম এবং কৃষ্ণ হিসেব ক'রে-ক'রে ভাঁড়ারে তুলছে, এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই। লোকদের শোবার জন্য তক্তপোশের বদলে খড়ের ব্যবস্থা হয়েছে। মাঠ থেকে খড় কেটে তুলে এনে শুকোতে দেওয়া হয়েছে। সুচেতা দেবীর সেক্রেটারি ভরত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে কিছু যেন ত্রুটি না হয় সুচেতা দেবীর ক্যাম্পে। হুঁশিয়ার সেক্রেটারি ভরত।

শেষ মুহূর্তে মুস্কিল হ'লো গান্ধীজীর দুধের ছাগল নিয়ে। ছাগল দেবার ভার নিয়েছিলেন যে-ভদ্রলোক, তিনি জানালেন যে, পারবেন না দিতে। তবে এখন গান্ধীজীর দুধ যোগাড় করি কেমন ক'রে? একটি দিন মাত্র বাকি আছে। কি করি উপায়? ভরত সাহস দেয়। নিজেই রাধাপুর চ'লে যায় ছাগল আনতে। আমি তবু অন্য জায়গায় ছাগল কিনতে লোক পাঠাই, যদি ভরত না পায়! যে যেখানে আছে সবার কাছে লোক ছুটিয়ে ব্যস্ত করি। আমার তাড়ার চোটে অবশেষে যখন একে-একে ছাগল আসতে থাকে তখন দেখি সাতটি মা আর তাদের তেরোটি বাচ্চা এসে উপস্থিত। সবাই হাসে আমার কীর্তি দেখে।

ওদিকে গান্ধীজীকে অভ্যর্থনা করবার জন্য তোরণ তৈরি হচ্ছে। এদিকে ল্যাট্রিন তৈরি করার মধ্যে আমি নিজে রয়েছি। ল্যাট্রিন মীরাট কংগ্রেস অধিবেশনে দেখে এসেছি, ভারি সুন্দর বন্দোবস্ত। তারই অনুকরণে মাটি ব্লিচিং পাউডার সবই সামনে রাখা হ'লো। তখন কি জানি নোয়াখালির লোকে এগুলি ব্যবহার করতেই জানে না!

নির্দেশ আছে, গান্ধীজী এলেই তাঁকে গ্রামের এবং কর্মক্ষেত্রের সম্বন্ধে পুরো রিপোর্ট দিতে হবে। গত কয়েকদিন ধ'রে সেই সমস্ত রিপোর্ট তৈরি করছি। রিপোর্টের মধ্যে আমরা কি-কি কাজ করছি তা পুরো লিখতে হচ্ছে, তা ছাড়া কতো রকমের স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্ আছে, সমস্যা আছে, দাঙ্গার ফলে স্থানীয় অবস্থা আছে, আর আছে আমাদের কর্মক্ষেত্রের অসুবিধা সম্বন্ধে নালিশ।

৮ ফেব্রুয়ারি আমাদের বাড়ি জমজমাট হ'য়ে এসেছে। বিভিন্ন ক্যাম্পের মেয়েদের ডেকেছি। তাঁদের ক্যাম্পে হয়তো গান্ধীজীর যাওয়া হবে না, অথচ তিনি আসছেন আমাদের ক্যাম্পে। কাছাকাছি সব ক্যাম্পের মেয়েরাই এ-আনন্দে যোগ দিন, তাঁকে দেখুন, তাঁর কাছে যদি কিছু বলার থাকে সে-সুযোগ তাঁদের আসুক, পরস্পরকে একবার তাঁর আগমন উপলক্ষে দেখি, এই ছিলো আমার মনের কোণে আকাঙ্ক্ষা। বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে তাই অনেকে এসেছেন। হট্টগোল চলছে। গান্ধীজীর ঘর, তক্তপোশ, টেবিল সব ধোয়ামোছা হ'য়ে গেছে। তবুও সন্ধ্যার দিকে ময়লা হ'য়ে আসছে। সবাই একবার এ-ঘরে এসে দেখে যাচ্ছেন। পদধূলিতে তাই ঘরখানা কেমন হ'য়ে গেছে। মায়া (ঘোষ) এসে বলে, গান্ধীজীর ঘর এমন হ'য়ে থাকলে বকুনি খেয়ে আর রক্ষা থাকবে না। মায়া পরিষ্কার করতে লেগে গেল। রামপুরহাটের একনিষ্ঠ কর্মী মায়াও নোয়াখালিতে এসে একটা কেন্দ্রের ভার নিয়ে ব'সে গেছে। গান্ধীজী একবার রামপুরহাটে ওদের কাছে গিয়েছিলেন, সেই অনুযায়ী সে সারা বাড়িতে ফিনিশিং টাচ্ দিতে লেগে গেল রাত দশটা অবধি। সেটা যেন সন্ধ্যা।

আমাদের রান্না করতো স্থানীয় যে-মেয়েটি, তাকে আমি দুপুরে বলেছিলাম, গান্ধীজী এলে যে-মুসলমানেরা খেতে আসবে তাদের সকলকে হিন্দুদের মতো যত্ন ক'রে খাওয়াতে হবে এবং সবাই এক-

সঙ্গে খেতে বসবে, হয়তো ঘরেও খাওয়া হবে। তাতে সেই মেয়েটি আমাকে ঘোর আপত্তি জানায়। আমি বলি, 'দাঙ্গার সময় যখন ওরা ওদের হাঁড়ি কড়া মেজে ধুয়ে দিয়ে তোমাদের রান্না ক'রে খেতে বললে তখন তোমরা খেলে কি ক'রে? তার পরেও যদি নিজেকে হিন্দু মনে করো তবে আর-কোনোদিনই তোমার জাত কেউ মারতে পারবে না। ছুঁলে কখনো জাত যায় না। গান্ধীজী বলেছেন, মানুষ সবাই সমান।' শেষে কিন্তু দেখা গেল গান্ধীজী যেদিন এলেন সেদিন হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে খেয়ে গেলেন, সেই মেয়েটিও সবার সঙ্গে পরিবেশন ক'রে গেল, পরিষ্কারও করতে হ'লো, কিন্তু কিছুই তো তার মনকে স্পর্শ করলো না। যেন সব বিপুল স্রোতে ভেসে গেছে। আশ্চর্য মানুষের মন। আগের দিন যে কঠিন শৃঙ্খল তার মনকে বেঁধে রেখেছিলো, শত যুক্তিও নরম করতে পারেনি, পরের দিন সে আপনি হেসে জলের মতো সহজ গতিতে চ'লে যায়। আছে শুধু একটি ব্যক্তির উপস্থিতি।

সেদিন শুতে গিয়ে দেখি রাত দেড়টা। গান্ধীজীকে নন্দীগ্রাম থেকে আনতে যাবো শেষ রাত্রে। কাল যে তিনি আসবেন!

আজ ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭। ভোর তিনটেয় উঠেছি। গান্ধীজীকে আনতে যাবো। প্রস্তুত হচ্ছে কর্মীরা। পৌনে চারটেয় রওনা হয়েছি সবাই নন্দীগ্রামের দিকে। দল বেঁধে চলেছে মেয়েরা। সঙ্গে আছে ছেলেরাও। তৈরি করা রাস্তা ঠিক আছে কিনা তার তদারক ক'রে আগে-আগে চলেছে অগ্রগামীবাহিনী, মেয়েরা গান গেয়ে চলে মাঝে, পিছনে আসে গান্ধীজীদের প্রয়োজনীয় কাজ করবার জন্য বিদ্যুৎবাহিনী। শীতের শেষ রাতে, জ্যোৎস্নার আলোতে, হিমেল বাতাসে গ্রামকে জাগিয়ে দিয়ে সকলে মিলে গান করে 'নূতন যুগের ভোরে দিসনে সময় কাটিয়ে বৃথা সময় বিচার ক'রে।'

নন্দীগ্রামে পৌঁছেই দেখা হ'লো নির্মলবাবুর সঙ্গে। তাঁকে ঘিরে ব'সে চলে প্রথম আলোচনা। যা-কিছু গান্ধীজীকে জানাবার আছে সবই আগে নির্মলবাবুকে জানাতে হয়। তখন কি জানি আমাদের প্রশ্ন থেকে প্রশ্ন তৈরি ক'রে উনি বিকেলে বিজয়নগরের প্রার্থনা-সভায় গান্ধীজীর মুখে তার উত্তর শোনাবেন?

প্রথমে তিনি নিয়ে গেলেন আমাদের শাহ্‌ নওয়াজের কাছে। তিনি নোয়াখালি আসবেন সে-কথা আমরা কল্পনা করিনি। তাঁকেও আমরা নিয়ে যাবো গান্ধীজীর সঙ্গে। নোয়াখালির গ্রামে তাঁর থাকার প্রয়োজন ছিলো অনেকখানি। ইচ্ছা করে নোয়াখালির সমস্ত গ্রামে মুসলমানদের কাছে ওঁকে দেখিয়ে নিয়ে আসি। মানুষ যে সাম্প্রদায়িক-বিদ্বেষশূন্য হ'য়ে স্বাধীনতা-সংগ্রামে কতো বড়ো সদা-প্রস্তুত সৈনিক থাকতে পারে তা অনুভব করুক এই অতিসাম্প্রদায়িক নোয়াখালিবাসীরা। কয়েকঘণ্টা মাত্র ছিলেন তিনি বিজয়নগরে, তবুও আনন্দ হ'লো।

শাহ্‌ নওয়াজের কাছ থেকে যাই গান্ধীজীর কাছে। মানুবেন তাঁর পাশে ব'সে আছে, কি লিখছে। গান্ধীজী সেই প্রথম দিনের মতোই মধুর হাসি হেসে অভ্যর্থনা করলেন। জিগ্যেস করলেন, 'কতোদূরে নিয়ে যাবে?' বলি, 'আড়াই মাইল।' আবার বললেন, 'এখানকার আড়াই মাইল?' অর্থাৎ নোয়াখালির আড়াই মাইল এবং গান্ধীজীর আড়াই মাইলে অনেক তফাৎ। সত্যিই তাই।

ঠিক সাড়ে সাতটায় দেখি গান্ধীজী প্রস্তুত হ'য়ে রওনা হচ্ছেন। সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই কাঁধে হাত রেখে পথ চলতে শুরু করলেন। রাস্তায় এসে মানুবেন রামধুন গেয়ে চলেছেন আগে-আগে, পিছনে সবাই রামধুনে যোগ দিয়েছে। আমি চুপ ক'রে পথ চলছি ওঁর সঙ্গে। হঠাৎ দেখি আমার কাঁধে চাপ দিয়ে গান্ধীজী কিছু ইশারা করছেন। বুঝি না কি বলছেন। পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখি, 'প'ড়ে যাবেন না

তো? আবার কাঁধে একটু জোরেই চাপ দিচ্ছেন। কি ব্যাপার? রামধুন গাইতে বলছেন নাকি? তবু আমি নীরব। বোকা মেয়ের সঙ্গে আর না পেরে, একেবারে কাঁধের উপর দিয়ে গাল অবধি হাত বাড়িয়ে নাড়া দিয়ে দেন। বুঝতে আমার আর বাকি নেই যে, রামধুন গাইয়ে উনি আমায় ছাড়বেন। কী বিপদ! জীবনে কখনো রামধুন গাইনি। সকলের সঙ্গে গলাও মিলছে না। তবু উনি না-গাইয়ে ছাড়বার পাত্র নন। কাজেই ছেড়ে-ছেড়ে গেয়ে চললাম, 'রঘুপতি রাঘব রাজারাম পতিতপাবন সীতারাম, ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম সবকো সন্মতি দে ভগবান।' অনেকক্ষণ রামধুন গাইবার পরে মেয়েরা গান ধরলো, 'যে-রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙলো ঝড়ে, জানি নাই তো তুমি এলে আমার ঘরে।' একটার-পর-একটা রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে আড়াই মাইল তিন মাইল রাস্তা পার হ'য়ে তাঁকে সবাই মিলে নিয়ে এলাম বিজয়নগরে। পথে যত মুসলমান তাঁকে দেখতে এসে সারি-সারি দাঁড়িয়েছে তিনি তাদের সকলকে দু-হাতে সেলাম করছেন, তারা কিন্তু দু-একজন ছাড়া কেউ প্রত্যভিবাদন করছে না। মনটা আমার খারাপ হ'য়ে যায়। থাকতে না পেরে বলি, 'আপনাদের উনি সেলাম করছেন, আপনারাও করুন।' তবু তারা বেশির ভাগই সেলাম করে না।

বিজয়নগরে আমাদের ক্যাম্প সেদিন লোকে লোকারণ্য। কোথা থেকে আজ এত লোক এলো? এতদিন এত প্রয়োজনে কোথায় ছিলো সব? তবু তো গান্ধীজীকে দেখবার জন্য বিজয়নগর গ্রাম, আমাদের ক্যাম্প আজ কোলাহল-মুখরিত। গ্রাম গ্রামান্তর থেকে লোক এসেছে। সহাস্য উজ্জ্বল মুখ তাদের। জীবনের স্পন্দন অনুভব করি নোয়াখালির মাটিতে এতদিন পরে। মিষ্টি সুরে তারা প্রশ্ন করে, 'কোথায় গান্ধীজী?' বলি, 'এখন তো উনি ব্যস্ত আছেন, বিকেলে সবাই প্রার্থনা-সভায় যাবেন, তাঁকে দেখবেন, তাঁর কথা

শুনবেন।' তবু তারা যেতে চায় না। কোন্ ফাঁকে দেখা যাবে তারই সুযোগ খোঁজে।

সারাদিন গেল মহাউৎসবের হৈ-হৈ। বিকেলে গান্ধীজী রওনা হ'লেন প্রার্থনা-সভার দিকে। বলি, অনেক মেয়েরা এসেছেন দর্শনের জন্য। গান্ধীজী তাড়াতাড়ি মেয়েদের কাছে এসে স্নিগ্ধ হাসিমুখে জোড়হাতে দাঁড়ালেন। বললেন, 'প্রার্থনা-সভায় চলো।' তারা বলে, 'অনেক দূর, রাত হ'য়ে যাবে, রাস্তায় ভয়।' অর্থাৎ মুসলমানদের ভয়। গান্ধীজী তৎক্ষণাৎ অভয় দিয়ে বললেন, 'আমি আছি, কিছু ভয় নেই, এসো আমার সঙ্গে।'

পরম নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত পদক্ষেপে সেদিন নোয়াখালির কুলবধূরা গান্ধীজীর সঙ্গে চলেছে প্রার্থনা-সভায়। সেই জনতায় ছিলো হিন্দু মুসলমান, নারী পুরুষ সব। নির্বিঘ্নে তারা বাড়ি ফিরে গিয়েছিলো। সেদিন নোয়াখালির ভয়সংকুল রাস্তায় মেয়েরা সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত।

প্রার্থনা-সভায় যেতে প্রায় সওয়া মাইল রাস্তা। কাঁধে হাত রেখে আবার তেমনি ক'রে পথ চলতে শুরু ক'রে গান্ধীজী জিগ্যেস করেন, 'এখানে কিছু বলতে হ'লে কাকে বলবো?' বলি, 'আমাকে বলতে পারেন।' খুব কোমল স্বরে বলেন, 'ল্যাট্রিনের ব্যবস্থা তো ভালো হয়নি। মানু এ-বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা নিয়েছে। তুমি প্রার্থনা থেকে ফিরে এসে আজই সন্ধ্যার পর মানুর কাছে শিখে ল্যাট্রিন পরিষ্কার কোরো। আমি নিজে তারপর দেখবো, কেমন?' বললাম, 'ফিরে এসেই করবো, তারপর আপনি দেখবেন।'

বিজয়নগরের একজন বৃদ্ধ মুসলমান আগের দিন আমাকে অনুরোধ ক'রে রেখেছিলেন যে, গান্ধীজী যখন তাঁর বাড়ির পথে প্রার্থনা-সভায় যাবেন তখন যেন তাঁর বাড়িতে তিনি একটু বসেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম, একটা তক্তপোশে চাদর বিছিয়ে রাখতে। এই বৃদ্ধ মুসলমানটির অনুরোধ আমি সেই পথে যেতে গান্ধীজীকে

জানিয়ে রাখলাম। কিন্তু যখন সেই বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছি তখন দেখি, বসবার কোনো ব্যবস্থা তিনি করেননি। কিন্তু নিজে দাঁড়িয়ে আছেন। কাছে এলে আমি পরিচয় করিয়ে দিলাম। গান্ধীজী সেই বৃদ্ধ মুসলমানটির দীর্ঘ ও শুভ্র শ্মশ্রু সস্নেহে স্পর্শ ক'রে জিগ্যেস করলেন কতো বয়স তাঁর। দেখা গেল দু-জনেই প্রায় সমবয়সী। মধুর হেসে সমাদর ক'রে দু'টি কথা ব'লে গান্ধীজী তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে আবার এগিয়ে চললেন। আমি তখন মনের খেদটুকু জানালাম যে, বোধ হয় প্রতিবেশী মুসলমানদের আপত্তির ভয়ে এই বৃদ্ধ একটি তক্তপোশ পেতে রাখতে সাহস পাননি। গান্ধীজী হাসলেন।

সেদিন প্রার্থনা-সভায় বহুলোক উপস্থিত ছিলো। সেখানে যে-প্রশ্নের তিনি উত্তর দিলেন তা নির্মলবাবুর কাছে উত্থাপিত আমাদেরই সেই ভোরের প্রশ্ন। উত্তর শুনে আরো প্রশ্ন মনে জাগে, ফিরতি-পথে আবার জিগ্যেস করি। তখন তাঁর মৌন আরম্ভ হ'য়ে গেছে।

বাড়ি ফিরেই মনে পড়ে, ল্যাট্রিন পরিষ্কার করতে হবে। মানু-বেনকে ডাকি, কয়েকটি মেয়েকেও আসতে বলি। কোদাল ব্লিচিং পাউডার সবই সঙ্গে নিয়েছি। গিয়ে দেখি, যে-ল্যাট্রিন বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছিলো, সাধারণ লোকে সেটাকেই ব্যবহার করেছে, তাই তাঁর ঘরে গন্ধ আসছে। তক্ষুনি ওটার বেড়া ফেলে দিয়ে সুপুরি গাছগুলো কোদাল দিয়ে তুলে ফেলে দিলাম। মাটি আর ব্লিচিং পাউডার দিলাম যতখানি সম্ভব। আরো ছ'টা যে নতুন ল্যাট্রিন তৈরি করা হয়েছে, সবগুলির সামনেই মাটি ও ব্লিচিং পাউডার রাখা ছিলো। মানুবেন বললে, 'প্রত্যেকটি ল্যাট্রিনে কাগজ এঁটে বড়ো-বড়ো অক্ষরে লিখে দাও, মাটি ও ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করতে। যদি সর্বসাধারণ তবুও না দেয় তবে ভলান্টিয়ার গিয়ে নিজে ওগুলো দিয়ে আসবে। এই হচ্ছে নিয়ম।'

মীরাটের কংগ্রেসে কিন্তু কাগজ আঁটা ছিলো না, তবুও মাটি আর ব্লিচিং পাউডার ঢালতে লোকেরা ভুলতো না। এ-কথাটুকু নোয়াখালির লোকেরা কি কিছুতেই শিখলো না, কাগজে এঁটে অত মোটা-মোটা অক্ষরে লিখে দেওয়া সত্ত্বেও!

আজ ১০ ফেব্রুয়ারি গান্ধীজীর মৌন দিবস। গোপীনাথপুরের হিন্দু-মুসলমানেরা কাল এসে তাঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধ ক'রে গেছেন, তাঁদের গ্রামে একবারটি পায়ের ধুলো দিয়ে আসতে। মুসলমানদের' অনুরোধ উনি ঠেলতে পারেন না। রাজী হ'য়ে যান। শুনে আমার ভয়-ভয় করে। গতকাল প্রার্থনা-সভায় যাতায়াতের আড়াই মাইল রাস্তায় তাঁর কষ্ট হয়েছিলো। তার ওপরে গোপীনাথপুরের লোকদের বলা তিন মাইল তো ওঁর তিন মাইল নয়! শেষরাত্রে বৃষ্টি হ'য়ে গেছে। রাস্তা তত ভালো নেই। নির্মলবাবু বলেন, গান্ধীজীর আজ যাওয়া ভালো হবে না। উনি তাঁকে বোঝাতে চ'লে গেলেন। কিন্তু ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে এলেন। একে গান্ধীজী কথা দিয়েছেন, তাতে মুসলমানেরাও একান্তভাবে অনুরোধ ক'রে গেছে, কাজেই তাঁকে যেতেই হবে। যথারীতি সদলবলে রওনা হয়েছি গোপীনাথপুরের দিকে। পথে প্রায় তিন জায়গায় রাস্তার মধ্যখানে থুথু ছিলো। লক্ষ্য ক'রে তিনি এড়িয়ে গেলেন। পরে সন্ধ্যায় প্রার্থনা-সভায় এর উল্লেখ ক'রে রাস্তার মাঝখানে থুথু ফেলা সম্বন্ধে তিনি সতর্ক ক'রে দিয়েছিলেন।

যা হোক, পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধ'রে গোপীনাথপুরের দিকে চলার পর উনি ইশারায় জিগ্যেস করলেন, আর কতো দূর? লোকরা বললো, আরো পনেরো মিনিট যেতে হবে। উনি ঘড়ি দেখিয়ে বললেন, পঁয়তাল্লিশ মিনিট হ'য়ে গেছে, অর্থাৎ দেড় মাইল পথ পার হয়ে এসেছেন। লিখে জানালেন, 'রাস্তায় আমাকে বসিয়ে

দিয়ো না, ফিরে চলো—Don't make me collapse, let us go back.' গোপীনাথপুরকে পিছনে রেখে আবার বিজয়নগরের দিকে রওনা হ'লেন তিনি। কিন্তু সেদিন ওই তিন মাইল হাঁটতে তাঁর খুব কষ্ট হয়েছিলো, রীতিমতো হাঁপাচ্ছিলেন, তবুও গোপীনাথপুরের নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছতে পারেননি। উনি তো আর বোঝেননি যে, গোপীনাথপুরের লোকদের তিন মাইল আর তাঁর তিন মাইল সমান নয়!

শ্রান্ত গান্ধীজীকে যখন বিজয়নগরের বাড়িতে ফিরিয়ে এনে তাঁর ঘরে তুলে দিলাম, তখন তিনি আমার কাঁধের উপর থেকে হাত তুলে কান ম'লে দিয়ে মিষ্টি হেসে ইশারায় বললেন, 'অত দূরে আমায় নিয়ে গিয়েছিলে কেন?' আমারই যেন দোষ! বললাম, 'বাঃ! আমি বুঝি নিয়ে গেলাম?' উত্তরে শুধু মৌন দিবসের স্নেহভরা মধুর হাসি।

গান্ধীজীকে দেখতে যারা এদিক-ওদিক একটু ফাঁক খুঁজছিলো তাদের মধ্যে ছোটো ছেলে-মেয়ের দলও ছিলো। বোধ হয় তাদের উনি দেখেছিলেন। গান্ধীজী নারকেলের সন্দেশ খেতে ভালোবাসেন ব'লে কিছু তৈরি ক'রে রাখা হয়েছিলো। বাচ্চাদের দেবার জন্য তিনি আরো সন্দেশ চেয়েছেন। সকলকে দিয়ে তখন আর বেশি ছিলো না। মানুবেন তাই নিজের সন্দেশ ক'খানি গুছিয়ে নিচ্ছে বাপুজীকে দিতে বাচ্চাদের জন্য। জিগ্যেস করি, 'তুমি কি খাবে?' সে শিশুর মতো হেসে বলে, 'আমি তো তোমার অতিথি নই। আমার জন্য ভেবো না, আমি নিজেই সব দেখে-শুনে খেয়ে নেবো। বাপুজী তোমার অতিথি, তাঁকে তুমি দেখো।'

ওইটুকু মেয়ে, কী সুন্দর সহজ সরল ব্যবহার। অথচ চ'লে যায় দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে, কোথাও জড়তা বা দ্বিধা নেই, দেখলেই মনে হয় স্ট্রেট্-ফরওয়ার্ড মেয়ে। দিবারাত্র অবিরাম বাপুজীর সেবা ক'রে চলেছে, বলিষ্ঠ মানুষের পরিচয় যেন। মুগ্ধ হ'য়ে যাই।

পিয়ারীলালজীর ভাই রয়েছেন গান্ধীজীর সঙ্গে-সঙ্গে। তিনি এসে আমাকে জিগ্যেস করলেন; আমাদের এখানে কতো লোক খাচ্ছে এবং তারা কারা গান্ধীজী জানতে চান। প্রথম দিন খেয়েছে অনেক লোক। ব্যবস্থা করা হয়েছিলো এক-একবেলায় দেড় শত লোক খাওয়াবার মতো কিন্তু খাচ্ছে অনেক বেশি। দু-দিনের জন্য যা যোগাড় করেছি তার অনেক জিনিসই একদিনে প্রায় ফুরিয়ে গেছে। আমি আগে বুঝতে পারিনি যে, গান্ধীজী এলে অনাহূত অনিমন্ত্রিত অনেক লোক আসতে পারে। এখন গান্ধীজীর প্রশ্নের উত্তরে মোটামুটি লোক-সংখ্যার হিসাব যাও-বা দিতে পারি কিন্তু এরা সকলেই যে কারা তার মীমাংসা করতে রীতিমতো ঘাবড়ে যাই। শেষ অবধি সবই খোঁজ ক'রে উত্তর দিই। মনে আমার খুব ভয়, এত লোক খাচ্ছে ব'লে কি গান্ধীজী রাগ করবেন? অথচ জানতে চাইছেন, বলতে তো হবেই। কেন যে জানতে চাইলেন, অসন্তুষ্ট হ'লেন কিনা তা কিন্তু আমি জানতে পাইনি। গান্ধীজী কি ক'রে বুঝলেন যে, অনেক লোক খাচ্ছে? উনি তো সেদিকে যাননি! সবই কি থাকে তাঁর নখদর্পণে?

নির্মলবাবুর ঘরে আমরা অনেক সময়ই যাই। রাত হ'য়ে গেছে। সেখানে ব'সে আছেন অশোকা গুপ্ত, মায়া ঘোষ এবং অন্যরাও। সবাই নিজের-নিজের কর্মক্ষেত্রের বিশেষ সমস্যার প্রয়োজনীয় উত্তরগুলি বুঝে নেন। সব সময়ে গান্ধীজীকে বিরক্ত করতে ইচ্ছা করে না। নির্মলবাবু গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গি জানেন। অনেক উত্তর তিনিই দিয়ে দেন। কতগুলি উত্তর তো গান্ধীজী নিজেই প্রার্থনা-সভায় দেন। বেছে-বেছে প্রশ্ন তৈরি করেন নির্মলবাবু। সেদিন রাত অনেক হ'য়ে গেছে, আমার কথা শেষ হয়নি, উঠি কি ক'রে? আমাদেরই কর্মক্ষেত্রের সমস্যা যে! গান্ধীজী রয়েছেন আমাদের ঘরে, সমস্যাও আমাদেরই ইউনিয়ন বোর্ডের।

তার সমাধান তাঁর কাছে না চেয়ে কোথায় খুঁজবো ? তাই অন্যদের সময় কেড়ে নিয়ে বলতে থাকি আমাদের সমস্যা। নির্মলবাবু বলেন, কাল গান্ধীজীর কাছে এ-বিষয়ে আর-একটা পুরো রিপোর্ট দিতে। গান্ধীজীই ভার নেবেন। নিশ্চিন্ত মনে ফিরে আসি শুতে গভীর রাতে।

আজ ১১ ফেব্রুয়ারি। সকাল সাড়ে সাতটায় গান্ধীজী চ'লে যাবেন। ঘুম থেকে জেগেই মনটা কেমন বিষণ্ণ হ'য়ে আসে। বাতি-গুলো নিভে আসছে যেন। তবু এখনো উনি আছেন আমাদেরি বাড়িতে। সমস্ত নোয়াখালি, সারা বাংলা, সমগ্র ভারত আজ ওই ঘরের ছোট্টো তক্তপোশের উপরে বসা এক ক্ষীণদেহ বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সেখান থেকে যেন আলো বিচ্ছুরিত হ'য়ে পড়ছে সর্বত্র। দু'টি দিন রইলেন তিনি এখানে, টের পাইনি কী বিরাট আগমন তাঁর। আজ যাবার বেলায় মনটা অন্ধকার হ'য়ে আসছে। তবু তো এখনো আছেন।

ভোরে প্রার্থনার পরে এক ফাঁকে একবার গিয়ে খাটের ওপরে মাথা রেখে প্রণাম জানিয়ে আসি। বিদায় প্রণাম করতে সমগ্র দেহ-মন ভারী হ'য়ে এসেছে। মনে পড়ে যেদিন প্রণাম ক'রে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁকে নিয়ে এলাম বিজয়নগর। আর আজ বিদায়। হাসিকান্নায় সারা বিজয়নগর কানায়-কানায় ভ'রে গেছে। এমন করুণ বাতাস এখানে আর কোনোদিন যেন বয়নি।

ঠিক সাড়ে সাতটায় তিনি বের হবেন জানি। দরজার বাইরে সবাই অপেক্ষা করছে। অপেক্ষা করছে ভরত তার নিজ-হাতে-আঁকা ছবির বই নিয়ে, গঠনমূলক কর্মপন্থার ছবি। গান্ধীজীকে দেবে, আশীর্বাদ চায় সে। অপেক্ষা করছে বঙ্কিম এবং কৃষ্ণ, প্রণাম করবে মেদিনীপুরের হ'য়ে। অপেক্ষা করছেন যোগেশবাবু এবং তাঁর

বাড়ির আত্মীয়েরা। তাঁরই বাড়ির অতিথি আজ বাপুজী। অপেক্ষা করছে ক্যাম্পের মেয়েরা এবং ছেলের দল। গ্রামবাসীরাও আছেন।

বেরিয়ে এলেন গান্ধীজী। একে-একে প্রণাম করে সবাই। সবার সঙ্গে দু-একটা ক'রে কথা কইলেন। আমি কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম। আবার কাঁধে হাত রাখেন। কোমরে ঝোলানো ঘড়িটা বাঁ হাতে তুলে দেখিয়ে বলেন, 'দেখ্, তোর জন্য দু-মিনিট সময় আমি রেখে দিয়েছি। তোর ল্যাট্রিন এবার আমি দেখে যাবো।' সাড়ে সাতটা বাজতে তখনো দু-মিনিট বাকি। ভয়ে-ভয়ে তাঁকে নিয়ে এগিয়ে যাই ল্যাট্রিন দেখাতে। প্রথম দিন সেই বলেছিলেন ল্যাট্রিন পরিষ্কার করতে, নিজে দেখবেন তিনি, আর আজ সত্যিই দেখছেন। মানুবেন আমাদের শিক্ষা দিয়েছে, সেও আসে সঙ্গে। ল্যাট্রিনের কাছে গিয়ে গুজরাটি ভাষায় মানুবেন গান্ধীজীকে কি বললে জানি না। বেড়া ফেলে দেওয়া, সুপুরিগাছ তুলে ফেলা সেই ল্যাট্রিনকেও ব্যবহার করতে নোয়াখালির লোকেরা ছাড়েনি। অবশ্য ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো ছিলো।

আমাকে কিন্তু উনি এ-বিষয়ে আর-কিছু বললেন না। শুধু বললেন, 'তোর এ-দিকটা দিয়ে যাবো।' অর্থাৎ বাড়ির পিছন দিকটা দিয়ে। আমার তখন আরো ভয়। শত-শত লোক খেয়েছে দু-দিন ধ'রে। তার শত-শত কলাপাতা জ'মে বাড়ির পিছন দিকটা রীতিমতো আবর্জনায় নোংরা হ'য়ে রয়েছে। বেছে ঠিক সেই জায়গাটা দিয়েই যেতে চাইলেন। যেতে-যেতে সেগুলি দেখেই হাসিমুখে বলেন, 'এত ময়লা?'

বললাম, 'এসেই পরিষ্কার করবো।'

'করবি তো?'

বলি, 'হ্যাঁ, করবো।'

ওঁর সঙ্গে আমাকে রওনা হ'তে দেখে জিগ্যেস করেন, আমিও

সঙ্গে যাচ্ছি কিনা। বলি, 'আপনাকে কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে আসবো, সবটা নয়, আমার এখানে একটু responsibility আছে, যদি কিছু হারিয়ে যায়।' সবটাই হিন্দীতে বলেছি, শুধু responsibility কথাটা ইংরেজিতে। তক্ষুনি বললেন, 'responsibility কেয়া? জিম্মেদারি বোলো, জিম্মেদারি।' জিগ্যেস করেন ওর বাংলা প্রতিশব্দ কি? বলি, 'দায়িত্ব।' নোয়াখালিতে উনি বাংলা শিখছিলেন।

চলেছি গান্ধীজীর সঙ্গে। আবার রামধুন গেয়ে মানুবেন আগে-আগে চলেছে, সঙ্গে যোগ দিয়েছে সবাই, আমিও। উপায় নেই। কিছুক্ষণ পরে রামধুন থেমে গেল।

পথ চলতে-চলতে দুই ধারে যত হিন্দু এবং মুসলমানকে দেখছেন তাদের সকলকে তিনি দুই হাতে অবিরত নমস্কার এবং সেলাম ক'রে-ক'রে চলেছেন। প্রেম দিয়ে তিনি প্রতিপক্ষকে জয় করবেন, তাদের হৃদয় স্পর্শ করবেন, এই ছিলো তাঁর সাধনা, এই তাঁর জীবন-দর্শন। প্রতিটি সেলামে এবং চোখের দৃষ্টিতে রয়েছে তাঁর কী গভীর অনুরাগভরা আবেদন! তাঁর করুণাসুন্দর চোখ দুটিতে এবং অসীম মমতামাখা দুই হাতে প্রেম বিলিয়ে চলেছেন তিনি নোয়াখালির পথে-পথে। মুসলমানেরা কিন্তু দু-একজন ছাড়া তাঁকে ফিরে কেউ সেলাম করছে না। মনটা আমার দ'মে যায়। এরা কেন এমন করে? প্রত্যভিবাদন করতে ওরা তো খুবই জানে। তবে গান্ধীজীকে করছে না কেন? আমার মনের বেদনা তিনি লক্ষ্য করছিলেন। তাই আমাকে বললেন, 'ওরা নাই-বা করলো, আমার কর্তব্য আমি ক'রে যাবো। একাই তো চলতে হবে, একলা চলো, একলা চলো রে।' এইটুকু ব'লেই গানটা গাইতে বললেন। পিছনে যাঁরা ছিলেন তাঁদের গানটা ধরতে বললাম। তাঁরা গাইতে লাগলেন, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।'

তন্ময় হ'য়ে গান্ধীজী গান শুনছেন আর পথ চলছেন। যেতে-

যেতে অনুভব করতে লাগলাম, কী বিপুল একলা চলা তাঁর। এ বিরাট সংসারে এমন একা, এমন নিঃসঙ্গ আর কে? সহস্রের মধ্যে থেকেও একক যাত্রা তাঁর। অসীম সেই একা যাত্রী গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যেতে-যেতে পথের দু-পাশে বিলিয়ে চলেছেন তাঁর অহিংসা ও প্রেমের জীবনবার্তা, দুই বাহু বাড়িয়ে দিয়েছেন তিনি, কেউ শোনে, কেউ শোনে না। সেদিকে খেয়াল নেই তাঁর, পায়ের তলার ধূলি-কণার সঙ্গেও যেন তিনি কথা কন। তবু এই বিশাল বিশ্বে তিনি একেবারে নিঃসীম একা।

গান থেমে গেল। মাইলখানেক পথ এসেছি। এবার আমার ফিরতে হবে। এই দুই দিনের সব ভার তাঁর কাছে নামিয়ে দিয়ে ফিরে এলাম সেই পথ বেয়ে।

আঁধার-ঘেরা বাড়িতে ফিরে এসেছি। সব গোছাতে হবে। মহা-উৎসবের বাড়িটাকে নিমেষে ঘরোয়া বাড়ি ক'রে তুলতে হবে। শ্রান্ত দেহ, ক্লান্ত মন সকলেরই। তবু উৎসবান্তে উৎসবের শেষ কর্তব্য পালন করতে হবে।

চ'লে গেছে অশোকা, গেল দত্তপাড়ার মেয়েরা, যাচ্ছে মায়া, চ'লে যায় দূর গ্রামের স্বেচ্ছাসেবকের দল ও অন্য বোনেরা। দূরের ক্যাম্প থেকে যত ছেলেকর্মীর দল এসেছিলেন সকলেই একে-একে বিদায় নিলেন। ক্যাম্প প্রায় খালি হ'য়ে এলো। তবুও বাকি কাজ গুছিয়ে-গুটিয়ে আনবার জন্য কিছু কর্মী র'য়ে গেলেন। তাঁরাও ক্যাম্পের ছেলেদের সঙ্গে সমান পরিশ্রম ক'রে সারাদিনে ক্যাম্পকে আবার সেই পুরানো ক্যাম্পে পরিণত করলেন। সন্ধ্যাবেলায় এর রূপ দেখে আর চেনা যায় না যে, গতকাল ঠিক এই সময়ে এখানে কী বিপুল ঘটা, কী কলরোল ও সশব্দ আনাগোনা ছিলো। আর আজ সব স্তব্ধ নীরব, কোথায় বিলীন! জীবনটাই যেন এমনিতরো। কী দারুণ ছন্দপতন!

যেতে হবে এবার আমাকেও বিজয়নগর ছেড়ে। কয়েকদিন বড়ালিয়ায় থাকবো। সেখান থেকে ফিরে যাবো কলকাতায়। যাবার দিনে মনে হচ্ছে, বিজয়নগর ছেড়ে আমি থাকবো কেমন ক'রে? কিছুই তো কাজ করিনি। আরম্ভ হ'তে-না-হ'তেই চ'লে যাবো? কাজ যখন মাত্র শুরু হ'লো তখনই কি আমার যাবার সময় হ'য়ে এলো? গান্ধীজীর কাছে নালিশ করেছি, গ্রামগুলির প্রতি অবিচারের প্রতিকার এখনই শুরু হবার সম্ভাবনা। সবাই যেন পিছু ডাকছে। তারা বলে, 'আমাদের ফেলে যাবে কোথায়?' বলি, 'অন্যেরাই তো রইলেন, ভাবনা কি ভাই?' আসে গোপীনাথ-পুরের, আসে জহানাবাদের, আসে বিজয়নগরের লোকেরা। কী অসহায় করুণ তাদের চেয়ে-থাকা। ইচ্ছা করে, থেকে যাই এখানে। এদের মতো এমন ক'রে আমাকে কে আর চাইবে? এদের মতো এত প্রয়োজন আর কার আছে? ভরত বলে, 'থেকে যাও-না দিদি।' তবু চ'লে যেতে হয়।

ছেড়ে চলেছি বিজয়নগর। গলা আমার আটকে গেছে, মনে-মনে বলি, আবার আসবো আমি। ফিরে চলার পথ আমার ভারী হ'য়ে ওঠে, জগদ্দল পাথর যেন। পাশে যেতে-যেতে ভরত বলে, 'দিদি, পরাধীন দেশ ভরাই তো এমনি দুঃখ। তবু তুমি থেকে গেলেই পারতে।' আমি

'মন্দ চরণে চলি পারে
যাত্রা হ'য়ে আসে মোর সাঙ্গ।'

॥ ছাব্বিশ ॥

কলকাতায় ফিরে এসেছি। অবিরাম ঘুরে চলেছে পুরাতন সেই চক্র নতুন ক'রে। কাহিনী তার খুবই সংক্ষিপ্ত। মহাকালের যাত্রাপথে ভারতের পূর্বাকাশে একদিন দেখা দিলো ১৫ অগস্ট, ১৯৪৭ সাল। বালসূর্যরেখা তার তরুণ অরুণরাগে ভারতের রাজনৈতিক ললাটকে রাঙিয়ে তুললো। শিশু যেমন বিস্ময়ে অবাক নয়নে নতুন জগতকে কেবলি দেখতে থাকে, দেখা তার কিছুতেই যেন ফুরায় না, আমরাও সেই দিনটিকে নির্বাক নয়নে তেমনি ক'রেই দেখতে লাগলাম। শিশুর চোখের সামনে উদ্বেলিত সম্ভাবনাভারে ভবিষ্যৎ দিনগুলি একটি-একটি ক'রে এগিয়ে আসতে থাকে, তারই সঙ্গে-সঙ্গে প্রকৃতির সৌন্দর্য লুটে নিয়ে শিশু বড়ো হ'তে থাকে। ঠিক তেমনি ক'রে ভারতবাসী সেই নতুন অভাবনীয় দিনটির দিকে তাকিয়ে কল্পনায় অনাগত এক-একটি দিনকে অমরাবতী ক'রে গ'ড়ে তুলতে চাইলো, ভবিষ্যতকে ফুটিয়ে তুলতে চাইলো রূপে গন্ধে। তবু সেটা স্বাধীনতা ছিলো না, ছিলো ডোমিনিয়ান স্টেটাস্ বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন। কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতার অনাগত দিনটি সুনিশ্চিতরূপে হীরকখণ্ডের মতো অদূরে ঝিক্‌মিক্ ক'রে জ্বলছিলো। তাই তারা ১৫ অগস্টকেই স্বাধীন ভারতের অগ্রদূত মনে ক'রে আকুল আনন্দে বরণ ক'রে নিলো।

উচ্ছলিত আনন্দ নিয়ে এলো সঙ্গে-সঙ্গে বিষের জ্বালা। ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হ'য়ে গেল। আর উভয় খণ্ড ব্যেপে যে-রক্তনদী ব'য়ে চললো, তাতে শত নোয়াখালি ডুবে যায়। হিংস্র সমুদ্র যেন রাঙা ফেনা নিয়ে গ'র্জে-গ'র্জে একটার-পর-একটা তরঙ্গ তুলে এগিয়ে আসতে লাগলো। পাঞ্জাবে, বাংলায়, বিহারে আগুন লেগেছে। বিপুল একলা পথের যাত্রী গান্ধীজী একা ত্রস্তপদে ছুটে চলেছেন আবার তাঁর সেই গভীর প্রেমের বেদনাভরা দৃষ্টি নিয়ে।

ছুটে এলেন তিনি কলকাতায়। সেখানকার আগুন নিভিয়ে দিয়ে চ'লে গেলেন তিনি বিহারে, তারপর দিল্লী। সেই অনলের লেলিহান জিহ্বা গিয়ে অভয়দানরত তাঁর প্রেমময় হাত দুখানিকে ইহজগত থেকে সরিয়ে দিলো। বিশ্ব স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। সুদূর ভবিষ্যতে হয়তো কোনো-একদিন আসবে এই হিংস্র পৃথিবীতে তাঁর প্রেম ও অহিংসার জগৎ। সফল হবে সেদিন তাঁর উচ্চতর সভ্যতা আনবার সাধনা। নিজেকে নিঃশেষে হারিয়ে ফেলে মানবের মনুষ্যত্বের মধ্যে সেদিন বিরাজ করবেন গান্ধীজী।

১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি এসেছে পূর্ণ স্বাধীনতা। আজ ব'সে আছি যেন শূন্য মনে। প্রেসিডেন্সি জেলের গেটে গিয়েছিলাম, আমার দুঃখিনী বোনেরা মুক্তি পেলো কিনা দেখতে। তারা সব ছাড়া পেলো কই? 'জেনারেল এম্‌নেস্টি' কোথায়? সমস্ত ভারতবর্ষ যেদিন বিরাট কারাগার থেকে মুক্তি পেলো সেদিন হতভাগ্য সেই সব কয়েদীদের ক্ষমা নেই? হায় রে মানুষের বিচার! সবাইকে ডেকে-ডেকে বলতে ইচ্ছে করে, তারাও যে মানুষ। বেরিয়ে এলে এবং সুযোগ পেলে হয়তো এখনও তারা অনেকেই মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে পারতো। পেট ভ'রে খেতে পেলে অনেক হাবলুর মা-ই নবজাগ্রত দেশকে ধনেধান্যে ভ'রে তুলতে পারতো। দু-মুঠো খেতে ও পরতে পেলে এবং শিক্ষা পেলে অনেক মাদারীই স্নেহে, সেবায়, মমতায় সমাজকে উচ্চে তুলে ধরতে পারতো। যত সমস্যা কারার অন্তরালে আছে সেগুলিই তো দেশের গভীর সমস্যা, তাকে কি এইভাবে এড়িয়ে যাওয়া যায়? যে মহত্তর সভ্যতা গান্ধীজী জগতে গ'ড়ে তুলতে চেয়েছিলেন সেখানে কয়েদীরাও মানুষ। সমাজের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি তাদের বিকৃত ক'রে তুলেছে। এই সামাজিক অবস্থা থেকে, বিকৃতি থেকে তাদের মানুষ ক'রে

তোলা, মানুষের মতো বাঁচতে শেখানো, এও তো সেই সভ্যতারই একটা অঙ্গ। এরাও মানুষ হ'লে, সমাজ মনুষ্যত্বের পূর্ণ পরিচয় দেবে। তখনই মানুষ মহৎ হবে, সমাজ মহত্তর হবে। এই মহৎ মানবতা, এই মহত্তর সভ্যতা গ'ড়ে তুলতে চেয়ে গান্ধীজী নিজের জীর্ণ হাড় ক'খানি বিসর্জন দিয়ে চ'লে গেছেন।

হয়তো হবে, একদিন সবই হবে। শুধু আমরা দেখে যাবো না। আসবে নতুন স্রোত, বরষার জলধারার মতো সহস্র ধারায় নেমে আসবে সেই গতি, যা ভেঙে ভাসিয়ে নিয়ে চলবে পুরাতন 'যা কিছু কালো, যা কিছু মলিন।' পচা এই সমাজদেহে ওই জলধারার নিচে বীজ বপন হ'য়ে গেছে। নবাঙ্কুর উদ্গম হ'য়ে আসবে একদিন সুপ্রভাত। পুষ্পে বর্ণে সৌরভে লাবণ্যে পরিপূর্ণ হ'য়ে একদিন জেগে উঠবে 'স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে যে আমার জন্মভূমি।'

সেদিন অনাহারে অবহেলায় একটি মানুষও ভেসে যাবে না। জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিক্ষা, সুযোগ সৃষ্টি করবে নতুন সভ্যতা, সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে তার জ্যোতি।

॥ সাতাশ ॥

জীবনের দিগন্তে এসে ছায়াখানি যখন মিলিয়ে যেতে চায় তখন একবার নতুন ক'রে দেখে নিই অপর প্রান্ত থেকে ভেসে আসা আলো-আঁধারের খেলাগুলি। মনে হয় যেন সেদিন জাতির মর্মে ছুটে চলেছিলো অবিরাম এক বিরাট জীবনপ্রবাহ। তার স্রোতমুখে ধেয়ে আসে কতো ক্ষুদ্র জলধারা, কতো স্রোতস্বিনী, কতো মহানদী। সেই প্রবাহ পর্বত বেয়ে নেমে যায় কখনো ভীষণ গর্জনে, কখনো বন্ধুর পথে চলে উত্তাল উন্মত্ত বেগে।

মহা প্রলোভনভরা ওই প্রবাহের অজানা যাত্রার দিকে আমায় সেদিন ডেকে নিয়ে গেলেন দীনেশ মজুমদার আর দাদা। তাঁরা ছিলেন নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে পাগল। সকলের অলক্ষ্যে থেকে নিজেকে তিলে-তিলে ক্ষইয়ে দিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য নীরব সাধনা এঁদের। তাঁরাই দেখাতে-দেখাতে নিয়ে চলেছিলেন সেই চির-অশান্ত দুর্বার স্রোতকে। ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ তার গতিপথ। ওই প্রবাহকে লক্ষ্য করতে-করতে কখন ওরই মধ্যে মিশে গেল আমার মতো এক অতি ক্ষুদ্র জলধারা। অশ্রান্ত চপল এই বৃহৎ ধারায় ছুটে চলতে গিয়ে মনে হয়েছে, এখানে এসে নিজেকে ডুবিয়ে দেওয়া অতি তুচ্ছ কথা। বুঝি নিজেকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে পারলে তবেই আসবে আমার তৃপ্তি, আমার সার্থকতা। মনে হয়েছে, এর মধ্যে 'মোর বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া রহিবো বলো কী মতে ?'

একে-একে এলো সুধীর, এলো বীণা। সুধীর আর বীণাকে যারা দেখেছে তারা তো পরম স্নেহভরে, শ্রদ্ধাভরে স্মরণ না-ক'রে পারবে না। ওরা যে মরণকে ধ্রুব জেনে, হেসে-হেসে তারই পশ্চাতে ছুটে চলে, ওদের তো কোথাও বেঁধে রাখা যায় না। ওদের মধ্যে যদি কেউ চোখের সামনে ঝলমলিয়ে উঠলো বা যদি কেউ আড়ালেই র'য়ে গেল তাতে কিছুই এসে যায়নি। এমন সব দুর্লভ রত্নের

টুকরোগুলিই সেদিন জাতির জীবনে অজ্ঞাত অখ্যাত কোণে ঝিকমিকিয়ে উঠেছিলো, রাঙিয়ে তুলেছিলো তারা বাদলভরা নিবিড় অমানিশাকে।

দেখেছিলাম ভূপেনদাকে এবং অনেক পরে এসে সামান্য স্পর্শ পেয়েছিলাম যাদুদারও (ডাক্তার যাদুগোপাল মুখার্জী)। কী প্রতিভা এবং ব্যক্তিত্ব! এমন এক-একটি মানুষই হয়তো তখন এক-একটা বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক'রে তাকে দিক্‌নির্ণয় করতে-করতে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তারই সংস্পর্শে এসে শত-শত কর্মী এক-একটা প্রাণবলির যূপকাষ্ঠে সগর্বে মাথা রেখে হাসি-মুখে প্রতিদিন অপেক্ষা ক'রে চলেছিলেন আত্মোৎসর্গ যজ্ঞে। এমন সব বিপ্লবী উৎসমুখের একটি কথা, একটি ইঙ্গিতও যেন ছিলো চরম আদেশ।

ক্রমে-ক্রমে জেনেছিলাম সুরেনদা, অরুণদা, মনোরঞ্জনদা, সুরেশদা, ভূপতিদাকেও।* এমন একাগ্রচিত্ত, দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিরা সেদিন শক্তিশালী স্তম্ভরূপে জাতিকে দিকে-দিকে গ'ড়ে তুলেছিলেন ব'লেই সেদিন বিপ্লবী জলপ্রপাত নেমে এসেছিলো প্রবল বেগে।

এই বিপ্লবী কর্মপ্রবাহ যখন ১৯৩৮ সালে গান্ধীজীর কংগ্রেস আন্দোলনের বিরাটতর প্রবাহে মিশে গেল তখন সমস্ত দেশ তার বিশাল প্লাবনে আত্মহারা। গান্ধীজী তখন তিনটি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জনগণকে ক্রমশ শক্তিশালী ক'রে ধাপে-ধাপে এগিয়ে নিয়ে আসছিলেন। ১৯৩৮ সালে এসে কংগ্রেস এবং বিপ্লবী আন্দোলন এক হ'য়ে মিলে গেল। সেই জাগরণ, সেই উন্মাদনার কলরোল এনে দিলো ১৯৪২ সালের বিপ্লব, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে শেষ সংগ্রাম। গান্ধীজী চ'লে গেলেন কারার অন্তরালে, কিন্তু র'য়ে গেল ক্ষমতা-দখলের সংগ্রাম। অতি দুর্দম, অতি দুর্বার সেই প্রবাহের বেগ।

---

* সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, অরুণচন্দ্র গুহ, মনোরঞ্জন গুপ্ত, সুরেশচন্দ্র দাস, ভূপতি মজুমদার।

ইংরেজ তারপর দেখতে পেলো, দেশের কিষাণ, ছাত্র, নৌসেনা ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে এবং সাড়া দিচ্ছে তারা কংগ্রেস ও গান্ধীজীর আহ্বানে। বণিকের মানদণ্ডে লাভের চেয়ে ক্ষতির দিক ভারী হ'য়ে পড়লো।

এরই মধ্যে ওদের চেষ্টা ছিলো সাম্প্রদায়িক হলাহল দিয়ে কতোটা সুবিধা করা যায়। সেইজন্য যে-দ্বিজাতিতত্ত্ব ওরা এতদিন ধ'রে সৃষ্টি ক'রে এসেছিলো তারই আঘাত হানতে-হানতে চললো একটার-পর-একটা। ঘটলো নোয়াখালির দাঙ্গা।

নোয়াখালিতে এলেন গান্ধীজী। যুগে-যুগে কতো মহামানবই এই হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে এসেছেন। এসেছিলেন বুদ্ধ, এসে-ছিলেন যীশু, এসেছিলেন আমাদের গান্ধীজী। বাপুজী তিনি প্রতিটি মানুষের, পিতা তিনি সমগ্র জাতির। এই একটি মানুষ কেমন ক'রে যে সকলের চেয়ে সহজ এবং সকলের থেকে পৃথক তাই আজ ব'সে ভাবি। তাঁর করুণাকোমল দৃষ্টি, তাঁর অহিংসা ও প্রেমের সভ্যতা আনবার স্বপ্ন জড়িয়ে ছিলো তাঁর প্রতিদিনের প্রেমস্নিগ্ধ কর্মগুলিতে। প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি নিশ্বাস তাঁর সেই কথাই কইতো, সেই অর্থ নিয়েই চলতো।

এমনি ক'রে ব'য়ে চলেছিলো জাতির মর্মে-মর্মে বিশাল থেকে বিশালতর, গভীর থেকে গভীরতর মহাপ্রবাহ। এই প্রবাহের গতিবেগকেই আমি শুধু লক্ষ্য ক'রে চলেছিলাম, বিভিন্ন দিক থেকে আসা জলধারাগুলিকে নয়। সেগুলি তখন বড়ো হ'য়ে চোখে ধরা পড়েনি। ধারাগুলি যেন উপলক্ষ্য, প্রবাহের প্রাবল্য ছিলো লক্ষ্য, যে-প্রাবল্য আনবে সমুদ্র মন্থন ক'রে অমৃত।

আজ যখন সন্ধ্যা নেমে আসে, যাত্রা আমার শেষ হ'য়ে যায় তখন মনে পড়ে ক্ষুদ্র এ-জীবনপথে কতো লোক এসেছেন, বলিষ্ঠ রেখা এঁকে রেখে-রেখে চ'লে গেছেন তাঁরা। তাঁদের সকলের

পাশে জলভরা চোখে এসে দাঁড়িয়েছিলেন বাবা আর মা। ফুলের সাজিটি ভরপুর হ'য়ে আছে। আমি কৃতজ্ঞ র'য়ে যাই, ঋণী র'য়ে যাই জীবন ভ'রে।

দুর্গমের পথে যাঁরা সাথী হয়েছিলেন তাঁরা আজ কে কোথায়? জীবন ভ'রে তাঁদের পাওয়ার দিনে মন আনন্দে ছেয়ে গেছে, সমস্ত হৃদয় উচ্ছ্বসিত, উদ্বেলিত হ'য়ে উঠেছে, বিদায় নেবার বেলায় অপ্রস্তুত মন হাহাকার ক'রে উঠেছে। কেউ তো কারো জন্য অপেক্ষা করে না, যে যার আপন গতিতে ছুটে চলেছে। শুধু চিরকাল ধ'রে নব-নব রূপে ব'য়ে যেতে থাকবে জাতির জীবনের ওই অনন্ত প্রবাহ।